॥ তীর্থরেণু ॥

পরমতীর্থস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের ধর্ম ও দর্শনের বৈজ্ঞানিকী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অনুলিখন। এই সামান্য সংগ্রহ সব সাধারণের প্রাণে অধ্যাত্ম প্রেরণার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করুক এই আমাদের কল্যাণ কামনা।

॥ তীর্থরেণু ॥

॥ স্বামী অভেদানন্দ

তীর্থরেণু

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নব্যভারতের মন্ত্রগুরু

দিব্যদ্রষ্টা

স্বামী বিবেকানন্দের

উদ্দেশ্যে 'তীর্থরেণু' উৎসৃষ্ট

হোল।

ENGLISH WORKS

by

ŚWAMI ABHEDANANDA
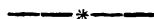
True Psychology

Yoga Psychology

Life Beyond Death

Science of Psychic Phenomena

Vedanta Towards Religion

Sayings of Ramakrishna

Path of Realization

India and Her People

Memoirs of Ramakrishna

Ideal of Education

Reincarnation

Spiritual Unfoldment

Divine Hetritage of Man

Doctrine of Karma

Self-Knowledge

How To be a Yogi

Human Affection and Divine Love

Great Saviours of the World

Songs Divine

Mystery of Death

Bhagavad-Gita the Synthesis

Philosophy and Religion

Vedanta Philosophy

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda.

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

॥ সূচীপত্র ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ ভূমিকা ॥

'তীর্থরেণু' শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচর স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আমেরিকা থেকে ফেরার পর ১১, ইডেন হস্পিটাল রোডে তিনি রাজযোগ, গীতা ও উপনিষদের যে সমস্ত আলোচনা করতেন 'তীর্থরেণু' তাদেরই সারাংশ। ইংরাজী ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতার অনুলিপি নেওয়া হয়েছিল। সেগুলির সামান্যমাত্রকে একত্র ক'রে ছাপার আকারে প্রকাশ করা হোল। এর আগেও সে সব বক্তৃতার সারাংশ কিছু কিছু প্রকাশ করা হয়েছে। যতদূব সম্ভব বক্তৃতাগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকলেও অনেকাংশে প্রকাশভঙ্গী, ভাব ও ভাষাগত বৈষম্য ও দীনতা তাদের ভিতর এসে পড়া সম্ভব, তাই সে সকল ত্রুটির জন্য দোষের দায়িত্ব নিজেদের মাথায় নিতে প্রস্তুত। সকলের সুবিধার জন্য তারিখের পরিবর্তন হোলেও একই বিষয়ের আলোচনাগুলি পাশাপাশি একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হোল ও বিশদভাবে আলোচনার বিষয়গুলিতে পাদটীকার সংখ্যা বসিয়ে পরিশেষে পৃথকভাবে পাদটীকায় সেগুলির সংক্ষেপ আলোচনা করতেও চেষ্টা করা হোল। বক্তৃতার বিষয়গুলির সারমর্ম বোঝানোর জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেব বিচিত্র বিষয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথমের দিকে দেওয়া হোল। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন —শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরূপ মহাতীর্থের সামান্যমাত্র রেণু বা ধূলিকণা সংগ্রহ করাব সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি, কিন্তু তাহোলেও সেই সামান্য 'তীর্থরেণুর'-র পবিত্রতা ও মাধুর্য যে সম্প্রদায় ও ধর্মনির্বিশেষে সকল জিজ্ঞাসুর প্রাণে শান্তি বিতরণ করবে একথা বিশ্বাস করি।

অবশেষে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তব্যের উপর আলোকপাত করার জন্য যে পাদটীকা ও বিবরণী সংযোজিত হয়েছে মূল-বক্তব্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি যেন তাঁরা তুলনামূলকভাবে পাঠ করেন।

প্রজ্ঞানানন্দ

॥ স্বামী অভেদানন্দ

॥ তীর্থরেণু ॥ .

॥ পূর্বপরিচিতি ॥

স্বামী অভেদানন্দের অনুভূতিসমুজ্জ্বল ত্যাগদীপ্ত ও বিচিত্র মনীষাময় জীবনের যে বৈশিষ্ট্য তাদের ভিতর সর্বপ্রথম মনে পড়ে প্রাচ্যের আদর্শরূপে পাশ্চাত্য জগতের সামনে তাঁর বিজয়-অভিযান। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা, ত্যাগ-তপস্যা ও আধ্যাত্মিতার জ্বলন্ত আদর্শ তিনি পাশ্চাত্য জগতের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন ভারতের একজন বাণীবাহকরূপে। পাশ্চাত্যবাসী তাঁর মহাজীবনের উদ্ভিন্ন আলোক দেখেছে ভারতেরই শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ত্যাগ ও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি হিসাবে। সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্যবাসীর সামনে আর পাশ্চাত্যবাসীও বুঝেছিল ভারতীয় আদর্শের মৃত্যুহীন মহিমা—সর্বোপরি ভারতের সভ্যতা, ভারতের সাধনা ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা। দ্বিতীয়—মনে পড়ে দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্ব ও সমস্যাগুলি সরল, স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যুক্তিনৈপুণ্যে জনসমাজে প্রকাশ ও পরিবেশন করা। তৃতীয়—বহুমুখী প্রতিভার আলোকে যে সকল বিষয় যুক্তিযুক্ত, বর্তমান বিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিবাদের মাধ্যমে যে সকল বিষয় ন্যায়সঙ্গত ও নিয়মানুগত সে সকলকে অনুসরণ করা আর গতানুগতিক ও ন্যায়-বিরুদ্ধ যা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। চতুর্থ—অসাধারণ তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রেমিকতা, স্বাধীন মনোবৃত্তি ও নির্ভীকতা। পঞ্চম—শিশুর মতো সারল্য, অফুরন্ত ভালবাসা, দেশ ও দশের জন্য ঐকান্তিক আকুলতা।

পরিপূর্ণ সত্যের উপলব্ধি করানোই সকল দর্শন ও ধর্মের চরমলক্ষ্য ও সর্বোচ্চ আদর্শ। সেই উচ্চ ও দিব্য-আদর্শকে লোকোত্তর

মহামানবেরা নিজেদের সুতীব্র ত্যাগ-তপস্যা, অপূর্ব সংযম ও অনাবিল পবিত্রতার আলোকে উপলব্ধি করেন ও মানবসাধারণের কাছে উপস্থাপন করেন মুক্তির পথপ্রদর্শনের জন্য। মহামানবদের সিদ্ধ অনুভূতিদীপ্ত উদ্ভিন্ন আলোকে সাধারণ মানুষ মহান্ আদর্শের মহিমোজ্জ্বল রূপ দেখতে তথা উপলব্ধি করতে পারে। যে মহামানবের ভিতর সমাধিলব্ধ দিব্যজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রাখর্য ও তীক্ষ্ণতা, বিবিধ বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান ও পারদর্শিতার সুন্দর স্বাভাবিক সমাবেশ লক্ষ্য করি তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে ‘মানবজাতির ধর্মগুরু’ ব’লে আমরা হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের অন্যতম স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এ’রকম সাধনসিদ্ধ একজন মহাপুরুষ ও লোকগুরু। শুধু ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভই তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী জীবনের চাক্ষুষ পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন একাধারে জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী, স্বদেশপ্রেমিক ও মানবকল্যাণব্রতে একনিষ্ঠ কর্মযোগী। জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অজস্র ও অভিনব অবদান এবং আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মতো চিন্তাধারার নিত্য-নূতনতা। তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতিদীপ্ত কর্মবহুল পারম্পর্যময় জীবনের ইতিহাস বা অনন্যসাধারণ কর্মবৈচিত্র্যের সুদীর্ঘ আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়, কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই মাত্র দিতে চেষ্টা করবো যাতে ক’রে তাঁর বক্তৃতাগুলির মর্ম অনুধাবন করার পক্ষে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের কথঞ্চিৎ সহায়তা করতে পারে।

স্বামী অভেদানন্দের রচনাবৈশিষ্ট্যের ভিতর সরল স্বচ্ছ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর সুস্পষ্টতা, সাবলীলতা, ভাবের গভীরতা ও মাধুর্য এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হ’য়ে ওঠে। এ’ প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের ‘প্রসন্ন-গম্ভীর’ ভাষা ও ভাবসমন্বয়মূর্তির কথাই সর্বদা স্মরণ করিয়ে

দেয়। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন, ইহকাল-পরকাল, জীব জগৎ-ঈশ্বর, ধর্ম ও কর্মফল, কার্য-কারণসূত্র, যোগ, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং তাছাড়া খৃষ্টান, পারসিক, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক খুঁটিনাটি সকল বিষয় তুলনামূলকভাবে ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে তিনি চেষ্টা করেছেন। স্বামী অভেদানন্দের রচনা ও ব্যাখ্যানপ্রণালীর ভিতর যুক্তির (logic) সুনির্দিষ্ট ধারা এমনই সুসঙ্গতভাবে রক্ষিত যা কঠিন বিষয়কেও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পাঠককে কষ্ট পেতে হয় না। বৌদ্ধিক বিচার বা যুক্তির মাধ্যমে যে সকল বিষয় প্রতিভাত হয় না তাদের তিনি কখনো গ্রহণ করেন নি। তাঁর সূক্ষ্মবিচার ও বিশ্লেষণপ্রণালী ছিল অসাধারণ। যে কোন সামান্য আলোচনা বা প্রসঙ্গকে তীক্ষ্ণ বিচারীর দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে মনীষামণ্ডিত অন্তদৃষ্টির স্বচ্ছ ও শান্ত আলোকে প্রত্যেকের হৃদয়গ্রাহী বা মর্মস্পর্শী করানো ছিল তাঁর স্বভাব। তাছাড়া বর্তমান বিজ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে মনুষ্যজীবনের সকল-কিছু প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

স্বামী অভেনানন্দ বলেছেন মানুষের মনই বিচিত্র সংসারের নিয়ামক ও স্রষ্টা ঃ "Mind is the creator and director"। মনের বাইরে বিশ্বসংসারের সত্তা নেই ঃ "The world is not in outside, it is only in our mind"-। তবে 'মনে বিশ্বসংসার' বলতে মন নিজের কল্পনাজাল দিয়ে জগতের সকল-কিছুকে সৃষ্টি করে আর সেজন্য মনই জগতের কারণ। একথা অনেকটা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতো হলেও তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বেশ স্বতন্ত্র। স্বামিজী মহারাজ মনকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন আসলে সংসার বা বাসনাসমষ্টিই মন। মনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন মন সূক্ষ্মতর কম্পন বা বৃত্তির সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু

নয় ('finer matter in vibration')। মনের তিনটি স্তরমাত্র আমরা ধরতে-ছুঁতে পারি; চতুর্থ স্তরের সন্ধান মন ও বুদ্ধির অগোচর। মনের তিনটি স্তর হ'ল অবচেতন বা অচেতন (subconscious or unconscious), চেতন (conscious) ও পরচেতন (superconscious)। ডাঃ ফ্রয়েড এদের নাম দিয়েছেন ইগো, সুপার-ইগো ও ইদ্ (Ego, Supper-Ego and Id)। এদের ভিতর অবচেতন মনই বিশাল ও অনন্ত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "The subconscious realm is a vast realm, * *"। ডাঃ ফ্রয়েড অবচেতনকে বলেছেন 'অসীম অন্ধকারময় সমুদ্র' ('the boundless dark ocean')। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই অবচেতন মন 'বিরাট সমুদ্র' ('mighty ocean')। পূর্বপূর্ব বহুজন্মের অসংখ্য সংস্কার এই অবচেতন মনের রূপকে গড়ে তোলে। অবচেতন মনে সমস্ত সংস্কার প্রসুপ্ত ও বীজাকারে থাকে, প্রবুদ্ধ হ'লে তাদের কোন কোনটি চেতন মনের এলাকায় পৌঁছায়। চেতন মনের অবস্থায় আমরা কাজ করি: চলি-ফিরি, খাই, কথা কই, লোকের ও জগতের সঙ্গে আদানপ্রদান করি। অবচেতন ও অচেতন একই অবস্থা। সাধারণতঃ অচেতন বলতে অজ্ঞানের বা নির্জ্ঞান (unconscious) অবস্থার কথা লোকে মনে করে, স্বামিজী মহারাজ বলেছেন সেটা ঠিক নয়। অজ্ঞান (unconscious) অর্থে জ্ঞান থাকে তবে অব্যক্ত। পরচেতন (susperconscious) শুদ্ধজ্ঞানের রাজত্ব। তাই সেখানে যখন আমরা পৌঁছাই তখন ঈশ্বর তথা ব্রহ্মের সঙ্গে মরণোত্তীর্ণ রাজ্যে প্রবেশ করি: 'There we enter the realm of the Absolute'। ফলে আমাদের পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মবুদ্ধি বা 'আমি' 'আমার' জ্ঞান দূরীভূত হয় ও সমষ্টি বা বিরাট আমির চেতনায় মন ও প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়। স্বামিজী মহারাজ বলেছেন 'we are conscious of the all-total unity,'—তখন বিরাট একত্বানুভূতির স্পর্শ আমরা

লাভ করি। এই সমষ্টি আমির অনুভূতি স্বামিজী মহারাজের মতে আত্মজ্ঞান ঃ "* * It is the greatest and hightest. It is also called Gonconsciousness"। তখন আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধে যথার্থজ্ঞানের উদয় হয় ঃ "* * we are conscious of God in the higher plane"।

মনের অবস্থা ভাগ করার সময় স্বামী অভেদানন্দ চার রকম বিভাগ বা স্তরের কথাও বলেছেন, যেমন অবচেতন, চেতন, পরচেতন ও ব্রহ্মচেতন ('subconscious, conscious, superconscious and God-conscious')। ব্রহ্মচেতন (Godconscious) বলতে তিনি শুদ্ধব্রহ্ম-চৈতন্যকে লক্ষ্য করেছেন, কারণ পরচেতনের (superconscious) পরিবর্তে ব্রহ্মচেতন (Godconscious) বল্লেও তিনি সেখানে 'আরো' ('also') শব্দ ব্যবহার করেছেন। মোটকথা কারণ-অবস্থায় উপস্থিত হ'লে মহাকারণে যাবার কোন অসম্ভবনা থাকে না। স্বামিজী মহারাজ অবচেতনকেই বলেছেন বিরাট মন (cosmic mind) ঃ "The waves of power that are manifested in different forms or psychic forces, rise from the Cosmic mind, * *. That is the subconscious mind"। স্বামী বিবেকানন্দ একে বলেছেন 'আন্তর মন তথা অন্তঃকরণ এবং বিরাট ও অনন্ত সমুদ্র' ('great boundless ocean of subjective mind')। অব্যক্ত অবচেতনকে ডাঃ ফ্রয়েড বলেছেন 'ইদ্' (*Id* বা *It*), ডঃ ইয়ুঙ্ বলেছেন 'জীবনীশক্তি', (Cosmic Energy), বের্গসোঁ বলেছেন 'প্রাণশক্তি ('*élan vital* বা *Mind-Energy*'), বেদান্ত বলেছে 'মায়া', 'কারণ-অজ্ঞান' বা 'অব্যক্ত', বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেছে 'বিজ্ঞান', সাংখ্য বলেছে 'প্রকৃতি' আর তন্ত্র বলেছে 'শক্তি' বা 'মহামায়া'। কাজেই বেদান্তের 'মায়া' বা 'কারণ-অবিদ্যা', বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদীর 'আলয়বিজ্ঞান' ও ডাঃ ফ্রয়েডের 'ইদ্' বা 'লিবিডো' ও সাংখ্যের 'প্রকৃতি' একই পর্যায়ভুক্ত। দর্শনের

অবচেতন ও পরচেতন বা ব্রহ্মচেতনকে তন্ত্রের মূলাধার ও সহস্রারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মূলাধারে স্বয়ম্ভু-শিব যখন সহস্রারে প্রবুদ্ধ হন তখন তিনি পরমশিব। সুতরাং অবচেতন জ্ঞানদীপ্ত ও প্রবুদ্ধ হ'লে পরচেতন বা ব্রহ্মচেতন নামে পরিচিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ অবচেতন মনকে বলেছেন 'পরমন' (supermind) ও প্রকৃতি (creatrix)। তাঁর মতে পরমন বিরাট ও অসীম ('vast and limitless')। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "Our consciousness lies on the crest of these waves which are rising from the subconscious and going back to the subconscious"। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "mind having arisen from the Supermind, has the potentiality to go back to it''। শ্রীঅরবিন্দ সুপারমাইণ্ড, মাইণ্ড ও ওভারমাইণ্ড (supermind, mind and overmind) এই তিন স্তরে বা ভাগে মনকে ভাগ করেছেন।

অবচেতন (subconscious) ও ব্রহ্মচেতন (Godconscious) এ' দুটির ভিতর পার্থক্য হ'ল 'সুষুপ্তি আর সমাধিতে যেমন ভেদ। অবচেতনে শুদ্ধজ্ঞান থাকলেও জ্ঞান মায়ার (মহামায়ার) সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত থাকে। ব্রহ্মচেতনে কেবল শুদ্ধজ্ঞান থাকে, অব্যক্ত বা কারণ-অজ্ঞান তখন নিজের চৈতন্যরূপে বিভোর, তাতে আবরণ বা ভেদের কোন বালাই থাকে না। অবচেতনে জীব পাশমুক্ত শিব, কিন্তু মায়ায় আচ্ছন্ন থাকায় পাশবদ্ধ জীব ব'লে পরিচিত। ব্রহ্মচেতনে জীব শিবই। জীবত্বের মলিনতা তখন সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে-মুছে যায়। সুষুপ্তির অবস্থায় মানুষ ব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠিত হ'লেও মায়া কারণাকারে থাকে, কিন্তু সমাধিতে ব্রহ্ম মাত্র থাকেন, অজ্ঞানের আবরণ থাকে না। অবচেতনে প্রাণশক্তি বা energy স্বরূপে ব্রহ্মচৈতন্য বলে পরিচিত হ'লেও শক্তির আকারে থাকে, কিন্তু ব্রহ্মচেতনে শক্তি নিষ্কল শিবরূপে অধিষ্ঠিত। কাজেই অবচেতন একদিক থেকে ব্রহ্মচেতন বা ব্রহ্মচৈতন্য,

কেবল বিমর্শশক্তি হিসাবে কারণ-অজ্ঞান থাকে। সুতরাং অবস্থা-দুটি প্রায় সমান, ভেদ কেবল অজ্ঞান থাকা আর না-থাকা নিয়ে। কিন্তু স্বরূপতঃ উভয়ে শুদ্ধচৈতন্য। কনসাসনেস্ বা সম্বিৎ দুয়ের মধ্যেই থাকে, তবে একটি গড্কনসাসনেস্ বা ব্রহ্মচেতন আর অপরটি সাব-কনসাসনেস্ বা এনার্জি-কনসাসনেস্ (energy-consciousness)। অবচেতন যেখানে 'dark limitless ocean' (মসীময় অনন্ত-সাগর) ব্রহ্মচেতন বা পরচেতন সেখানে 'bright limitless ocean' (জ্যোতির্ময় অনন্ত সমুদ্র)। তবে গডকনসাস্ বা গডকনসাসনেস্ না ব'লে যাঁরা তার পরিবর্তে 'সুপারকনসাস্' বলতে চান তাঁদের মতে অবচেতন ও পরচেতনের মধ্যে ভেদ অবচেতন ও ব্রহ্মচৈতন্যের মতো বুঝতে হবে। স্বামিজী মহারাজ কখনো কখনো সুপারকনসাস্ বা পরচেতনকে 'the greatest and highest' অথবা 'the realm of Absolute' বলেছেন। সেখানে সুপারকনসাস্ বা পরচেতনকে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর ব'লে বুঝতে হবে। শুদ্ধব্রহ্মকে বোঝানোর জন্য তিনি সর্বদা 'গডকনসাসনেস্ (Godconsciousness), 'গডভিসন' বা 'গডইনটুইসন' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, কেননা সূক্ষ্মবিচারের মাপকাটিতে সুপার-কনসাস্ বা সুপারকনসাসনেস্ও (পরচেতন) ঈশ্বর হিসাবে মায়া-রাজ্যের মধ্যে পড়ে। কাজেই যেখানে তিনি গডকনসাসনেস্ বলেছেন সেখানে ব্রহ্মচৈতন্য বুঝতে হবে। ব্রহ্মচৈতন্যকে তিনি বলেছেন মায়ানির্মুক্ত নির্গুণ। তিনিই জীব, জগৎ এবং ঈশ্বরেরও কারণ এবং অধিষ্ঠানরূপে আবার কল্পিত।

ঈশ্বরে মায়া কারণরূপে থাকে, কিন্তু শুদ্ধব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র থাকে না। মনে রাখতে হবে ঈশ্বরে মায়া কারণাকারে থাকলেও ঈশ্বর মায়াধীশ, মায়া তাঁর করায়ত্ত, মায়া তাঁর মধ্যে কোন রকমে কোন বিকার আনতে পারে না। কাজেই ঈশ্বরের ভূমিতে উপস্থিত হ'লে নির্গুণব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করতে সাধকের আর বিলম্ব

থাকে না, আর এ' অর্থে স্বামিজী মহারাজ পরচেতনের অবস্থাকে Godconsciousness বা পরাজ্ঞান বলেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ বাসনাকে সংসার বা মায়ার বন্ধন বলেছেন: "So desire is at the root of everything. * * Desire is the creative effort of the mind * *. It is the desire that guides you, * *"। সমস্ত জিনিসের কারণই বাসনা। মনের সৃজনী-শক্তিকে বাসনা বলে। মন সকল কাজে মানুষকে পরিচালিত করে। কিন্তু বাসনার আসল কারণ শক্তি বা energy—যাকে মনের প্রকৃত রূপ অথবা মনেরও কারণ বলতে পারি। মনের ছড়ানো অবস্থার নাম বাসনা, আর মনের স্থির অবস্থা শুদ্ধমন বা চৈতন্য। মনের ছড়ানো অবস্থায় প্রশান্তি লাভ হয় না, তাই মনের অচঞ্চল অবস্থার দিকে মানুষকে ফিরে যেতে হয় এবং তবেই শান্তি।

স্বামিজী মহারাজ বুদ্ধিকে মনের একটি শক্তি অর্থাৎ বৃত্তি ('one of the powers of the mind') বলেছেন। ভামতীকার, সাংখ্যকার ও মীমাংসকের মতো মনকে তিনি ইন্দ্রিয় (অন্তরিন্দ্রিয়) বলেছেন: "Mind is the internal instrument (*Antahkarana*)"। চিত্ত এবং অহংকারও মনের বৃত্তি।

যাতে বাইরে চৈতন্যের প্রকাশ নেই কিন্তু স্বরূপে প্রদীপ্ত তাকেই স্বামী অভেদানন্দ জড় বা জড়জগৎ বলেছেন। সুতরাং জড় ও চেতনে স্বরূপগত কোন পার্থক্য নেই। চৈতন্যের অপ্রকাশিত অবস্থা জড় ও প্রকাশিত অবস্থাই চৈতন্য। জড়েও চৈতন্য থাকে ('matter contains consciousness also')—তবে অব্যক্ত। প্রকাশ ও অপ্রকাশ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার জন্য একই জিনিসকে আমরা বলি জড় বা চৈতন্য—ম্যাটার বা স্পিরিট। স্বামিজী মহারাজ বলেছেন: "The mind is the invisible side of matter and matter is the visible side of mind" ;—অর্থাৎ মন জড়বস্তুর অদৃশ্য অবস্থা, আর জড়বস্তু

মনের দৃশ্য অবস্থা। আসলে জড় ও চৈতন্য এক জিনিস। একই চৈতন্যকে আমরা দু'রকমভাবে দেখি মাত্র। একই চৈতন্যের দু'রকম বিকাশ দেখি ব'লে দুটিকে বৈচিত্র্য বা মায়িক জগতের জিনিস ব'লে মনে করি, আর তারি জন্য দুটি থেকে ভিন্ন আর একটি তৃতীয় নিরপেক্ষ চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করি। এটি বোঝাবার জন্য স্বামিজী মহারাজ নেগেটিভ ও পজেটিভ-বিকাশযুক্ত একটি চুম্বকপাথরের (magnet) উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন একটি চুম্বকপাথরের নেগেটিভ ('নেতি'-বাচক) ও পজেটিভ ('ইতি'-বাচক) দুটি শক্তি বা বিকাশ থাকে। সে-দুটি শক্তির সমতা রক্ষা করে অন্য একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি (netural point)। সেই নির্লিপ্ত উদাসীন শক্তিই সাক্ষীচৈতন্য বা নির্বিকার ব্রহ্ম। পজেটিভ মন চৈতন্য বা স্পিরিট, আর নেগেটিভ মন জড় বা ম্যাটার—এই ভিন্ন দুটো দিক বা অবস্থা হ'লেও একই শুদ্ধচৈতন্য বা ব্রহ্মের তারা বিকাশ। প্রকাশের তারতম্যে জড় ও চৈতন্য দুটি আলাদা জিনিস ব'লে মনে হয়, নইলে স্বরূপে দুটি এক। আধুনিক বিজ্ঞান একথা স্বীকার করে। ভেদবুদ্ধি থেকে দ্বৈত ও অদ্বৈত ধারণার সৃষ্টি। দুটি দেখি ব'লে 'দ্বৈত' আর দুটিকে অস্বীকার অর্থে দুটিকে অন্য একটির কারণ ভেবে নিরপেক্ষ কারণের দিকে দৃষ্টি দিই ব'লে 'অদ্বৈত': "That is monism when we look at the neutral point of the magnet ; * * But dualism would admit the positive end and the negative end and does not pay any attention to the neutral point"। ইতি ও নেতি দুটি অবস্থা থাকা মানেই দুটি পরস্পর আপেক্ষিক, একটি থাকলে অপরটি থাকে। তাই স্বামিজী মহারাজ বলেছেন: "So neither monism nor dualism is correct, they are only different standards as we interpret";—অর্থাৎ দ্বৈত সত্য নয়, দ্বৈতকে অপেক্ষা ক'রে অদ্বৈতও সত্য নয়, আসলে তারা একই জিনিসের ভিন্নভিন্ন দুটি অবস্থা, যেভাবে তাদের

আমরা দেখি তারা শুধু তাই। বিকাশ মানেই পরিবর্তন, কাজেই মিথ্যা বা অনিত্য। ব্রহ্ম অবিকারী, সুতরাং নিত্য।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন জগৎ বলতে যা অস্থির, এক মুহূর্তও স্থির নয়—তাই : 'গচ্ছতি ইতি জগৎ'। চলমানতাই জগতের স্বভাব ও ধর্ম। জগৎ বা পার্থিব পরিবেশসম্বন্ধে সকল দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের এক কথা, এক সিদ্ধান্ত। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক নাস্তিক হিউম, জার্মান দার্শনিক কাণ্ট, ইংরাজ দার্শনিক আলেকজাণ্ডার, ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ এবং ভারতের আচার্য শঙ্কর ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক বা যোগচারীরা সকলেই সংসারের এই চলমান স্বভাবের কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। হেরাক্লিটাস, হিউম, আলেকজাণ্ডার, বের্গসোঁ ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক বা যোগাচার দার্শনিকদের অভিমতও প্রায় এক রকমের, সকলেই জগতের নিরবচ্ছিন্ন গতি বা চলমানতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে চঞ্চলতা কোন অচঞ্চল অধিষ্ঠানকে (background) ছেড়ে কখনই থাকতে পারে না; অস্থির স্থির কোন একটা বস্তুকে না ধরে এক মুহূর্তও থাকে না। আলেকজাণ্ডার তবু ঈশ্বরের (Deity) কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্যে শঙ্কর ও পাশ্চাত্যে কাণ্ট চিরচলমানতার পিছনে অচঞ্চল একটি অধিষ্ঠান খুঁজে বার করেছেন—যদিও অধিষ্ঠানের ধারণা দুজ'নের ঠিক এক রকম নয়। শঙ্কর যেখানে অধিষ্ঠানকে বলেছেন অবিকারী ও অবিনশ্বর শুদ্ধচৈতন্য, কাণ্ট সেখানে অবিকারী ও অচঞ্চল বল্লেও অধিষ্ঠানকে 'ম্যাটার' অর্থাৎ জড়বস্তুর সামিল বলেছেন। স্বামী অভেদানন্দ আচার্য শঙ্করের মতো বিশ্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানকে অবিনশ্বর চৈতন্য বলেছেন। হেরাক্লিটাস, হিউম ও বের্গসোঁর চিরচঞ্চল ও অবিশ্রান্ত গতিধারা উদ্দেশ্যহীন ও চির-অনন্তের দিকে ছুটে চলেছে, বিরাম কোনদিন নেই। বৌদ্ধ মাধ্যমিক বা যোগচারীর চলমানতাও তাই : একটি স্রোত অপর একটি স্রোত থেকে

সম্পূর্ণ বিছিন্ন হ'য়ে বিরাট শূন্যের দিকে অনন্তকাল ছুটে চলেছে। স্বামিজী মহারাজ বলেছেন চলমানতার পিছনে চির-অচঞ্চল নিত্যবস্তু একটি থাকে এবং সেই অবিকারী বস্তুই ব্রহ্মচৈতন্য। জগৎ তারই বুকে নৃত্য করছে। ব্রহ্মচৈতন্য একমাত্র নিত্য আর নৃত্যচঞ্চল জগৎ বিকারী সুতরাং মিথ্যা কিনা সর্বদা পরিবর্তনশীল।

চলমান চিরচঞ্চল জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যকে অধিষ্ঠান করেই নিজের সত্তা বজায় রেখেছে। ব্রহ্মই সুতরাং জগতের কল্পিত কারণ এবং অধিষ্ঠান। কারণ দু'রকম: নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। স্বামিজী মহারাজ আচার্য শঙ্করের মতো ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ ব'লে স্বীকার করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, কারণবিশিষ্ট ব্রহ্ম মায়াবিরহিত শুদ্ধব্রহ্ম নন, কারণব্রহ্ম সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর বা অব্যক্ত। ব্রহ্ম অধিষ্ঠানরূপে থাকেন বলেই জগতের চলমান সত্তা সম্ভবপর আর সেজন্য ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ। ব্রহ্ম নিজেই জগদ্রূপ ধারণ করেন ('তৎ সৃষ্ট্বা 'তদেবানুপ্রাবিশৎ') সুতরাং উপাদানকারণ। মাকড়সা নিজের লালা দিয়ে যেমন নিজের বাইরে জাল তৈরী ক'রে আবার নিজেই জালের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তেমনি ব্রহ্ম জগৎ বা সৃষ্টির নিমিত্ত ও উৎপাদন দু'রকম উপলক্ষিত কারণ। কিন্তু আসলে তিনি কোন কারণই নন।

এদিক থেকে স্বামী অভেদানন্দ আচার্য শঙ্করের সঙ্গে একমত, কিন্তু দার্শনিক প্লেটো, জার্মান দার্শনিক স্পিনোজো, কাণ্ট, শেলিঙ ও হেগেল প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ঠিক একমত নন। প্লেটো 'আইডিয়াজ' (Ideas) তথা মনন ও চিন্তাকে যদিও চলমান জগতের অধিষ্ঠান বলেছেন তবু 'আইডিয়াজ' বা চিন্তাকে তিনি ভাবময় বৈচিত্র্যের কারণ ব'লে স্বীকার করেন নি। স্পিনোজার কথা তাই। স্পিনোজা 'সাবস্ট্যান্স' (Substance) বা ঈশ্বরকে চিন্তা ও বিস্তৃতির (*thought* and *extention*) অথবা মন ও জড়ের (*spirit* and

matter) অধিষ্ঠান ব'লে স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্লেটোর মতো তাদের কারণ বলেন নি। কাণ্টের অজ্ঞেয় ঈশ্বর বা ব্রহ্মও প্রতীয়মান জগতের অধিষ্ঠান, কিন্তু কারণ নন। শেলিঙও ঈশ্বরকে অধিষ্ঠান ব'লে স্বীকার করতে রাজী নন। হেগেল ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে চলমান বৈচিত্র্যের (*becoming*) সঙ্গে ওতঃপ্রোত দেখেছেন, তা থেকে মোটেই পৃথক বা উত্তীর্ণ দেখাতে পারেন নি। কাজেই এসকল দিক থেকে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর অধিষ্ঠানরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ (সগুণ-) ব্রহ্মকে সকলের চেয়ে মহান্ ব'লে বর্ণনা করেছেন। স্বামিজী মহারাজ যদিও জগৎ বা বিকাশের দিক থেকে ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ বলেছেন তাহলেও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কোন কারণ নন এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত। কারণও গুণ—যাকে কাণ্ট বলেছেন 'ক্যাটিগরি' (category) বা বিশেষণ। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নির্বিকার, কাজেই কোন গুণ তাঁতে আরোপ করা মানেই তাকে গুণবান এবং কার্যতঃ মায়াময় জাগতিক বস্তু ব'লে স্বীকার করা। অথচ বিশুদ্ধব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র কল্পনা করা যায় না। গুণ ও রূপের কোন সত্তা ব্রহ্মে কোনকালে নাই। কাজেই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ একথাও ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলা যায় না। তবে দ্বৈত জগতকে স্বাকার ক'রে আমরা মায়াবী বা কারণধর্মী ব্রহ্ম বলি। জগৎ শূন্য বা আকাশ থেকে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নি, কোন-কিছু সৎবস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এ' রহস্য বোঝানোর জন্য আমরা নির্গুণ ব্রহ্মে কারণরূপ গুণ বা ধর্ম আরোপ করি মাত্র। আসলে তিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ কোনটাই নন। স্বামিজী মহারাজ তাই 'কারণ'-শব্দ সম্বন্ধে বলেছেন : "But even the term *cause* is a relative term. * * It does not refer to the Absolute",—অর্থাৎ 'কারণ'-শব্দ আপেক্ষিক সুতরাং আপেক্ষিক বা মায়িক শব্দ নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কখনো প্রযুক্ত হয় না। ব্রহ্ম সর্বদাই মায়ানির্মুক্ত ও কারণারূপ গুণের অতীত।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মায়া বা অজ্ঞানকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বপ্ন যেমন কোনদিন সত্য হয় না, যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি ততক্ষণই সত্য এবং জাগ্রত হ'লে জানি স্বপ্ন মিথ্যা তেমনি যতক্ষণ ভ্রম ততক্ষণই মায়া বা অজ্ঞান, ততক্ষণই জগৎ সত্য, কিন্তু জ্ঞান হ'লে জগৎ পরিবর্তনশীল সুতরাং মিথ্যা ব'লে প্রতীত হয়। সেজন্য অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "I should say it is more like a dream. Dreams are real so long as we are dreaming, but when we wake up they become unreal"। মায়াকে তিনি শঙ্করের মতো মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাপ্রত্যয় বলেছেন: "The ideal of Vedanta is to enrich us with the knowledge of the *Atman* by which we can make us free from the fetters of false knowledge (*mithyā-pratyaya*) which is the *maya*"। *Doctnine of Karma*-গ্রন্থে 'মায়া' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "That is a kind of delusion we have. *It is a false knowledge* (*mithyā-pratyaya*)"। মায়াকে তিনি একেবারে 'না' কিম্বা শূন্য বলেন নি, আপাততঃ বা ব্রহ্মজ্ঞানের আগে পর্যন্ত অনুভব হয় ব'লে আপেক্ষিক 'সৎ' বা সত্য বলেছেন: "Delusion does not mean non-existence. It means *relative reality*, that is, it exists for the time being, ane *has no permanent existence*,"—অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা অর্থে জগৎ নিত্য নয়—পরিবর্তনশীল। জগৎ অনিত্য এই সত্য-বুদ্ধি হওয়ার জন্য জগৎ বা সংসারই পরমবস্তু, জগৎ ছাড়া আর কোন বস্তু সত্য নয় এরকম ভ্রমবুদ্ধি দূর হয়। ভ্রম দূর হওয়ার নাম জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি। মায়াকে অনেকে 'ইলিউসন' (illusion) বা প্রাতিভাসিক সত্তা ব'লে ব্যাখ্যা করেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন তা ঠিক নয়, কেননা মায়া 'ইলিউনন্' নয়: '*Maya* does not mean illusion, as some scholars think'। মায়া বলতে বোঝায় অবাস্তব

বা অসত্য (unreality),। যথার্থজ্ঞান বিকাশের আগে পর্যন্ত ব্যবহারিকভাবে জগৎ সত্য, কিন্তু পরমার্থিকভাবে বা ব্রহ্মের দিক থেকে জগৎ অবাস্তব বা অনিত্য। স্বামী বিবেকানন্দও মায়াকে 'হলিউসন্' বলেন নি। তাঁর মতে মায়া *'statement of fact'*—দেখা যায় তাই আছে, নিত্য নয়। মায়াকে স্বামী অভেদানন্দ পরমেশ্বরের শক্তিও বলেছেন: *'Maya,* which is the divine energy of the Absolute *Brahman* * *"। শক্তি মানেই গুণ। জগৎ শক্তির বিকাশ অথবা বিশ্ববৈচিত্র্যই শক্তি বা নানা। তাই যতক্ষণ ভুলের জন্য জগৎকে সত্য ব'লে ধারণা হয় ততক্ষণই জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বা বিকাশ, কিন্তু জ্ঞান হ'লে যার বিকাশ তাকেই মাত্র সত্য ব'লে স্থির ধারণা হয়। জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বলতে স্বামিজী মহারাজ জগৎকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা ও নিত্য জিনিস বলেন নি, কারণ জগৎ বা মায়া সত্য জিনিস হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞানের পরও জগৎ সত্য ব'লে থেকে যেতো। কিন্তু তা হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পর জগৎ অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ব'লে জ্ঞান হয়। কাজেই জগৎ বা সৃষ্টি ব্রহ্মের শক্তি মানে জগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়, কিন্তু ভুল ক'রে আমরা জগৎকে ভিন্ন মনে করি। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—জগতের সমস্ত সামগ্রী ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা আবৃত, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুর সত্যকার অস্তিত্ব নেই।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সংবিৎ বা জ্ঞানকে (consciousness) মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছেন—ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান। সাধারণ জ্ঞানও পরমজ্ঞান থেকে অভিন্ন—'common sense is the Divine sense'। প্রতটি খণ্ডজ্ঞানও প্রকাশশীল, কেননা চিৎ বা চৈতন্য তার প্রাণ ও স্বভাব। প্রকাশ করাই জ্ঞানের ধর্ম এবং সে হিসাবে স্বয়ংপ্রকাশমান ব্রহ্মজ্ঞান থেকে চৈতন্যধর্মী খণ্ডজ্ঞানও ভিন্ন নয়। একটা চেয়ারের জ্ঞান আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান এ'দুয়ের ভিতর

বিষয়েরই যা পার্থক্য, জ্ঞান বা চৈতন্য একই। স্বামিজী মহারাজ বলেছেন চৈতন্য হিসাবে উভয়ে এক, পরিমাণে যা ভিন্ন—'difference in degree, not in quality'। তিনি সংবিদ্‌কে (consciousness) প্রাথমিক বা মূল জ্ঞান (of a primary kind) বলেছেন। একে ন্যায়-বৈষয়িক, সাংখ্য-পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে নির্বিকল্পক জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত বলা হয়েছে। নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে ধরা যায় না। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান তার পরে সৃষ্টি হয়। একেই দর্শনের ভাষায় সবিকল্পক জ্ঞান বলে। স্বামিজী মহারাজ বলেছেন: "Then what is consciousness? * * It is knowledge of a primary kind. Knowledge of particulars will come afterwards"। মূলজ্ঞানকে (primary or basic consciousness) অবলম্বন করেই ঐন্দ্রিয়িক বা জাগতিক সকল জ্ঞান সৃষ্ট হয়।

ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিতর এক নিবিড় সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই এই জ্ঞানের ভিতর যুক্তি (reason) ও তুলনামূলক মানসিক বৃত্তি (method of comparison) থাকে। ধারণা করার শক্তিকে (understanding) স্বামিজী মহারাজ যেমন সংবিদের (consciousness) কোঠায় ফেলেন নি তেমনি ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞানকে তিনি সংবিৎ বলেন নি। সংবিৎ বা জ্ঞান স্বরূপতঃ আত্মচৈতন্য। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান (psychology) আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ ব'লে স্বীকার করেনি। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান আত্মা (soul বা *psyche*) বলতে বলেছে 'মন'। পার্সিভাল লয়াল, জে. লিউস, হার্বার্ট স্পেন্সার, ক্লিফোর্ড প্রভৃতি বস্তুতন্ত্রবাদী মনীষীদের অভিমতের প্রমাণ দিয়ে স্বামিজী মহারাজ বলেছেন বস্তুতন্ত্রবাদীরা বলেন আত্মা জড়শরীর থেকে বিকাশলাভ করে, অথবা আত্মা মানুষেরই মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্ট। কেউ কেউ আবার আত্মাকে বলেছেন সংস্কার

বা সংবেদনের সমষ্টি—'bundle of impressions'। বৌদ্ধ দার্শনিকদের অভিমত তাই। স্বামী অভেদানন্দ বস্তুতন্ত্রবাদীদের মতের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানবাদীদের মতবাদও খণ্ডন ক'রে বলেছেন আত্মা শরীর বা মস্তিষ্ক থেকে মোটেই সৃষ্ট নয়, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। শরীর ও মন জড়, কারণ আত্মচৈতন্য ছাড়া শরীর, মন ও বুদ্ধি কোনটাই কাজ করতে পারে না। জড় থেকে কখনো চৈতন্যের সৃষ্টি হয় না। মনোবিজ্ঞান মন ও তার বৃত্তি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছে, মনের বাইরে যেতে পারেনি। ডাঃ ফ্রয়েড আত্মাকে বলেছেন 'ইগো (Ego) —যা মনের চেতন (conscious) অবস্থা। ডাঃ ফ্রয়েডের মতে অবচেতন মনে সংস্কারসমষ্টি আসলে বাইরের ইন্দ্রিয়সুখের (sexuality) সুপ্ত সংস্কার। এর নাম তিনি দিয়েছেন লিবিডো (libido)। ডঃ হল্, ডঃ ইয়ুঙও মিঃ এ্যালেন ডাঃ ফ্রয়েডের এই মতকে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিৎ ম্যাক্‌ডুগাল্, উণ্ড, কুল্পী, উইলিয়াম্ জেম্‌স, ষ্টাউট এঁরাও কেউ মনের অতীত চৈতন্যময় এক নিরপেক্ষ বস্তুকে আত্মা ব'লে স্বীকার করেন নি। ডাঃ ফ্রয়েডের মতে 'ইগো' বা আত্মা হ'ল মনোবৃত্তির সমষ্টি ('the coherent organization of the mental process')। ডঃ ইয়ুঙ্ ডাঃ ফ্রয়েডের এই অভিমত খণ্ডন ক'রে বলেছেন 'ইগো' বা মনই মানুষের সব-কিছু নয়, মনের পিছনে এক বিরাট শক্তি থাকে যাকে বের্গসোঁর পরিভাষায় প্রাণশক্তি (*elal-vital*) বলা যায়। অবচেতন বা অচেতন মনে যে সুপ্ত ও সঞ্চিত সংস্কার থাকে তা 'লিবিডো' (*libido*) অর্থাৎ প্রাণশক্তি ('energy of life') অথবা জীবনীশক্তি ('a living power')। ডঃ ইয়ুঙ্ বলেছেন: "There the term *libido* is conceived by him (Freud) in the original narrow sense of sexual impulse, sexual need. * * there gradually grew up a genetic definition of the *libido*, which rendered it possible

for me to replace the expression '*psychic energy*' by the *libido*"। ডাঃ ফ্রয়েডের ইদ্ বা ইগোও আসলে প্রাণশক্তি বা প্রকৃতি যাকে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান 'আত্মা' বলে। স্বামী অভেদানন্দের মতো ডঃ ইয়ুঙ্ও স্বীকার করেছেন আত্মার প্রসঙ্গ ছাড়া মনোবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞানের কোন সার্থকতা নেই ('*psycheless* psychology is no psychology')। ডঃ ইয়ুঙ্ ছাড়া মিঃ এ্যালেনও তাঁর *The Self in Psychology*'-গ্রন্থে সেলফ (self) বলতে 'মন' বলেন নি—আত্মা বলেছেন যে আত্মা মনের সমস্ত বৃত্তির ভিতর অনুস্যূত ("is present in all mental activities")। বিহেভিয়ারিষ্টিক্ (Behaviouristic) ও গেস্টল্ট্ (Gestalt) মনোবিজ্ঞান আত্মা বলতে দেহ-মনের ('body-mind') বাইরে যেতে পারে নি : "The self is a unity which is more than a sum of its subordinate parts. It is an active living whole, a body-mind, * *"। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে কোনো আলোচনা করে নি, যা করেছে তা কেবল জড়শরীর ও মনের সংঘাত থেকে সৃষ্ট সংবেদন এবং মনের বৃত্তিসম্বন্ধে ('not in the sense of the *psyche* or soul but in the sense of the physiological origin and ordering of the mind')। তিনি বলেছেন পতঞ্জলির যোগদর্শন এবং বেদান্তের মতো আত্মার মহিমাকে গৌরব দান করতে আর কেউ পারে নি। মনোবিজ্ঞান বলতে শুধু মনের কথা নিয়ে আলোচনা নয়, মনের পিছনে আত্মার সন্ধান দেওয়াই মনোবিজ্ঞানের কিনা সাইকোলজির উদ্দেশ্য। মন যন্ত্র ও জড়, মনের শক্তি আত্মা জোগায় বলেই মন কাজ করে। স্বামী অভেদানন্দের মতে মনোবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই আত্মা (*psyche* বা soul)—মন নয়। কিন্তু শুদ্ধসংবিৎ, চৈতন্য অথবা আত্মসংবিৎ চিরদিনই অবিকারী ও সত্য, আর সকল বস্তু আত্মনিয়ন্ত্রিত বা আত্মার অধীন ব'লে বিকারী ও অনিত্য।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন সংবিৎ বা জ্ঞানকে কেউ কোনদিন অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারে না, করণ সংবিৎ বা জ্ঞান সকল জিনিসের মূলে থাকে। তাছাড়া সংবিৎ বা জ্ঞানকে অস্বীকার অথবা অতিক্রম করতে গেলে সংবিৎ বা জ্ঞানের সাহায্যেই তো অস্বীকার বা অতিক্রম করতে হয়। কাজেই জ্ঞানকে কোনদিন অস্বীকার বা অতিক্রম করা যাবে না। অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "So our state of consciousness is the most primary thing, the first thing. You cannot go behind it. By what and how will you go behind it"। জ্ঞানকে তাই অতিক্রম বা অস্বীকার করতে গেলে যা দিয়ে অতিক্রম বা অস্বীকার করবে তাকে আবার স্বীকার করতে হবে: "But the very fact of denying the existence of soul, consciousness or mind presupposes another mind which is denying"। আসলে আত্মসংবিৎ বা জ্ঞান সকল জিনিসের কারণ। জ্ঞানের সীমারও কখনো আমরা নির্ণয় করতে পারি না, কারণ মূলজ্ঞান বা আত্মা আমাদের স্বরূপ। মূলজ্ঞান বা আত্মা থেকে আমরা কোনদিন তাই ভিন্ন নই ('because we have it; we cannot leave it; we are one with it")। স্বামী অভেদানন্দের মতো ডঃ হ্যালডেন এবং বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্কও একই কথা বলেছেন। ডঃ হ্যালডেন বলেছেন: "যা-কিছুই করি না কেন, জ্ঞানকে আমরা অতিক্রম করতে কখনোই পারি না"। অধ্যাপক ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক বলেছেন: "আমরা সংবিদ্‌কে অতিক্রম করতে পারি না। যা-কিছু বলি, যা-কিছুকে আমরা 'আছে' (সত্তা) ব'লে গণ্য করি সে সবই জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে"। কাজেই জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সকল বস্তুর অধিষ্ঠান এবং এই আত্মসংবিদ্‌কে উপলব্ধি করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

জাগতিক সকল জিনিসের সংবেদন (sensation) ও প্রত্যক্ষ (perception) হয় যখন জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার সঙ্গে এক হয় : "Subject recognizes object because the subject is one with the object"। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মিলন-মৈত্রী ভাব অনেকটা বেদান্তের প্রত্যক্ষপ্রণালীর মতো মনে হয় যদিও অদ্বৈত বেদান্তের প্রত্যক্ষপ্রণালী ঠিক একরকম নয় (পাদটীকায় আমরা এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি)। স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ দুজনেই যে কোন জিনিসের সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সময় ভারতীয় প্রত্যক্ষপ্রণালীকে পুরোপুরি অনুকরণ করেন নি, বরং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রত্যক্ষীকরণপ্রণালীই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে গ্রহণ করার জন্যই তা প্রয়োজন হয়েছিল, অন্যথা অদ্বৈত বেদান্তের প্রমাণকেই তাঁরা যুক্তিসম্মত বলেছেন। শুধু প্রত্যক্ষ বা সংবেদনের বেলায়ই নয়, বিকাশবাদ ও পুনর্জন্মবাদের বেলায়ও পাশ্চাত্য যুক্তিপ্রণালীকে অনেক পরিমাণে গ্রহণ ক'রে শেষে বেদান্তসম্মত সিদ্ধান্তকে তাঁরা সমর্থন করেছেন। বিশেষতঃ স্বামী অভেদানন্দের স্বাধীন মতবাদের বৈশিষ্ট্য এ'সব বিষয়ে লক্ষ্য করার জিনিষ। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের বেলায় স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দকে বরং শঙ্কর ও কান্টের মতো পাশ্চাত্যের বস্তুতন্ত্রবিশিষ্ট ভাববাদী (objective idealist) ব'লে গ্রহণ করা উচিত, কেননা ব্যবহারিকভাবে বিশ্ববৈচিত্র্যকে তাঁরা স্বীকার করেছেন। মাধ্যমিক বা যোগাচার বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতো তাঁরা তাই আন্তর-ভাববাদী (subjective idealist) ছিলেন না। তাছাড়া সংবেদন ও প্রত্যক্ষপ্রণালীর বেলায় পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের যুক্তি ও প্রণালীকে তাঁরা অনেকাংশে গ্রহণ করেছেন।

সৃষ্টিসম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ সাংখ্য ও বেদান্তের মতবাদ অনুসরণ করেছেন। সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রণালী উপনিষদের সৃষ্টিধারা

থেকে আরো উন্নত ও বৈজ্ঞানিক। তাই সাংখ্যীয় মতকে গ্রহণ করলেও তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও বিকাশবাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সকল-কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন সৃষ্টিসম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "Our mother earth was formed out of a portion of the substance of solar-system millions and millons of year ago, and now it is inhavitable. * * By this theory of evolution we can also expain the origin and growth af all human beings step by step"। অভেদানন্দ মহারাজের অভিমতে হাজার হাজার বছর আগে সাংখ্যকার কপিলের সময়ও বিজ্ঞানের উন্নত ধারা অব্যাহত ছিল। বিরাট প্রকৃতি থেকেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি। বেদান্ত প্রকৃতিকে বলে 'অব্যক্ত'। অব্যক্তে সকল বস্তু ও প্রাণীর সংস্কার বীজের আকারে সঞ্চিত থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও অকস্মাৎ হয় নি, ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরেই গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্য। তা পূর্ণপরিণতির দিকেই ছুটে চলেছে অবিরত। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের ভিতর মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ অবদান, কেননা মানুষই একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিক চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে।

বাইরের জগতে যেমন ক্রমবিকাশের স্তর আছে তেমনি মানুষের ভিতরেও ক্রমোন্নতির ধারা স্বীকৃত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন ক্রমবিকাশের অবিশ্রান্ত প্রবাহ অতিক্রম ক'রে নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে ছুটে চলেছে সকল প্রাণী। মানুষ বাইরের জগতে বিকাশ লাভ করে প্রথম, তারপর নৈতিক জগতে, তারপর ধর্মজগতে ও পরিশেষে আধ্যাত্মিক জগতে পূর্ণপরিণতি-রূপ আত্মজ্ঞান লাভ করে। আধ্যাত্মিক জগৎ বা আধ্যাত্মিকতা লাভ হয় তখনই যখন আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ হয় অনুভূত: "But true spirituality begins wiih the perception of the infinite

Being * *"। স্বামী অভেদানন্দ বিকাশের (evolution) চরম-পরিণতি (finality) করেছেন স্বীকার ও যাঁরা অনন্তকাল ধ'রে বিকাশের আনন্দে হন বিভোর তাঁদের মতকে করেছেন খণ্ডন। আধুনিক জড়সর্বস্ববাদী মার্ক্সবাদীরা অনন্ত বিকাশ (eternal progress) স্বীকার করেন, অর্থাৎ তাঁদের মতে মানুষ কোনদিন চরমপরিণতি লাভ করে না। স্বামী অভেদানন্দ একথা স্বীকার করেন নি। হেরাক্লিটাস্ ও বের্গসোঁর মতো নিরবচ্ছিন্ন কালধারাকেও (time continuity) তিনি স্বীকার করেন নি। পাশ্চাত্য বিকাশবাদী দার্শনিকদের ভিতর হার্বার্ট স্পেন্সার, আলেকজাণ্ডার, লয়েড মরগ্যান, বার্ণার্ড-শ, হোয়াইটহেড, হ্যালডেন ও এমনকি সমাজতন্ত্রী দার্শনিক স্পেঙ্গলার ও সমাজসংস্কারক সোরোকিন পর্যন্ত অনন্ত বিকাশের ধারায় বিশ্বাসী হলেও চরমলক্ষ্যের (finality) বেলায় তাঁরা একমত। রবীন্দ্রনাথও তাই। বলাকায় গতিবাদ স্বীকার করলেও চরমসীমা তিনি স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও অনন্ত বিকাশধারার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেছেন সরলরেখার ভিতর কি কখনো গতি থাকতে পারে? একটি সরলরেখাকে অনন্তের দিকে বিস্তৃত করলে পরিশেষে বৃত্তের আকারেই ফিরে আসে যেখান থেকে তা চলা আরম্ভ করেছিল সেখানে। তাই অনন্তবিকাশ কখনো সম্ভব হ'তে পারে না ("It is absurd on the face of it")। বেদান্তের সিদ্ধান্ত তাই। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "The souls have not been created suddenly, but these souls are passing through the different stages of evolution ; from the lower to the higher planes, gaining experience after experience, and marching onward towards the ultimate goal of the realization of the Absolute"। বিশ্বসৃষ্টি তাই কোনদিন অকস্মাৎভাবে হয় নি। উদ্ভিদ্‌জগৎ থেকে আরম্ভ

ক'রে মানবজগৎ পর্যন্ত সকলে বিকাশের ক্রমোচ্চ স্তর অতিক্রম ক'রে ধীরে ধীরে চরমমুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রত্যেকেই তাই একদিন-না-একদিন মুক্তিরূপ চরমলক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবে। অধ্যাত্ম জগতেও স্বামী অভেদানন্দ ক্রমবিকাশ স্বীকার করেছেন, কারণ সকল মানুষ দেখতে এক রকম হলেও মনের বিকাশ এবং ধারণার দিক থেকে তাদের ভিতর স্তরভেদ আছে। তিনি বলেছেন: "Before we understand what the Absolute is, we must pass through the different stages of evolution in our spiritual progress"। আত্মজ্ঞান লাভ করার পূর্ব-পর্যন্ত তাই আধ্যাত্ম জগতেও ক্রমবিকাশের স্তর স্বীকার করা উচিত। ক্রমোন্নতির পথ ধরেই আমরা পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করি।

বেদান্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী অভেদানন্দ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের লীলা বলেছেন। সৃষ্টিকে অপেক্ষা ক'রেই স্রষ্টার কল্পনা, আর সেদিক থেকে তিনি বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরসম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে দ্বৈতবাদী ও বৈচিত্র্যপূজক মানুষই সৃষ্টি করে নিজের কল্পনা দিয়ে। স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়ে তাই অদ্বৈতজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর স্বীকার করেন নি, স্বীকার করেছেন বিশ্বের দিক থেকে। তাঁরা বলেছেন প্রবৃত্তি বা রুচির মাপকাঠিতে অখণ্ড চৈতন্য আত্মাকে নাম-রূপ দিয়ে আমরা বলি ঈশ্বর, মহামায়া ও দেবদেবী। ভাবজগতে বা উপাস্য-উপাসকের ক্ষেত্রেই ঈশ্বর, জগৎপিতা, মহামায়া, ইষ্ট, দেবদেবী এ'সবার আসন প্রতিষ্ঠিত। মানুষের সাধনার সহকারীরূপেই তাঁদের প্রয়োজন, বিচারী বা বিজ্ঞানীর কাছে তাই এক মহাকারণরূপী ব্রহ্মচৈতন্যই সত্য, নাম-রূপ পরিবর্তনশীল। সৃষ্টি মনের বিলাস ও বিকার। ভেদবুদ্ধি নিয়ে আসে মানুষকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার দ্বৈতভূমিতে নামিয়ে। অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "We are worshipping at present

a human God which has been created by the human mind. The real God is far away",—অর্থাৎ আমরা যে মানবের শ্রেষ্ঠ পরিণতি হিসাবে ঈশ্বরের পূজা করি সে ঈশ্বরকে মানুষই করে তার নিজের মন বা কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি। সত্যকার ঈশ্বর মানবের ধারণা বা কল্পনা থেকে অনেক উচ্চে। অভেদানন্দ মহারাজ সাকার ঈশ্বরের ধারণাকে তাই বলেছেন অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম সোপান—"the conception of the personal God is the first step"। বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরকেও তিনি শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ বলেন নি: "So the Creator of the universe or God is not the Absolute Being or *Brahman*"। কেননা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেও সৃষ্টির মমতায় চিরদিন আবদ্ধ থাকতে হয়। ঈশ্বরও সত্তা হিসাবে তাই আপেক্ষিক (He is relative ; * * personal God is not the Absolute)। সাকার ও গুণযুক্ত ঈশ্বরকে ঠিক নিষ্প্রপঞ্চক ব্রহ্মচৈতন্য বলা যায় না। তবে উপাসনা, কর্ম ও ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সাকার ঈশ্বরেরও আবার উপযোগিতা আছে, কারণ সাকার-উপাসনার ভিতর দিয়েই সাধক নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মের করে উপলব্ধি।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদও স্বীকার করেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সত্তার অবসান হয় না। মৃত্যুতে মানুষের শরীররূপ আবরণেরই কেবল পরিবর্তন হয়, শরীরী বা আত্মার কোন বিনাশ নেই। মানুষের আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ও অহংকার এসবের কোনটাই নয়, তিনি পরমজ্ঞান ও পরমপ্রেমস্বরূপ। জন্ম থাকলে মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু মৃত্যু অর্থে এটা নয় যে আত্মসত্তার চিরবিলীন হওয়া। দেহাত্মবাদী চার্বাক ও বস্তুতন্ত্রবাদী দার্শনিকেরা জড়দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ স্বীকার করেন। অনেক খৃষ্টানদের অভিমত তাই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তের মতে মৃত্যু বা নাশ মানেই ব্যক্ত অবস্থা থেকে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে

যাওয়া। কার্য কারণে লয় পাওয়ার নামই নাশ বা মৃত্যু। মৃত্যুর পর স্থূলশরীর ত্যাগ ক'রে মানুষ সূক্ষ্মশরীরে ফিরে যায় এবং সূক্ষ্মের পর কারণশরীর ও চরমমুক্তিতে মহাকারণরূপ আত্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত হয়। মানুষ পৃথিবীলোকে যেভাবে থাকে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্মজগতেও ঠিক তেমনিভাবে থাকে, পার্থক্য কেবল স্থূলশরীর থাকে না।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন সূক্ষ্মজগৎ বলতে বোঝায় মনলোক যাকে স্বপ্নলোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বায়বীয় শরীর ধারণ ক'রে পরলোক তথা মনোলোকে থাকে ও পরে পৃথিবীলোকে আবার জন্মগ্রহণ করে। প্রাণীমাত্রের এই যাওয়া-আসার অভিযান ক্রমাগতই চলতে থাকে যতদিন না তার মুক্তি অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি হয়।

প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এ'সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি যথেষ্ট অর্জন করেছিলেন। তাই যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি চান তাঁদের নিষেধ করেছেন তিনি প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে। প্রেতলোকেও ক্রমবিকাশের ধারা আছে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে মানুষ কর্মফল অনুসারে জন্মমৃত্যুর পথে যাতায়াত করে। ভাল কর্মে তার সদ্‌গতি ও খারাপ কর্মে হয় অধোগতি। উপনিষদের মতে অসৎকর্মের ফলে মানুষের আত্মা তির্যক বা পশু-শরীরও ধারণ করে। স্বামী অভেদানন্দের সিদ্ধান্ত এ'সব থেকে কিন্তু ভিন্ন। এ' সমস্যাকে নিছক বিজ্ঞান ও ক্রমবিকাশ তথা ক্রমোন্নতির দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন ক্রমবিকাশ এবং জন্মান্তরবাদের নীতি ও নিয়ম অনুসারে সকল প্রাণী বিকাশ (upward progress) লাভ করে নিম্ন থেকে উচ্চস্তরে। জৈবিক বিকাশধারার সর্বোচ্চ পরিণতি মানুষ। মনুষ্যজন্মের পর আত্মা তাই নিম্ন স্তরে অর্থাৎ তির্যক বা পশু শরীরে আর ফিরে যায় না,

বরং মানুষের দেহ নিয়েই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও হীন মনোভাবসম্পন্ন হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে। এদিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও স্বামী অভেদানন্দের বিচার ও যুক্তিগত ভেদ অনেক। স্বামী অভেদানন্দজীর কাছে শুনেছি লণ্ডনে থাকার কালে স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) সঙ্গে তাঁর পুনর্জন্মবাদ নিয়ে হয় আলোচনা। স্বামী বিবেকানন্দ সমর্থন করেন উপনিষদের সিদ্ধান্ত। স্বামী অভেদানন্দ বিজ্ঞান ও ক্রমবিকাশনীতি সমর্থন ক'রে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাই এক মত হ'তে পারেন নি।

স্বামী অভেদানন্দের যুক্তিপ্রণালী এ' বিষয়ে অভিনব ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক প্রিঙ্গিল্-প্যাটিসন্ (Prof. Pringle-Pattison)-প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত অভেদানন্দজীর সিদ্ধান্তের প্রায় অনুরূপ। অভেদানন্দ মহারাজ বিচারের দিক থেকে প্লেটো ও পিথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীক মনীষীদের সঙ্গেও ঠিক একমত হ'তে পারেন নি। তিনি প্লেটোনীয় মতের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুসিদ্ধান্তের অনেক-কিছু পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্লেটো ও তাঁর মতানুবর্তীরা বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা স্বাধীনভাবে মনোমত নির্বাচন (free choice) করে এবং যেকোন শরীর ধারণ করে আর তারি জন্য ইচ্ছা করলে আত্মা তির্যক বা পশু শরীরও ধারণ করতে পারে। অভেদানন্দ মহারাজের অভিমতে তা অসম্ভব, কেননা কার্যকারণসূত্র (law of cause and sequence) জন্মান্তরবাদের মূলসূত্র হ'লেও খামখেয়ালী বা নীতিবিরুদ্ধ স্বাধীন নির্বাচনের (free choice) স্থান সেখানে নাই। বৃহদারণ্যক (৬।২।১৬), ছান্দোগ্য (৫।১০।৭), কঠ (২।২।৭) ও কৌষিতকী (১।১।৬) প্রভৃতি উপনিষদের মতে মানুষের আত্মা অসৎকর্মেরই ফলরূপে তির্যক বা পশু শরীর ধারণ করে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন জন্মান্তরনীতি গ্রহণ করলে একথা স্বীকার করতে

হয় যে বিশ্বের সকল প্রাণীর গতিই (progress) নিম্ন থেকে উচ্চতর বিকাশের দিকে ('growth and evolution of each individual soul from the lower to higher stages of development') । মানুষের বিদেহী আত্মা বা সূক্ষ্মশরীর ক্রমবিকাশের স্তর অনুসরণ করে এবং নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ বিকাশ মনুষ্যশরীর ধারণ করার পর আর তির্যক বা পশুশরীর ধারণ করে না ('after coming to the human plane, it does not retrogate to animal bodies') । প্রাণীর প্রতিটি সূক্ষ্মদেহ (আত্মা) সাধারণ ক্রমোন্নতির পথ ধরেই উদ্ভিদ্-জগৎ, প্রাণীজগৎ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে পরিশেষে মনুষ্যজগতে উপনীত হয়। উচ্চ স্তরে উপনীত হবার পর আত্মার নিম্নস্তরে ফিরে যাওয়ার কোন সার্থকতা থাকে না ('After having once received the human organism, why should a soul choose to go back to the lesser and more imperfect organism of an animal') । উপনিষৎ এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের উল্লেখ ক'রে অভেদানন্দজী তাই বলেছেন ঃ "যদিও আমি জানি যে মানুষের পক্ষে আবার পশু বা হীন শরীর ধারণ করার কথা হিন্দুশাস্ত্রে আছে তবুও একথাই স্বীকার করবো যে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ('rational and scientific') দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে এভাবে গ্রহণ করা উচিত যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অসৎকর্মের ফলে তির্যক অথবা পশু শরীর আর ধারণ করে না, বরং মানুষের ভিতরই পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিচিত্র স্তর দেখা যায়। কুকুর, বিড়াল, সাপ প্রভৃতির মতো হিংস্রপ্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা ও হীন মনোবৃত্তি অনেক মানুষের ভিতরই পাওয়া যায়। মানুষই পশুমানব আবার দেবমানবে পরিণত হয়, কাজেই মৃত্যুর পর মানুষ মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ করে, তবে প্রবৃত্তি ও স্বভাব হয়তো পশুর মতোই কদর্য ও হীনভাবাপন্ন হয়" (*Reincarnation*,

পৃ· ৯৮)। অভেদানন্দ মহারাজের বিজ্ঞানসম্মত এই স্বাধীন যুক্তিপ্রণালীর অভিনবত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সূক্ষ্মবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে একথাও আবার স্বীকার্য যে অভেদানন্দজী জড়শরীরের দিক থেকে নিম্নগতির বিকাশ স্বীকার না করলেও নৈতিক (ethical or moral) বা মানসিক (mental) জগতের দিক থেকে নিম্নগতির বিকাশ (downward progress) স্বীকার করেছেন। তবে মানুষ যে মৃত্যুর পর পশুপক্ষীর শরীর ধারণ করে না একথা তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ কর্ম ও ফলের জন্য কার্যকারণসূত্র স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন একমাত্র কার্যকারণসূত্রের (law of cause and sequence) ভিতর দিয়ে একজন ভাল ফল পেয়ে হয় সুখী, অন্য জন খারাপ ফল পেয়ে হয় দুঃখী। এই ভাল ও মন্দ ফলভোগ করার জন্য ঈশ্বর, অদৃষ্ট বা অলৌকিক কোন শক্তি দায়ী নয়। ঈশ্বর কোনদিন কাকেও শাস্তি বা পুরস্কার দান করেন না, শাস্তি বা পুরস্কার মানুষ কর্মফল অনুযায়ী লাভ করে। কর্ম করলে তার ফল অনিবার্য—যেমন আঘাত করলে তার শব্দ অবশ্যম্ভাবী। যেমন কায়ার পিছনে থাকে ছায়া। ঈশ্বর নির্লিপ্ত, নির্বিকার ও সাক্ষীচৈতন্য। সূর্য নিরপেক্ষভাবে যেমন পাপী ও পুণ্যাত্মার উপর সমানভাবেই দেয় কিরণ তেমনি ঈশ্বর চৈতন্যরূপে সবার অন্তরেই করেন বিরাজ, সকলের উপরই তার সমান দৃষ্টি। তিনি ভাল বা মন্দ কোন ফলই দান করেন না, বরং যে যার কর্মফল অনুযায়ী মানুষ হয় সুখী বা দুঃখী। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "Neither God nor Satan is responsible for our pleasure and pain, happiness and misery"। আসলে কার্যকারণনীতির মাধ্যমেই মানুষের অদৃষ্ট হয় নির্ধারিত বা পরিচালিত। মানুষ গঠন করে নিজের স্বভাব বা চরিত্র তার চিন্তা ও কাজের দ্বারা: "He (man) knows that he creates his

own destiny, and mould his characrer by his thoughts and deeds"। সুতরাং কার্যকারণসূত্রের কাছে নাই কৃপা, অলৌকিক বা ঐশীশক্তির অনুগ্রহের কোন স্থান ("there is no room for the hypothesis of predestination and grace")। কার্যকারণনীতিই মানুষের ভাগ্যে (law of cause and sequence) একমাত্র প্রবল। ঈশ্বর সম্বন্ধেও অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন : "The doctrine of Karma denies the arbitrary ruler and teacher that God never rewards the virtuous nor punishes the wicked"। মানুষের আত্মিক শক্তি ও নিজের মনোবলই প্রধান। আত্মশক্তিকে অস্বীকার ক'রে তিনি মানুষকে অদৃষ্ট বা অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করতে নিষেধ করেছেন। অলৌকিক শক্তি বা দৈবের উপর নির্ভর করলে মানুষের আত্মিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস (self-confidence) হয় হীন এবং মানুষ হয় একটি যন্ত্রপুত্তলিকায় পরিণত। তার নিজের তখন কোন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন যাকে আমরা বলি অলৌকিক শক্তি বা অদৃষ্ট তা সত্য কেবল বিচারবিহীন অবৈজ্ঞানিক লোকের কাছে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং বিচারসম্পন্ন লোকের কাছে তা লৌকিক ও সাধারণ ("That which appears to be supernatural or Providential to an unscientific mind, is natural to a scientist or a philosopher ,whose conception of nature is larger and more universal"। হাত দেখা, কুষ্ঠি দেখা প্রভৃতি অদৃষ্ট-গণনাকে তিনি বলেছেন মানসিক দুর্বলতার পরিচয়। তিনি বলেছেন : "বিজ্ঞান হিসাবে (as a science) তাকে কতকটা গ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি তাতে মোহবদ্ধ হয়, আর তারি জন্য তাকে প্রশ্রসা করতে পারি না। তারপর অদৃষ্টগণনায় সত্যের ভাগ থাকে খুব কম" (Fortune-telling rarely gives us truth. This

scientific side I accept, but modern Astrology goes too far in fortune-telling business. * * We accept Astrology but not in all its phases")। পুরুষকারকে তিনি শ্রেষ্ঠ সহায় বলেছেন। মানুষের জীবনে আত্মিক শক্তি বা আত্মা সর্বশক্তিমান ও অবিনশ্বর এবং এই বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করা উচিত প্রত্যেকের। বিশেষ ক'রে ভগবানকে যাঁরা চান লাভ করতে, মুক্তিলাভের আকুলতা যাঁদের অন্তরে প্রবল তাঁদের তিনি সহায় করতে বলেছেন আত্মশক্তি ও নিজের বিশ্বাস, আর অদৃষ্ট বা অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে কর্ম ও চিন্তার সাহায্যে মানুষ নিজের অদৃষ্ট, ভবিষ্যৎ ও চরিত্র করে গঠন, তার জন্য দায়ীই মানুষ নিজে—ঈশ্বর বা সয়তান নয়। দুঃখ-কষ্টের জন্য মানুষ তাই দায়ী নিজে, তার জন্য অন্যকে বা অন্যশক্তিকে দায়ী করা অযৌক্তিক। তিনি বলেছেন: "We create our own destiny, mould our future, determine our character by our own thought and deed. We cannot blame God or Satan for our own misery and sufferings for which we ourselves are responsible; * *"। বন্ধনের জন্যও মানুষ দায়ী নিজে। আবার নিজেদের মুক্তির জন্য মানুষই দায়ী।

মুক্তিসম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন আপন আপন স্বরূপের অনুভূতিকে মুক্তি বলে। আমরা আত্মস্বরূপ, কিন্তু নিজেদের শক্তিহীন সংসারী ও মরণশীল মানুষ মনে ক'রে অজ্ঞানে আবদ্ধ হই। এই ভ্রান্তি দূর করা দরকার। সদসদ্‌বিচার ও আত্মানুশীলনের ভিতর দিয়ে ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন হ'লে উপলব্ধি হয় আমরা সংসারী বা বদ্ধ মানুষ নই—পরমচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। তাই মনের দুর্বলতা সর্বতোভাবে দূর করা প্রয়োজন। কুসংস্কার ও বিজাতায় ভাবনার উর্ধে যাওয়া উচিত। সংস্কারনির্মুক্ত ও সত্যনিষ্ঠ ঐকান্তিক

মন নিয়ে আত্মস্বরূপকে জানার আকুলতা সকলের মধ্যে থাকা চাই, তবেই মুক্তি বা স্বরূপানুভূতি সম্ভবপর। স্বার্থপরতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াকে অভেদানন্দ মহারাজ মুক্তি বলেছেন। চরমনিঃস্বার্থতার স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করাই মনুষ্যজীবনের পরমপুরুষার্থ বা পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতাকেই তিনি বলেছেন মুক্তি বা আত্মানুভূতি: "By *perfection* we mean the *realization* of our true nature, the rising above all that is included in the word 'selfishness', * *. That is, what we mean by *perfection*, the attainment of perfect freedom and Godconsciousness"। ব্রহ্মানুভূতি, স্বাধীনতা, মুক্তি এ' সকল এক সঙ্গে আসে: "Godconsciousness, absolute freedom and perfection will come simultaneously"।

মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরানুভূতিকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বৌদ্ধিক (intellectual) বা যৌক্তিক (logical বা rational) জ্ঞান বলেন নি, অথবা আত্মজ্ঞান যুক্তিতর্কের ফলরূপে সৃষ্টি একথাও স্বীকার করেন নি। মুক্তিকে তিনি নির্বাণ বা নির্বিষয় শূন্যও (vacant void) বলেন নি, কারণ শূন্যের একজন জ্ঞাতা থাকে যিনি শূন্যকে শূন্য ব'লে জানেন বা স্থির করেন। শূন্যের যিনি জ্ঞাতা তিনি শূন্য থেকে অবশ্যই পৃথক। এই ভিন্ন জ্ঞাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম। এখানে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে আচার্য শংকরের মতের ঐক্য যথেষ্ট। অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন মুক্তিলাভের কোন বাঁধাধরা পথ বা নিয়ম নেই। কেবল পূজাপাঠ, ধ্যান-ধারণা বা শ্রবণ-মননরূপ জ্ঞানবিচারের দ্বারাই মুক্ত লাভ হয়, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না—এ'রকম সংকীর্ণ মত তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন কারুর জীবনে একঘেয়ে ভাব আদর্শ হওয়া উচিত নয়। ধর্মসাধনায় বৈচিত্র্য থাকা দরকার। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর চিরবরেণ্য আচার্য ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুযায়ী জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যানধারণা ও কর্ম এই সকল রকম যোগ বা সাধনার পথকে ঈশ্বরলাভের উপায় বলেছেন। তাঁর মতে সকল পথেই ভগবানকে পাওয়া যায়। শক্তির উপাসনা, বিষ্ণুর উপাসনা, সাকার বা নিরাকারের উপাসনা সবই সত্য। তবে মন ও মুখ এক ক'রে হৃদয়ে আন্তরিকতা ও আকুলতা জাগিয়ে তোলা উচিত। 'ভাবের ঘরে চুরি' না ক'রে জীবনে সিদ্ধির জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা বা যত্ন করা কর্তব্য। যতদিন না হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় ততদিন একনিষ্ঠভাবে যত্ন করাকে তিনি 'সাধনা' বলেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ চিত্তশুদ্ধিকে জ্ঞানের মুখ্যকারণ বলেন নি। তিনি বলেছেন চিত্তশুদ্ধি করা বলতে এ' নয় যে চিত্তকে নিরুদ্ধ বা শূন্য করা। চিত্তশুদ্ধি অর্থে বিচার ক'রে চিত্তকে ব্রহ্ম বা আত্মাভিমুখী করা। সংস্কার বা বাসনাই এই চিত্তশুদ্ধির পথে অন্তরায়, তাই সংস্কারকে আত্মজ্ঞান-লাভের সংস্কারে রূপান্তরিত করা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেই 'মোড় ফেরানো' বলেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন জীবদ্দশায়ই মুক্তি লাভ করা যায় ("* * but it begins here in this life, in this very lifetime, * *." "Godconsciousness can be attained in this life and not after the grave")। কিন্তু তার জন্য এ' জীবনেই মুক্তি লাভ করবো এ'রকম দৃঢ়বিশ্বাস চাই—একান্ত চেষ্টা চাই। যোগদর্শনে মুক্তিলাভের পর 'বুত্থান' স্বীকৃত হয়েছে, স্বামিজী মহারাজ ঠিক তা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন : "And truly speaking, there is no longer any *going beyond* the Absolute, or *going down* or *coming back* (*vyutthāna*) from the Absolute by one who has realized it."। জ্ঞানলাভ হ'লে ওঠা-নামার (ascent বা descent) কোন প্রশ্ন কল্পনা করা যায় না, কারণ দিব্যজ্ঞান হ'লে সকল অজ্ঞান

যখন সমূলে বিনিষ্ট হয় তখন জ্ঞানলাভের পর জীবন্মুক্ত অজ্ঞানের সংসারে থাকলেও অজ্ঞান তাকে কোন-কিছুতে আর বদ্ধ করতে পারে না। জ্ঞানলাভের পরে জ্ঞানী সংসারে কর্ম করলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো জ্ঞানধারা তাঁর অন্তরে প্রবাহিত থাকে। অভেদানন্দ মহারাজ শঙ্করাচার্য, পদ্মপাদ, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মতো জীবন্মুক্ত অবস্থা স্বীকার করেছেন এবং ব্রহ্মসিদ্ধি ও সংক্ষেপ-শারীককারের অভিমত অস্বীকার করেছেন বলা যায়। মোটকথা স্বামী অভেদানন্দ জীবন্মুক্তসম্বন্ধে তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বেবরেণ্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তই অনুসরণ করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ ধর্মকে বলেছেন আত্মজ্ঞানলাভের পথ বা উপায়। অন্ধবিশ্বাস, কেবল শুষ্ক আচার-বিচার, mechanical বা কলের মতো প্রাণহীন পূজাপার্বণ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীকে তিনি ধর্মপথের অন্তরায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। তারা ধর্মপথের সহায় হলেও লক্ষ্য নয়। অভেদানন্দ মহারাজ তাই সার (essential) ও অসার (non-essential) এই দু'ভাগে ধর্মকে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন ধর্মের প্রকৃত অর্থ আত্মানুভূতি—যা দিব্যচেতনার উন্মেষ করে। সত্যকার ধর্মের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা—অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মকে উপলব্ধি করা : "The aim of true religion, therefore, is the *realization of the absolute Being, the realization of the Infinite, * **"। আমরা দিব্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত তার কারণ মিথ্যাজ্ঞান বা মায়া। সাধারণ অবস্থায় ভ্রম বা মায়াকে আমরা সত্য ব'লে গ্রহণ ও ব্যবহার করি, কিন্তু যথার্থজ্ঞান লাভ করতে হ'লে ভ্রম দূর করা উচিত। এই ঔচিত্যবোধ বা কর্তব্যজ্ঞান যে প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত করে তারই নাম 'ধর্ম'। ধর্ম উপায়—লক্ষ্য নয়। ধর্মের আসল অর্থ দিব্যানুভূতি বা আত্মজ্ঞান। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : "And it is the light of religion that opens our

sight and enables us to see the things *as they are in reality*. And that religion is not confined to books. * * It is the *feeling*, the Divine *realization*"। ক্ষুদ্র 'অহং' বা 'আমি' 'আমার'-রূপ পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দূর করাকে তিনি একদিক থেকে ধর্ম অর্থাৎ মুক্তি বলেছেন, কেননা ধর্ম বলতে 'divine *realization*' বা দিব্যমুক্তি বোঝায়। ক্ষুদ্র 'অহং'-ই স্বার্থপরতা এবং অভেদানন্দ মহারাজের মতে তা মায়া বা অজ্ঞান। ক্ষুদ্র 'অহং'বা 'ছোট আমি'-কে দূর করার অর্থ বিরাট আমির (cosmic *Ego*) সঙ্গে নিজেকে এক করা। বিরাট আমির চেতনায় মানুষ দেশ, দশ ও বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে আত্মোৎসর্গ করে; সকলকে সে আপনার বলে ভাবে, সবাইকে সে পরমাত্মীয় জ্ঞান ক'রে। কাজেই জ্ঞান হ'লে সকল পরিচ্ছিন্নতার গণ্ডী সার্বভৌমিকতার দিব্যপ্লাবনে একাকার হয়।

অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন নৈতিক জীবন (ethical or moral life) ধর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত: "Ethics must be the foundation of religion"। সকল জাতি বা দেশের ধর্মের মূলে থাকে পরিপূর্ণ নৈতিকতা ও সৎ জীবন। দয়া-দাক্ষিণ্য, মৈত্রীভাব, পরোপকার, দেশ ও দশের কল্যাণচিন্তা, সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা এ'সকল সদ্‌গুণ নৈতিক জীবনের লক্ষণ। 'নৈতিকার প্রকৃত ভিত্তি' (*True Basis of Morality*) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অভেদানন্দজী দার্শনিক সক্রেটিশ, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল্, ষ্টোয়িক্স, এপিকিউরিয়ান, খৃষ্টান প্রভৃতির মতবাদ এবং জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্, ফিক্টে, হেগেল, সোপেনহাওয়ার প্রভৃতি মনীষীদের মতবাদ সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে বেদান্তের সঙ্গে তাদের তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন সক্রেটিশের মতে সকল সদ্‌গুণ জ্ঞানস্বরূপ। ন্যায়নীতিই নৈতিক জীবনের পথপ্রদর্শক। কাজের ভাল বা মন্দ ফললাভের জন্য জীবনে অন্তর্দৃষ্টি থাকা ও না-থাকার উপর নির্ভর করে। প্লেটোর বিচারপ্রণালী ঠিক এই রকমের

ছিল। ন্যায়নীতির (justice) সঙ্গে প্লেটো দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত করেছেন। স্বামিজী বলেছেন: "By justice he meant the State—the moral life in its complete totality"। সমাজ ও রাষ্ট্রই মনের বা চরিত্রের খারাপ যা-কিছু তাকে দমন ক'রে জীবনে সদ্‌গুণ ও স্বাধীনতা আনে। প্রাকৃতিক নীতি ও নৈতিক নীতি দুটো এক নয়। যুক্তি ও বৌদ্ধিক বিকাশই মানুষের জীবনে প্রধান গুণ। মানুষ সাধারণত বুদ্ধিমান, কাজেই সে সমাজে নীতিবিরুদ্ধ কোন কাজ করে না। ষ্টোয়িকেরা বাইরের বৈচিত্র্য বা প্রাকৃতিকে অস্বীকার করে নি, বরং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ ক'রে সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করা ছিল তাদের নীতি। এপিকিউরিয়ানেরা ছিল প্রায় নাস্তিক। তারা দুঃখকে অস্বীকার ক'রে সুখ চায় এবং যেভাবেই হোক সুখ মনুষ্যজীবনের একমাত্র কাম্য একথা বিশ্বাস করে। কাজেই সত্যকার নৈতিকতার বালাই তাদের ভিতর ছিল না। খৃষ্টানেরা পরে যীশুখৃষ্টের বাণী ও বাইবেলের নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মধ্যযুগে তাদের মধ্যে পুরোহিতপ্রথা ও গোঁড়ামীর ভাব প্রবেশ করলো। ষোড়শ শতকে এ'সবের ভিতর আবার পরিবর্তন (Reformation) দেখা দিল। চিন্তাশীল মনীষীরা তখন দিকে দিকে জন্মগ্রহণ করলেন ও ফলে নৈতিক জীবনের সঙ্গে যৌক্তিকতার মিশ্রণ হ'য়ে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন আরো সুমহান হ'য়ে উঠলো।

হিউমের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক নিয়মকানুন আবার লোপ পেতে বসলো। হিউমের পর এলেন ইমানুয়েল কাণ্ট। কাণ্ট বল্লেন নৈতিক জীবনকে মানুষ কখনই ত্যাগ করতে পারে না, কেননা নৈতিকতা মানুষের স্বাভাবিক গুণ। ঐন্দ্রিয়িক ও জাগতিক তুচ্ছ সুখভোগ অতিক্রম ক'রে শাশ্বত সুখের দিকে এগিয়ে যাওয়াই নৈতিক জীবনের লক্ষণ। নৈতিক জীবনের সঙ্গে কাণ্ট শুদ্ধবিচারের

(pure reason) মিতালি পাতালেন। ঈশ্বরকেও তিনি এই নীতির খাতিরে মানলেন, আর ধর্মকে নৈতিকতার ভিত্তি ব'লে স্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন ধর্ম নৈতিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিকে তিনি বাইবেলের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বল্লেন, আর যুক্তির বাইরে কোন সত্যকে মানতে রাজী হলেন না। ফিক্টে, শেলিঙ, হেগেল এঁরা কাণ্টকে অনুসরণ করেও যে যার মতের ভিতর নতুন নতুন ভাবে নৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা করলেন। সোপেনহাওয়ার বল্লেন মানুষের সকল কর্ম নির্দিষ্ট এক প্রবৃত্তিকে ধ'রে উন্নত হয়। সেই প্রবৃত্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় আরো উন্নতি করার ইচ্ছা, আর (২) মন্দ করার ইচ্ছা। দুটি ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি সকল কাজের ভিতর থাকে, তবে মানুষ যেকোন একটিকে বেছে নেয়। মানুষের প্রতিটি কাজকে সোপেনহাওয়ার চার ভাগে ভাগ করেছেন: (১) ঈর্ষার ভাব, (২) অহংভাব, (৩) দয়ার ভাব ও (৪) দোষ ও গুণের ভাব। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ'ভাবে সকল মতের বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে উপনিষৎ বা বেদান্তের নৈতিক আদর্শকেই সুমহান ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন স্বার্থপরতাই জীবনে উন্নতির পথে অন্তরায়, সুতরাং নিস্বার্থপরতাকেই ঠিক ঠিক নৈতিকতা বলা যায়। আত্মার সঙ্গে মানুষের দিব্যজ্ঞান বা "*recognition of oneness*-ই নৈতিকতার যথার্থ অর্থ।

অভেদানন্দ মহারাজ ধর্ম ও দর্শনকে একই সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞানবৃক্ষের ফুল ও ফল বলেছেন। এঁরা একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত: "Of the tree of knowledge 'true philosophy' is the flower and 'religion' is the fruit, so they must go together"। ধর্ম দর্শনশাস্ত্রের ব্যবহারিক দিক, আর দর্শন ধর্মের ঔপপত্তিক দিক: "Religion is nothing but the practical side of philosophy and philosophy is the theoretical side of

religion"। শাস্ত্র-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাই আধ্যাত্মিক সাধনা ও সত্যানুসন্ধিৎসার আকুলতা যদি জীবনে না থাকে, শাস্ত্রানুশীলন কেবল যদি পাণ্ডিত্য ও নাম-যশ লাভের জন্য হয় তবে শাস্ত্রানুশীলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভগবান লাভের উপায় ও প্রণালীকে জানা ও সেই জানার লক্ষ্যসম্বন্ধে নিজের ধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে স্থির, দৃঢ় ও পরিষ্কার করাই শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য। ভগবান ও আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। তাই যে কোন পথে যে কোন উপায়ে হোক জ্ঞানলাভ করা উচিত।

স্বামী অভেদানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের সার্বভৌমিক আদর্শকে সর্বদাই শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন এবং ভারতীয় দর্শনের প্রমাণ ও যুক্তির বৈশিষ্ট্য সমস্ত দেশের দর্শন ও যুক্তির চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছেন। বেদান্ত বিশ্ববাসীকে যে সুমহান আদর্শ দিয়েছে তা অতুলনীয়। অন্য দেশের কোন দার্শনিকই এবং এমনকি প্লেটো, স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল বা সোপেনহাওয়ার পর্যন্ত কেউই সেই মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। হার্বার্ট স্পেন্সার বৈচিত্র্যবাদ (Phenomenology) বা জগদ্‌রহস্য নিয়ে অনুশীলন করেছেন সত্য, কিন্তু জীবন ও দর্শনের আসল সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। কাণ্টের আত্মাও সংবেদন, চিন্তা প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক গুণগুলিকে ('forms of intuition and of his categories of thought') কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে কাণ্ট কোন সুমিমাংসাও করেন নি। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো কাণ্টের আত্মা বা ব্রহ্মও চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unkwoable)। কিন্তু বেদান্ত এদিক থেকে জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বেদান্ত ব্রহ্মকে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ ও অনুভূতির স্বরূপ বলেছে—কোনদিনই অজ্ঞেয় বলে নি।

অভেদানন্দ মহারাজ বেদান্তকে বিজ্ঞান ও ধর্ম দু'রকমই বলেছেন —যদিও বিজ্ঞান ও ধর্মের আদর্শ এক নয়। বিজ্ঞানের নীতি হ'ল শোনা কথা বা কোন একটা অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে পুনঃ পুনঃ পরিপ্রেক্ষণ, যুক্তি, তর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্যকে আবিষ্কার করা। বেদান্তের নীতিও তাই। তবে বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত চরম-আদর্শকে অতিক্রম করেছে, কেননা বিজ্ঞানের আদর্শ জগতিক স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতীন্দ্রিয় আত্মাসম্বন্ধে সে কোন মীমাংসা করতে পারে নি। অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "Modern science cannot be called a religion, although it explains the theory of evolution, * *. But Vedanta is at once a science and a religion: science, because it accepts all the truth discovered by modern science, * *; religion, because it directs our energy towards the realization of absolute freedom".

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন সংসারে থেকেও সকলের পক্ষে নিষ্কাম-ভাবে কর্ম করা সম্ভব। তবে সাধন চাই। জীবনে বারবার অভ্যাস, যত্ন ও অধ্যবসান চাই। সমগ্র মন ও শক্তি দিয়ে—সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি দিয়ে আমরা যা চাই সেই আদর্শ বা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নাম 'অভ্যাস': "*Practice* means a striving with one's whole mind and energy, sense and sensibility to realize the ideal in question"। তাঁর মতে নিশ্চেষ্টতা তমোগুণের লক্ষণ এবং কর্মহীনতা ও উদাসীনতার অর্থ নিজেকে প্রবঞ্চিত করা। কর্ম করাই মানুষের প্রকৃতি; সংস্কারই মানুষকে জোর ক'রে কর্ম করায়। সকল কর্মের পারে যাওয়ার যত্নই 'সাধনা'। সংসার অর্থে কর্মক্ষেত্র। কর্মের সংসারে তথাকথিত নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ অকর্মের ভাণ করার অর্থ মায়া বা অজ্ঞানের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। অভেদানন্দ মহারাজ তাই পরহিতার্থে

—দেশ ও দশের উদ্দেশ্যে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হ'য়ে কাজ করতে বলেছেন। তাতে চিত্তশুদ্ধির ফলে বৈরাগ্য, বিষয়বিতৃষ্ণা ও ভগবানকে জানার আকুলতা আসে। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হ'য়ে কর্ম করার নামই 'কর্মযোগ'। এই কর্মযোগের সাধনায়ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

প্রার্থনাসম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা প্রার্থনাই নয়। যে প্রার্থনায় অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, যে প্রার্থনায় অন্তরের সুপ্ত সিংহশক্তি জাগ্রত হয় ও আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় সে প্রার্থনাই প্রার্থনার যথার্থ রূপ। প্রার্থনা অর্থে হৃদয়ের অন্তরতম দেশে অধ্যাত্ম প্রেরণার উদ্বোধন করা; ভগবানলাভের প্রতিকূল প্রবৃত্তিরূপ রুদ্ধদ্বারে আঘাত দিয়ে তাকে উন্মুক্ত করা। আসলে সচ্চিদানন্দ-মহাসাগরের দিকে চিত্তবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত করার নাম প্রার্থনা। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "True prayer brings to the soul enlightenment and wisdom dwelling latent in every individual. It is the means by which that latent force is roused"। তাই প্রার্থনা ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপূরক নয়, মানুষের অন্তর্বেদীতে চির-অনির্বাণ জ্ঞানদীপমালাকে প্রজ্জ্বলিত করার নামই প্রার্থনা।

অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। দেশ ও কাল দিয়ে পরিছিন্ন ক'রে আত্মাকে আমরা জীব, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি বলে নির্দেশ করি। দেশ ও কালই মায়া। আত্মা বা ব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর পর্যন্তই মায়ার এলাকা। ব্রহ্ম মায়ার অতীত। ব্রহ্ম বাক্য-মনেরও অতীত। মানুষের চিন্তা ও যুক্তি ব্রহ্মসমুদ্রে বিলীন হয়: "It is beyond our conceptions"। আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের কারণ নন, অধিষ্ঠানও নন, মায়ার জন্যই তাঁকে কারণ ও অধিষ্ঠান বলে কল্পনা করা হয়। ব্রহ্ম একও নন আবার বহুও নন: "Ir is neither *one* nor *many*", কেননা 'এক' ও 'অনেক' সংখ্যা-দুটি পরস্পর আপেক্ষিক।

আপেক্ষিকতা (relativity) মায়ার নামান্তর। ব্রহ্মে মায়ার সংস্পর্শ তথা আপেক্ষিকতার লেশমাত্র নাই—"which is beyond all changes and beyond all relations"। কাজেই আত্মা বা ব্রহ্মকে একও বলা যায় না, আবার বহুও বলা যায় না। তিনি দ্বৈতও নন বা অদ্বৈতও নন। আত্মা 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'। তবে আত্মাকে সময়ে সময়ে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয় তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ ও সর্বপাশমুক্ত সত্তা বা স্বভাবকে বোঝানোর জন্য।

অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন আত্মা বা ব্রহ্ম প্রেমস্বরূপ। এই প্রেম জাগতিক প্রেম বা ভালবাসা নয়। এই প্রেম অপার্থিব। যথার্থ প্রেম বা ভালবাসার অর্থ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একাত্মানুভূতি ('feeling of *oneness*')। তিনি বলেছেন : "True love means the *expression of oneness.* It is, as we may say, that *feeling* which is outcome of the relization of *oneness* on the highest spiritual plane"। ঠিক ঠিক প্রেম বা ভালবাসা হৃদয়ে প্রকাশ পেলে মানুষ একত্বানুভূতি লাভ করে, অথবা "Divine love begins to flow in that soul which has relized that *oneness*"। সাধারণ পার্থিব ভালবাসায় স্বার্থ মেশানো থাকে, প্রতিদান পাবার আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকে। তবে প্রেম হিসাবে পার্থিব ভালবাসাও ভগবৎপ্রেম। তাই একদিক থেকে তা ভিন্ন নয়, যেমন অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নিকণার ভিতর পরিমাণগত ভেদ, বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধপ্রেম এক।

দেশ, সমাজ এবং শিক্ষার কথাও স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আলোচনা থেকে বাদ দেন নি। তিনি দেশ ও সমাজের বর্তমান অচলায়তন অবস্থার সংস্কারসাধন করতে বলেছেন। তাঁর মতে দেশ ও সমাজের ভিতর প্রকৃত কার্যকরী ও চরিত্রগঠনোপযোগী শিক্ষা ও মনোবৃত্তির অভাবের জন্যই বর্তমান অবনতি। অনুদার মনোবৃত্তি, একতার

অভাব, সঙ্কীর্ণতা ও সর্বোপরি কুসংস্কার ও 'ছুঁস্নি ছুঁস্নি' হীন প্রবৃত্তি অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। প্রত্যেকের জীবন গঠনমূলক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া উচিত। 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সকল কাজে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে স্বামী অভেদানন্দ সচলজীবন বা practical life বলেছেন। মানুষ কেবল একটিমাত্র বিষয়ে বা জ্ঞানে আবদ্ধ থাকবে না, তার জানার বিষয় হবে 'something of everything and everything of something',—প্রতিটি বিষয়ের কিছু-কিছু. জ্ঞান আর কোন একটি বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করাই সকলের কর্তব্য। 'কোন-কিছু জানি না' এই নেতিবাচক (negative) শব্দকে তিনি অপছন্দ করতেন। অদৃষ্টের দোহাই না দিয়ে পুরুষকারকে জীবনে আশ্রয় করতে বলতেন।

অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা দিয়ে বৈদিক সমাজের মতো নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা উচিত। পতিত ও অশিক্ষিত জাতি বলে যাদের আমরা এতদিন ঘৃণা ও অবজ্ঞা ক'রে এসেছি তাদের এখন থেকে নিজেদের ভাই বোন বলে ভালবাসা উচিত। 'অনুশোচনাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত'। অতীতে যা-কিছু অন্যায় তার জন্য অনুশোচনা করাই প্রায়শ্চিত্ত। মন ও মুখ এক ক'রে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য জীবনোৎসর্গ করা দরকার, তবেই দেশের সুদিন ও সমাজের কল্যাণমূর্তি আবার ফিরে আসবে।

দেশ ও সমাজ থেকে তিনি ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের জীবনকে কখনো বিচ্ছিন্ন হ'তে বলেন নি। দেশ ও দশের উন্নতির জন্য নিষ্কামভাবে কার্য না ক'রে আত্মকেন্দ্রিক ধর্মসাধনা ও কেবল নিজের কল্যাণচিন্তায় ডুবে থাকাকে অভেদানন্দজী বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণযুগের সন্ন্যাসী ও ভক্তদের জীবনের আদর্শ বলেন নি। প্রত্যেকের উচিত নিজে সত্য লাভ ক'রে অপরকে তা দান করা। আগে নিজের জীবন গঠন তারপর অপরের

জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। দেশ ও দশের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে ভক্ত ও সন্ন্যাসীর জীবন সর্বদাই নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকবে। 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' হ'ল সন্ন্যাসী ও ভক্তের জীবন। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি সকল রকম যোগের সমন্বয়মূর্তি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! বর্তমান যুগে কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি যোগী ও কি ভক্ত সকলেরই জীবনের আদর্শ হবে অপক্ষপাত দৃষ্টি, সমদর্শন ও সকলের প্রতি সমান ভালবাসা। আধ্যাত্মিকতার চরমশিখরে আরোহণ করলেও মানুষ কখনো নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট বা পঙ্গুপ্রায় অচল হয় না, বরং জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর শরীরে ও মনে অসীম প্রেরণা ও সিংহশক্তি সর্বদা জাগ্রত থাকে। আত্মজ্ঞানীর জীবন জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির জীবন্ত ও সচল বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়। অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলেছেন কেবল স্বার্থের খাতিরে আমরা জগতে বেঁচে থাকব না, সমগ্র বিশ্বের স্বার্থে আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিত। কোটি কোটি লোকের অগ্রগতিতে সাহায্য করার জন্যই সন্ন্যাসীর জীবন এবং সে সাহায্য শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই নয়—সমাজ, জাতি ও প্রাণীনির্বিশেষে সকলকে দান করতে হবে: "So, we must not live for ourselves but we must live for the rest of the universe. We are here to help in onward progress, not only for our own individual self, but for the whole race, for the whole humanity, and for all living things"। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন আমরা শুধু নিজের সমাজের লোকদের বা জাতির কল্যাণসাধন করেই ক্ষান্ত হব না। কেবল মনুষ্যসমাজেরই নয়, উচ্চ থেকে নীচ পর্যন্ত সকল প্রাণীর ও এমন কি বৃক্ষ-লতাদেরও কল্যাণকামনায় আমাদের জীবনোৎসর্গ করা উচিত: "We must not stop simply after doing something that will help our own people, our own nation, but we must go on doing things that will help not only our own

nation but all human beings but all living creatures, lower animals even plants"। বোধিসত্ত্বের মহিমময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মৈত্রীসাধনাই সন্ন্যাসজীবনের যথার্থ লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে' এবং তার অর্থ হ'ল সর্কলের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের ভিতর বেদান্তের উদার আদর্শকে সর্বদা রূপায়িত ও মূর্তিমান ক'রে তোলা। সকল কাজে প্রবৃত্ত হব, সবার কল্যাণসাধনে ব্রতী হব, কিন্তু নিরাসক্তভাবে ও আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে এবং এটাই বেদান্তের আদর্শ। দিব্য-আদর্শকে জীবনের প্রতিটি কাজে সচল ক'রে তোলাই ব্যক্তিমাত্রের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

খৃষ্টধর্মসম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল গভীর। খৃষ্টানধর্মের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর প্রায় ৩২৫ বছর পরে জনসাধারণের ভিতর খৃষ্টধর্ম ঠিকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। কন্সটান্টাইন দি গ্রেটের (Constantine the Great) রাজত্বকালে নিসিয়া সহরে (City of Nicea) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধর্মমহসভার (Cauncil) অধিবেশন বসে। কন্সটান্টাইন দি গ্রেট ৩২১ খ্রীষ্টাব্দে আদেশ জারী করলেন সর্বসাধারণকে ইহুদীদের স্যাবাথের (Jewish-Sabhath) পরিবর্তে রবিবাসরীয় (Sunday) উৎসবদিবস পালন করতে হবে। তিনি ইহুদীদের রীতিমত ঘৃণা করতেন, তাই প্রচার করলেন রবিবার (Sunday) এখন থেকে প্রার্থনার দিন নির্দিষ্ট হ'ল, কারণ রবিবার সূর্য তথা ভগবানের দিন। - তিনি চার্চের অনেক নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করেন ও তখন থেকেই রবিবারে সূর্য তথা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসব পালন করা চলতে লাগল। ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে এফিসাসের অধিবেশনে (Council of Ephesus) ধর্মযাজকেরা আবার প্রচার করলেন এসকল যে অমান্য করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

অভেদানন্দ মহারাজের মতে যীশুখৃষ্টের জীবন ও উপদেশের প্রামাণিক কোন প্রমাণপঞ্জী বাইবেল বা অন্য পুস্তকে পাওয়া যায় না।

তবে সেণ্টপলেরই প্রমাণযোগ্য কিছু লেখা বা চিঠিপত্র একমাত্র পাওয়া গেছে শোনা যায়। তাও সেণ্টপলের লেখা চৌদ্দটি চিঠি-পত্রের ভিতর মাত্র চারটিকে বিশ্বাসযোগ্য ব'লে গণ্য করা হয়েছিল। সে চারটি চিঠি হ'ল রোমানদের প্রতি এপিসিলস্, কোরিনথিয়াননের প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় এপিসিলস্ ও গ্যালেসিয়ানদের প্রতি এপিসিলস্। প্রকৃতপক্ষে সেণ্টপল যীশুখৃষ্টকে স্বচক্ষে কখনো দেখেন নি, ভাবচক্ষে (vision) মাত্র একবার দর্শন করেছিলেন। সেণ্টপল বলেছিলেন : 'এই পানপাত্র আমারি রক্তের নব অনুকল্প। আমাকে স্মরণ করার জন্য এটাই তোমরা মাঝে মাঝে পান কোরো' : 'This cup is the new covenant in my blood ; this do, as often as ye drink it, in remembrance of me'। আসলে সেণ্টপল যীশুখৃষ্টের ধর্মকে সাধারণের ভিতর কোনদিন প্রচার করেন নি, সত্যই যদি তা করতেন তাহলে এ্যান্টিয়কের পিটারের তিনি বিরুদ্ধাচরণ করতেন না।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন চারটি গসপেলের প্রচলন ১৭৮-২০০ খ্রীষ্টাব্দে গলদেশে লিয়ন্সের বিশপ ইরেনিয়াসের (Irenious, Bishop of Lyons in Gaul) সময় থেকে হয়। বিশপ ইরেনিয়াসই চৌদ্দটির জায়গায় চারটি মাত্র গসপেলকে সাধারণের ভিতর প্রচার করেছিলেন। চারটি গসপেলের সপক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই বলে যে পৃথিবীর যেমন চারটি প্রধান দিক, চারটি মূল-উপাদান, চারটি প্রধান ঋতু, চার্চেরও তেমনি চারটি স্তম্ভ থাকা উচিত, আর সে অনুসারে গসপেলও চারটি ধরে নিতে পারি : "It is not possible that the Gospels can be either more or fever in number than four. For, since there are four quarters of the earth, four elements, four seasons and four cardinal winds, the church ought to have four pillars ; for this reason there should be four

Gospels"। তা ছাড়া নিসিয়ার ধর্মসম্মিলনে সমর্থিত ধর্মবিশ্বাসের বারটি সর্তকে (Apostle's Creed or the Twelve Articles of Faith) পরিবর্ধিত ক'রে ঊনত্রিশটি করা হয়েছিল। সে'সব সর্তের ভিতর বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যুক্তিতর্কের চেয়ে অন্ধবিশ্বাস ও চূড়ান্ত গোঁড়ামীর স্থান ছিল বেশী। বাইবেল যে প্রলয়ের (Deluge) কথা তাও নিছক কাল্পনিক। ষ্ট্রাস্, হাক্স্‌লি, রবার্টসন, ড্রুজ, কনিবিয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একে নিছক কাহিনীমাত্র বলেছেন। নোওয়ার (Noah) কাহিনীর সঙ্গে প্রাচীন গ্রীকদের ডিউকালিয়নের (Deukalion) কাহিনীর হুবহু মিল পাওয়া যায়। প্রাচীন জোরোয়াষ্ট্রিয়ান, হিন্দু ও চীনাদের ভিতরেও এই ধরণের প্রলয়কাহিনীর প্রচলন আছে। জোনা (Jonah) বা ইশায়া (Isaiah) কখনো কুমারী মেরীর সন্তানলাভের কথা (immaculate conception of Mary) উল্লেখ করেন নি। 'জগতের পরিত্রাতা' (Saviour of the world) এই ধারণাও আসলে খৃষ্টানেরা পারসিকদের শোশিয়ান্টার (Soshiyanta) ধারণা থেকে ধার করেছিল। পারসিকদের আহ্রীমন (Ahriman), খৃষ্টানদের শয়তান (Satan) ও বুদ্ধদেবের মার (Mara)-এর ধারণা একই। ৫৮৬-৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলোনের অবরোধকালে (Babylonian Captivity) ফারিসিসরা (Pharisees) শয়তানের ধারণা গ্রহণ করে এবং গোঁড়া ইহুদী সাদিউকরা (Sadducees) তা পরিত্যাগ করে।

মনীষী ষ্ট্রাস্, রবার্টসন, লুইস্ জি. জেনস, কুঁ্যম, ড্রুজ, উইটেকার, ফ্রেজার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের মতো স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন যীশুখৃষ্টের জন্মতারিখ ও জন্মস্থান নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক ইউসিবিয়াস (Eusebius) যীশুখৃষ্টের জন্মতারিখ নির্দিষ্ট করেছেন দশ খ্রীষ্টাব্দে (10 A. D.)৭ অনেকের মতে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন পঁচিশে ডিসেম্বর। কেউ বলেছেন ঊনিশে অথবা

বিশে এপ্রিল, কেউ আবার পাঁচই অথবা ছয়ই জানুয়ারী বলেছেন। রোমের জনসমাজ (Community of Rome) অবশেষে ঠিক করেন পঁচিশে ডিসেম্বারই যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। কিন্তু পঞ্চম শতকের (5th Century A. D.) আগে পর্যন্ত খৃষ্টানসমাজ রোমীয় সমাজের মতকে গ্রহণ করে নি। লাটিনচার্চ যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব (Christmas Festival) পঁচিশে ডিসেম্বার থেকে বারদিন পরে এবং আর্মেনিয়ান চার্চ তা থেকে আরো বার দিন পরে পালন করতে শুরু করে। পঁচিশে ডিসেম্বর মিত্র তথা সুর্যদেবতার জন্মদিন কল্পনা করা হ'ত। পঁচিশে ডিসেম্বার মধ্যরাত্রিতে সূর্য কন্যারাশিতে (Virgo) প্রবেশ করলে ঐ সময় থেকে দিনের ভাগ বেশী ও রাত্রের ভাগ কম হ'তে আরম্ভ হয়। ঐ মাঝামাঝি সময়ের সুর্যকে নবসুর্য (new-born sun) নামেও অভিহিত করা হয়। তাই পঁচিশে ডিসেম্বর সুর্যের জন্মদিন কল্পনা করা হয়েছে। পঁচিশে ডিসেম্বর ডায়োনিসাস, জুপিটার, তামুজ, এডোনিস, ওসাইরিস প্রভৃতি দেবতাদেরও জন্মদিন। এই দেবতারা আসলে সুর্যদেবতারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। খৃষ্টানদের ইষ্টার, লেণ্ট্, মাস্, মে ডে প্রভৃতি উৎসবও মিত্র তথা সুর্যদেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত। ভারতবর্ষে বসন্তকালে হোলী-উৎসব, শরৎকালে বা আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজা, দেওয়ালী ও দশেরা প্রভৃতি উৎসবও মিত্র বা সুর্যদেবতার উদ্দেশ্য ছাড়া অপর কিছু নয়।

বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন গত ঊনবিংশ শতকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাণী ও আদর্শ দিয়ে গেছেন তাকে সকলের সর্বতোভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের কল্যাণময়ী বাণী বহন ক'রে এনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অতীতের সমস্ত অবতারপুরুষদের ভাবসমষ্টি ও সমন্বয়মূর্তি ('as the consummation of all the prophets and saviours of the

past')। বর্তমান যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক বাণী ও আদর্শ দেশ,দেশ ও বিশ্বের একমাত্র উপযোগী: 'It is believed that His massage is most fitted for the present age of science and rationalism'। অসাম্প্রদায়িকতা, অন্ধবিশ্বাসহীনতা, সর্বজাতির উপর সমান ভালবাসা ও সহানুভূতিই বর্তমান যুগের আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দিব্য-আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে নিজের জীবনে দেখিয়েছেন ও বিশ্ববাসীর জন্য রেখেছেন।

তিনি আরো বলেছেন বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতাররূপে এসেছিলেন: 'The latest manifestation of Divinity was in the form of Bhagavan Sri Ramakrishana'। আমি তাঁকে নিজে দর্শন করেছি অর্থে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করেছি: 'Him I have seen, therefore, I have seen God'। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য সকল অবতারদের মহিমময় আদর্শ উপলব্ধি করেছি। সুতরাং যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তিনি যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ ও এমন কি নামরূপবর্জিত অথবা সবিশেষ পরমসত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যে বাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা করেছিলেন সে বাণী কি আমরা শুনি নি? সে বাণী হ'ল: 'যিনি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, রাম ও শ্রীচৈতন্য ছিলেন তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ'। * * এ' অতীব সত্য কথা! শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শই বর্তমান যুগের আদর্শ!" (—*Great Saviours of the World*, পৃ· ৩০-৩১)। শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে বিশ্বগুরু স্বামী বিবেকানন্দের কথাও তাই। আধুনিক যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। 'বাদশাহী আমলের টাকা এ'যুগে চলে না' বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত আজ নূতন সমাজের

জন্য। আমাদের উচিত সেই নতুন আদর্শকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করা ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পূর্ব সকল অবতার ও সত্যদ্রষ্টাদের প্রতি সমান শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "রামকৃষ্ণ পরমহংস যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার সে' বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই": "My dear brother, that Ramakrishna Parmahansa was God incarnate, I have not the least doubt of, * *,"। তিনি বলেছেন সাধারণ মানুষ তাঁর সম্বন্ধে যে যেভাবেই বলুক না কেন, আমরা তা বলি না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন প্রথমে অনুশীলন না ক'রে বর্তমান যুগে কেউ কখনো বেদ, বেদান্ত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্তশক্তি সন্ধানী-আলোর মতো সমস্ত ধর্মচিন্তা ও দর্শনের উপর ছড়ানো আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বেদ ও তার যথার্থ লক্ষ্যের জীবন্ত ভাষ্য: "Let people speak out their own opinions, why should we? Without studying Ramakrishna Paramahansa first, one can never understand real import of the Vedas, the Vedanta, of the Bhagavata and other Puranas. His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim (—*Complete Works*, pt. VII, p. 415)। সুতরাং অতীতের সকল মতবাদ ও ভাবসৌন্দর্যের প্রতি সমাদর ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করলেও আমাদের উচিত বর্তমান যুগের পরিপূর্ণ মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক আদর্শ সর্বতোভাবে অনুসরণ করা। আমাদের জীর্ণ পুরাতন সংস্কার দূর করা উচিত। বেদ, বেদান্ত ও সকল শাস্ত্র পড়ায় আপত্তি নাই, কিন্তু বেদ, বেদান্ত ও সকল শাস্ত্রের মর্ম যাঁর দিব্যানুভূতির সামনে সচল ও জীবন্ত হ'য়েছিল সেই অলৌকিক

শ্রীরামকৃষ্ণের জীনালোকে মিলিয়ে নিয়ে সকলগুলিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী করা উচিত। আমরা বেদান্তের সম্মান চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখবো, কিন্তু এই নবযুগের আদর্শে বেদান্তের ভাবধারা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে এক ক'রে আমরা দেখতে চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বেদান্তের পরিপূর্ণ মূর্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। শাঙ্করবেদান্তের মূলপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক ও সময়োপযোগী নূতন আদর্শের ধারা মিলিত হবে এবং সেই বেদান্ত হবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত'! অবতার পুরুষ ও তাঁর লীলাপার্ষদেরা আসেন এক এক যুগে এক এক রকম আদর্শের সচল বিগ্রহ হ'য়ে এবং সেই সেই যুগের মানুষের উচিত তাঁদের সেই সুমহান আদর্শের ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলা। নবপ্রেরণার আহ্বানে সাড়া দেওয়াতেই যুগজীবনের সার্থকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাকে অবহেলা করায় মানুষের কর্তব্যের প্রত্যবায় ঘটে।

সংক্ষেপে স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনার অবসরে ধর্মজগতে বর্তমান যুগের আদর্শসম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। এই সব আলোচনা ছাড়া তাওধর্ম (Taoism), জাপানের সিন্‌টোধর্ম (Shintoism in Japan), তিব্বতের লামাধর্ম (Lamaism in Tibet), বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম এবং স্পিরিচুয়ালিম্ বা প্রেততত্ত্ব, বিজ্ঞানের আলোচনা, জ্যোতিবিজ্ঞান (Astronomy) প্রভৃতি সকল বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বিরাট ও বিপুল। বর্তমান প্রগতিশীল বিজ্ঞানের যুগে অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যানেও ছিল তাঁর অভিনত্ব। দার্শনিক চিন্তার জগতে নূতন অবদান তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে আছে। গতানুগতিক বা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি তাঁর দার্শনিক চিন্তায় বরং বিরল। নবজাগরণ যজ্ঞের তিনিও ছিলেন হোতা, তাই সার্থক হয়েছে তার পুণ্য আগমন!

স্বামী অভেদানন্দ

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

॥ স্বামী অভেদানন্দের ক্লাসলেক্‌চার্স ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজযোগ

—২২শে ফেব্রুয়ারী ২৯২৪, শুক্রবার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজযোগ

—১০ই ডিসেম্বর ১৯২৪, বুধবার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাজযোগ

—১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, বুধবার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গীতা

—১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, শুক্রবার

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গীতা

—১লা মার্চ ১৯২৪, শুক্রবার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : গীতা

—১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার

সপ্তম পরিচ্ছেদ : উপনিষৎ

—১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, বুধববার

অষ্টম পরিচ্ছেদ : উপনিষৎ

—১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার

নবম পরিচ্ছেদ : বিবিধ প্রসঙ্গ

পরিশিষ্ট : পাদটীকা ও বিবরণী

॥ স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) ॥

জন্ম মঙ্গলবার ২রা অক্টোবর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে—শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধানে ১৮৮৩—তপস্যা ও ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ ১৮৮৮-১৮৯৫—বেদান্ত-প্রচারে লণ্ডনযাত্রা ১৮৯৬—লণ্ডন, ব্লুমস্ বেরী স্কোয়ারে খৃষ্টো-থিয়োজফিক্যাল্ সোসাইটিতে 'পঞ্চদশী' সম্বন্ধে বক্তৃতা, ২৭শে অক্টোবর ১৮৯৬—অধ্যাপক মোক্ষ-মূলার, পল্ ডয়সন্ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনা—প্রথমবার আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে আগমন, ৬ আগষ্ট ১৮৯৬—উইলিয়াম জেমস্, উইলিয়াম জ্যাক্সন, জোসিয়া রয়স্, অধ্যাপক ল্যান্ম্যান, অধ্যাপক টমাস এডিসন, প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ১৮৯৮—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্‌লীর সঙ্গে (ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম) পরিচয় ১৮৯৮—আলাস্কা, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি উত্তর-আমেরিকার বহু দেশে পর্যটন ও নানা প্রতিষ্ঠানে বেদান্ত প্রচার—য়ুরোপের লণ্ডন, প্যারি, বার্লিন, ইতালী প্রভৃতি মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান—ব্রুকলিন-ইনিষ্টিটিউটে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন (*India and Her People*) সম্বন্ধে বক্তৃতা ১৯০৫-১৯০৬—'ভারতের ধর্মভাব ও আদর্শ' (*Religious Ideal in India*) সম্বন্ধে বক্তৃতা—১৯০৭-১৯০৮ 'বেদের দর্শন ও ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা ১৯০৮-১৯০৯—ব্রুকলিন-ইনষ্টিটিউটের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের সভার (*Committee of Oriental Languages and Literature*) সভ্য নির্বাচিত ১৯০৭-১৯০৮ —ভারতে প্রথমবার প্রত্যাগমন ১৯০৬—আমেরিকায় পুনরায় গমন ১৯০৬—স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে হনলুলু, প্যাসিফিক-শিক্ষা-সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান ১৯০৬—চীন, জাপান,

ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালালামপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি পরিদর্শন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ১৯২১—বেলুড় রামকৃষ্ণ-মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত ১৯২২-১৯২৫ এপ্রিল—সমগ্র উত্তর-ভারতের স্থানসমূহ পর্যটন এবং কাশ্মীর ও তিব্বতে পরিভ্রমণ ১৯২২—বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন ১৯২৩—কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন ১৯২৩—দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম স্থাপন ১৯২৪—শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী-উৎসবে কলিকাতা টাউনহলে ধর্ম্মমহাসম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতি ১৯৩৭—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯—মহাসমাধি, শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

॥ তীর্থরেণু ॥

॥ পূর্বাভাস ॥

আলোচনা শুরু হয়েছে কলকাতার ইডেন হস্পিটাল রোডে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বেদান্ত সমিতির পুণ্যদিনগুলিকে স্মরণ ক'রে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তখন (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে) সপ্তাহে তিন দিন ক'রে ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। একদিন হতো গীতা, একদিন উপনিষৎ ও একদিন পাতঞ্জলদর্শন। প্রতি সপ্তাহের বুধ, শুক্র ও রবিবার ছিল সেই সব আলোচনার দিন নির্দিষ্ট। বৈকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে আরম্ভ হ'য়ে এক ঘণ্টারও উপরে চলতো সেই আলোচনা। কলকাতায় তখন সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা আগ্রহের ভাব দেখা যেত। শ্রোতাদের মধ্যে স্কুল ও কলেজের শোনার ছাত্র ও অধ্যাপকদের সংখ্যা ছিল বেশী। ক্লাসের ঘরে স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠতো। শ্রোতাদের বিপুল সমাবেশ এক উন্মাদনার সৃষ্টি করতো। ক্লাস চলতো প্রায় এক ঘণ্টারও বেশী তা আগেই বলেছি। ক্লাসের জন্য সামনের দিকে থাকতো মাঝারি রকমের একটা চৌকী। সেটাই প্ল্যাটফরমের কাজ করতো। তার উপর থাকতো চেয়ার। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বসতেন তার উপর। আলোচনা-সভায় এসে তিনি ধ্যানস্থ হতেন নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো। দু'তিন মিনিটের পরে শান্তিপাঠ করতেন সুমধুর অথচ গুরুগম্ভীর স্বরে—'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবাঃ" প্রভৃতি। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের স্বরমাধুর্যের রেশ এখনো আমাদের কানে বাজে, কোনদিন ভুলবো কিনা জানি না। তারপর তিনি কোনদিন হয়তো পাঠ করতেন

গীতার সেই অভয়প্রদ বাণী : 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' তাছাড়া অপরাপর শান্তিপাঠও তিনি করতেন ভিন্ন ভিন্ন দিনে। শান্তিবাচনের পর প্রণাম করতেন ধীরে ধীরে ভ্রূর মাঝখানে হাতদুটি রেখে। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হ'ত তিনবার ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ বাণী! শান্তির নিবিড় রসধারা যেন সকল শ্রোতার অন্তরে এক অব্যক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতো!

॥ রাজযোগ ॥

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৪

(শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায়)

॥ রাজযোগ ॥

পাতঞ্জলদর্শন বা রাজযোগের আলোচনা চলেছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বল্লেন প্রাণায়াম প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। প্রাণায়াম হঠযোগের একটি অঙ্গ। রাজযোগে হঠযোগের বিশেষ-কিছু সাধনা নেই। তবে প্রাণায়ামকে রাজযোগের একটা অঙ্গ বলা হয়েছে কেবল মনের চাঞ্চল্য দমন করার জন্য।

প্রাণায়াম মানে কি ? কেবল নাক দিয়ে বাতাস টেনে খানিকক্ষণ ধরে রেখে আবার ছেড়ে দেওয়ার নাম প্রাণায়াম নয়। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ প্রাণশক্তিকে দমন করা। প্রাণ + আয়াম—'প্রাণ' অর্থাৎ প্রাণশক্তি আর 'আয়াম' মানে দমন করা—to bring the breath under control। শ্বাসপ্রশ্বাস বা প্রাণবায়ুকে নিজের আয়ত্তে আনার নাম প্রাণায়াম।

প্রাণশক্তির রহস্য জানলে সাধনার সকল-কিছুই জানা হয়। প্রাণশক্তির সঙ্গে মনের নিবিড় সম্পর্ক। তাই প্রাণশক্তিকে দমন করলে মনকেও দমন করা যায়। তার জন্য যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের উপকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাণশক্তি কিন্তু জড়শক্তি নয়। উপনিষৎ একে প্রজ্ঞা থেকে অভিন্ন বলেছে। ঋগ্বেদে আছে,

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমো পরো যৎ।

*　　　*　　　*

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ॥

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং।' —ইত্যাদি

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না, সৎ ও অসৎ ছিল না, মৃত্যু ও অমরত্ব ছিল না, বায়ু কিম্বা আলোকও ছিল না, ছিল সমস্ত প্রলয়পয়োধিজলে মগ্ন। তখন একমাত্র অখণ্ড প্রাণশক্তি ব্রহ্মেতে লীন ছিল। শ্রুতিতে আছেঃ "ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম",—অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময় একমাত্র ঋত ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন। ব্রহ্মে প্রাণশক্তির বিকাশ থেকে পৃথিবী, জীবজগৎ, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলের সৃষ্টি। এই ব্রহ্ম কিন্তু সগুণ-ব্রহ্ম। অখণ্ড প্রাণশক্তির কম্পন থেকে ইলেকট্রনস, আইয়নস, এ্যাটমস, মলিকিউলস (electrons, ions, atoms, molecules) ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হ'ল। উপনিষদের এ'কথার সঙ্গে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের মতের সাদৃশ্য আছে।

আগেই বলেছি 'নাসদাসীন্নো সদাসীৎ'—আদিতে সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না, সদসতের অতীত এক পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি "আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ"। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র ছিল না। "স তপোহতপ্যত"। যখন তিনি জ্ঞানময় 'তপঃ' আচরণ করলেন তখনই "একোহহং বহু স্যাম"—'আমি এক, বহু হব' এই এক থেকে বহু হবার ইচ্ছা জাগ্রত হ'ল। ইচ্ছা বা সংকল্প তাঁতে vibration-এর (কম্পনের) আকারে সৃষ্টি হ'ল। তিনি নিজের ভিতর থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করলেনঃ "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত"। শুধু তাই নয়, সৃষ্টি ক'রে তিনি নিজেই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করলেনঃ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"।

সৃষ্টি অনাদি ও প্রবাহ আকারে নিত্য। ঋগ্বেদে আছেঃ 'যথাপূর্বমকল্পয়ৎ',—তিনি আগেকার মতো (যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি)

বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি অনাদি মানে প্রলয়ে সৃষ্টির কিছু নষ্ট হয় না, সবই cosmic mind বা বিরাট মনে (প্রকৃতিতে) সঞ্চিত থাকে। সৃষ্টি সংস্কাররূপে প্রকৃতিতে থাকে। সংস্কারই সৃষ্টির বীজ। প্রতিটি জীবের সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন। ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করেন জীবের সংস্কার-গুলিকে নিয়ে অথচ এতে ঈশ্বরের নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। সৃষ্টির বীজসমষ্টিই আসলে প্রকৃতি। এর নাম primordial energy বা মূলাপ্রকৃতি।

ঈশ্বর সংকল্প করলেন ও তাঁর ইচ্ছা বা কল্পনামাত্রে জগৎ সৃষ্টি হ'ল। ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রে সব সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি সমষ্টিমনের বিলাস। সমষ্টিমন প্রকৃতি বা অব্যক্ত। প্রকৃতি বা অব্যক্তকে নিয়েই ঈশ্বরের সত্তা ও সামর্থ্য। ঋগ্বেদে 'যথাপূর্বং'-শব্দ থাকার জন্য সৃষ্টি যে অনাদি ও প্রবাহাকারে নিত্য একথা বোঝাচ্ছে। পুরাণেও আছে: "মন্বন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সম্ভবাঃ"।[১] এভাবে পুনঃ পুনঃ প্রবাহাকারে সৃষ্টি চলে আসছে বলে সৃষ্টি অনাদি।[২]

সৃষ্টির উল্লেখ ক'রে শ্রুতি বলেছে: "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ * * তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।"[৩] উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়শা যেমন নিজের ভিতর থেকে লালা বা সুতো বার ক'রে জাল তৈরি করে আবার নিজের ভিতর প্রবেশ করিয়ে নেয় তেমনি এই জগৎও ব্রহ্ম (সগুণ) থেকে সৃষ্টি হয়েছে আবার (সগুণ) ব্রহ্মেই লয় পাবে। ব্রহ্ম তাই সৃষ্টি বা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুইই। ব্রহ্ম ছাড়া জগতের আর কোন কারণ নেই। মুণ্ডক-উপনিষদে বলা হয়েছে,

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ, প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥[৪]

জ্বলন্ত আগুন থেকে যেমন হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ অগ্নিকণার সৃষ্টি, হে সৌম্য, অক্ষর বা ব্রহ্ম থেকে তেমনি বিচিত্র বস্তুর সৃষ্টি। তারা আবার ব্রহ্মেই লয় পায়। উপনিষদে আছে,

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে।

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥[৫]

'তপসা' বা তপস্যা হ'ল সৃষ্টির উপযোগী জ্ঞান বা সংকল্প। এই সংকল্পের জন্য ব্রহ্ম 'চীয়তে' কিনা সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন। প্রথমে হয় অন্ন অর্থাৎ অব্যাকৃত বা অব্যক্ত, তা থেকে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মার জন্ম। প্রাণ থেকে সংকল্প ও বিকল্পাত্মক মন, তা থেকে 'সত্যং' কিনা আপেক্ষিক সত্যরূপ সূক্ষ্মপঞ্চভূতের সৃষ্টি। তারপর হয় 'লোকাঃ'—ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য ও তল, অতল, পাতাল ও সুতলাদি চতুর্দশ ভুবন। তারপর 'কর্ম' ও কর্ম থেকে হয় 'অমৃত'[৮] বা ফলের সৃষ্টি।

সৃষ্টিসম্বন্ধে সাংখ্যকার কপিল বলেছেন: "নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ,"[৯] অর্থাৎ অবস্তু বা আকাশকুসুমের মতো অভাব বা শূন্য থেকে কখনো ভাবপদার্থ জগতের সৃষ্টি হ'তে পারে না। কপিল প্রকৃতিকে সৃষ্টির কারণ বলেছেন। পরমাণুর রাগ (attraction) ও বিরাগ (repulsion) থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি: "রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ"।[১০] বৈশেষিকার কণাদের মতে কার্য ও কারণের পারস্পরিক মিলনে হয় সৃষ্টি। তিনি বলেন: "কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ",[১১]—কারণ ব্যতিরেকে কার্য হয় না। কণাদের মতে পরমাণু নিত্য।[১২] নিত্য পরমাণুকে তিনি সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণও বলেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের ইচ্ছা নিমিত্তকারণ আর পরমাণু উপাদানকারণ। দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ও চতুরণুকাদিক্রমে এই ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি। মহর্ষি কপিলও এই সূক্ষ্ম পরমাণুর কথা বলেছেন। তবে তাঁর মতে প্রথম প্রকৃতি, তারপর মহৎ, তারপর অহংকার ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির অভিব্যক্তি। প্রকৃতিই বিশ্বসৃষ্টির মূল। কপিল বেলছেন: "আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্যেঽপ্যণুবৎ"।[১৩] কপিলের মতে প্রকৃতি জড়া হলেও চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ তার পক্ষে

সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রকৃতি পুরুষের (চৈতন্যে) সান্নিধ্যে থেকে সৃষ্টি করে যেমন পঙ্গু ও অন্ধ পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় পথ চলে।

ঋগ্বেদে যে সৃষ্টির বর্ণনা আছে তা থেকে সলিল ও অন্ধকারের উল্লেখ পাই। এই সলিলই কারণসলিল যাকে আমরা প্রকৃতি বলি। "আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্,"—জীব-জগৎ সমস্তই পূর্বে (সৃষ্টি হবার আগে) অন্ধকার ও প্রলয়রূপ সলিলে মগ্ন ছিল ইত্যাদি। অপরাপর শাস্ত্রেও তাই। মনু বলেছেন: "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ"।[১৪] পুরাণে আছে: "আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ং" ইত্যাদি।[১৫]

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক জায়গায় ঐ সলিলের (কারণসলিলের) কথা পাওয়া যায়। শ্রুতিতে আছে: "অধস্তাৎ তা আপঃ,"[১৬] —পৃথিবীর নীচে (অধঃ) যে সমস্ত লোক সে সমুদয় অপঃ; "রেতস আপঃ,"[১৭]—ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিদেবতা অপরূপে (জল) আবির্ভূত; "অথৈতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরম্,"[১৮]—অপই প্রাণের শরীর; "অপো বা অর্ক,"[১৯]—অপই অর্ক; "যদ্বা দেবা অদঃ সলিলে সুসংবদ্ধা অতিষ্ঠত,"[২০]—এমন কি দেবতারাও ঐ সলিলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, "অপ এব সসর্জাদৌ",[২১]—বিধাতাপুরুষ আদিতে একমাত্র অপঃ সৃষ্টি করলেন ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে (১০।১৯০।৩) সৃষ্টিক্রমের (gradual process) বর্ণনায় অন্ধকার ও কারণসলিলের কথা বলা হয়েছে। যেমন,

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত-ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥৩

"তপঃ" (তাপ)[২২] থেকে সত্য ও ঋত অর্থাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি। তারপর অন্ধকার ও সলিলের (কারণ) সৃষ্টি। কারণসমুদ্র থেকে সংবৎসর (কাল—time) এবং তা থেকে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। তারপর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পূর্বেকার মতো সূর্য, চন্দ্র, দিবী, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক কল্পনা করলেন।

তৈত্তিরীয়-উপনিষদে[২৩] সৃষ্টির কথা আরো পরিষ্কারভাবে বলা আছে। ঋগ্বেদের 'তপসো' আর মুণ্ডক-উপনিষদের 'তপসা' একই অর্থের প্রকাশক! ব্রহ্মের কল্পনা বা সংকল্পের নাম 'তপঃ'। সংকল্প ব্রহ্মে অব্যক্ত আকারে (static অবস্থায়) থাকে। এই অব্যক্ত অবস্থা সাংখ্যের primordial energy বা মূলাপ্রকৃতি। বৈজ্ঞানিকেরা এই অবস্থার নাম দিয়েছেন ether বা ethereal space।[২৪] Ethereal space-ই আকাশ। শ্রুতিতে এই আকাশ 'অপঃ' বা কারণসমুদ্র। আকাশের ethereal particle-গুলো যখন vibrate করে (কাঁপে) তখন সে' অবস্থার নাম বায়ু বা মরুৎ। বায়ুর স্বভাব চাঞ্চল্য। বায়ু সর্বদা ক্রিয়াশীল। বায়ুর ক্রিয়াচঞ্চল ব্যক্তভাব 'তপঃ'-এর দ্বিতীয় অবস্থা। সমস্ত ethereal ocean (তড়িৎসমুদ্র) তখনও অত্যন্ত গরম থাকার জন্য যেন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে থাকে। এটাই 'অপঃ'-এর তৃতীয় অবস্থা। তখনও সৃষ্টি সম্পূর্ণ gaseous state-এ (বাষ্পীয় অবস্থায়) থাকে। সংস্কৃতে এ' অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'অগ্নি' যাকে লাটিন ভাষায় বলে 'ইগ্‌নিস্‌' (ignis)। পরে gaseous (বাষ্পীয়) অবস্থা থেকে হ'ল liquid (তরল) অবস্থার সৃষ্টি।[২৫] এটাই সৃষ্টির চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থাকে শ্রুতিতে 'অপঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদে আকাশ ও মরুৎকেও 'আপঃ' বা 'অপঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] 'আপঃ' বা 'অপঃ' অর্থে কারণ-সলিল বা সৃষ্টির বীজ। অপঃ সূক্ষ্মভূত তেজের পরে সৃষ্টি হয় এবং তা কারণসলিলের স্থূলরূপ। অপের পরে পৃথিবীর সৃষ্টি।

জগতের কিছুই নিত্য নয়। জগৎ ক্রমাগত বদলাচ্ছে। Change (পরিবর্তন) মানেই জগৎ। ঐ changing phase (পরিবর্তনের অবস্থা) আছে ব'লে জগৎ অনিত্য বা মায়া। যা চলছে বা ক্রমাগত বদলাচ্ছে তাই জগৎ ('গচ্ছতীতি জগৎ')। জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে—মোটেই স্থির নয়। আবার জগৎও একটা নয়, যেমন জীবজগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ, সৌরজগৎ এই রকম কত শত জগৎ আছে। মানুষের শরীরও একটা জগৎ,—miniature form-এ (ছোট আকারে) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

সৌরজগতের কথাই ভেবে দেখ। সূর্যের আশে পাশে শত সহস্র গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যটাই কত বড়! সায়েন্টিষ্টরা (বৈজ্ঞানিক) calculate (গণনা) ক'রে দেখেছেন সূর্যের circumference (পরিধি) পৃথিবীর (পরিধির) চেয়ে একশো ন'গুণ বড়, অর্থাৎ পৃথিবী যত বড়, সূর্যের circumference (পরিধি) তার চেয়ে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার (৮,৬৪,০০০) মাইল বড়।[২৭] চন্দ্রের চেয়ে আবার সূর্য চারশোগুণ বড়। পৃথিবীর যা circumference (পরিধি) তার অর্ধেক মঙ্গলগ্রহ! জুপিটারের diameter (ব্যাস) পৃথিবীর চেয়ে প্রায় এগারগুণ বড়। Weight-এও (ওজনেও) তেমনি ভারি তিনশো সতের গুণ পৃথিবীর চেয়ে। সৌরজগতে আরো অনেক বড় বড় গ্রহ আছে যারা সূর্যের চেয়ে অনেক লক্ষগুণ বড়।[২৮]

সৌরজগৎ ছাড়া আরো অনেক সৌরজগৎ আছে। সূর্য সেই বিরাট সৌরজগতের একটা গ্রহমাত্র। তারপর এমন সব নক্ষত্র বা ধূমকেতু আছে যা থেকে আলো আসতে হয়তো দশ লক্ষ বছর লাগে। কোন কোন নক্ষত্রের আলোর গতি এক সেকেণ্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল ক'রে হ'লে পৃথিবীতে আলো তার আসতে লাগবে হয়তো পঞ্চাশ লক্ষ বছর। বৈজ্ঞনিকেরা অঙ্ক কষে এসব ঠিক করেছেন।

সৌরজগতে এমন অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে যাদের থেকে পৃথিবীতে আলো এসে এখনো পৌঁছায় নি বা আলো এসে পৌঁছোবার আগেই হয়তো সে সব গ্রহ উপগ্রহ নিভে গেছে। আলোর গতি এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার (১,৮৬,০০০) মাইল। এখন একটা গ্রহ পঁচিশ বছর আগে সৃষ্টি হলে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ঐ speed-এ (গতিতে) দৌড়েও যদি তার আলো আজো পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে না পৌঁছোয় তাহ'লে আকাশের vastness (বিশালতা) কতখানি ভেবে দেখো! তার immensity of depth-ই (গভীরতার পরিমাপই) বা কতখানি! মানুষ কল্পনা করেও তা ধারণায় আনতে পারে না![২৯]

পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ন'শো ঊনত্রিশ লক্ষ (৯,২৯,০০,০০০) মাইল দূরে। সূর্যকে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বল্লেও চলে। কিন্তু এই সূর্যও একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কেননা প্রতিদিনই কিছু কিছু ক'রে তার পরমায়ু ক্ষয় হচ্ছে।[৩০] আবার নতুন সূর্য nebula-র (নীহারিকার) আকারে তৈরি হচ্ছে। এ'রকম কত সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে এখনো আকাশে ঘুরছে। টেলিস্কোপ (দূরবীন) দিয়ে তাদের দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এদের dying suns (মৃত বা ঠাণ্ডা সূর্য) বলেন।[৩১]

আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন সেখানকার (ক্যালিফোর্নিয়ার) সবচেয়ে বড় Mount Wilson-এর কার্নেগি Observatory (পর্যবেক্ষণাগার) দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার telescope (দূরবীনযন্ত্র) পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়।[৩২] একশো ইঞ্চি তার diameter (ব্যাস)। তার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। অনেক দূরের গ্রহ নক্ষত্র খালি চোখে যা কখনো দেখা যায় না, Mount Wilson-এর telescope দিয়ে দেখা যায়। সেদিন দেখেছিলেম সমস্ত আকাশ যেন লক্ষ লক্ষ গ্রহ

উপগ্রহ আর জ্বলন্ত nebula-য় (নীহরিকায়) ভর্তি হ'য়ে আছে।[৩৩] এত বড় বিরাট বিচিত্র সৃষ্টি—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, জীব-জগৎ এ'সবেরও একদিন ধ্বংস আছে। প্রতিমুহূর্তে সকল জিনিষ কিছু কিছু বদলাচ্ছে। সব যেন বায়স্কোপের ছবির মতো। বৈজ্ঞানিকেরা একথা স্বীকার করেন। তাঁরাও আর কেবল জড়বস্তু নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারছেন না।[৩৪]

কিন্তু এই পরিবর্তনের ভিতর একটা কিছু আছে যার কোনকালে পরিবর্তন নেই। তা হচ্ছে আমাদের আত্মা। এরই একমাত্র real existence (প্রকৃত সত্তা) আছে। তা ভিন্ন আর সমস্তই দেশ, কাল ও নিমিত্তের ভিতর। জন্মাচ্ছে ও মরছে—সুতরাং অনিত্য। আত্মাই একমাত্র দেশ, কাল ও নিমিত্তকে transcend (অতিক্রম) ক'রে আছেন। দেশ, কাল ও নিমিত্তই 'মায়া'। এই মায়ার দ্বারা ব্রহ্ম কিন্তু limited (পরিচ্ছিন্ন) নন। তিনি "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো"। মোটকথা শুদ্ধব্রহ্মে মায়ার কোন কল্পনা নেই, কল্পনা যত-কিছু সগুণব্রহ্মকে নিয়ে। সগুণব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টির কল্পনা। জীব জগৎ ঈশ্বর প্রভৃতির কল্পনা সগুণব্রহ্মকে নিয়ে। নির্গুণব্রহ্ম এ'সবের অতীত।

আত্মাই জগতের একমাত্র অধিষ্ঠান যার উপর সকল পরিবর্তন হ'চ্ছে। যেমন বায়স্কোপের ছবি—ক্রমাগতই বদ্‌লাচ্ছে—একটার পর একটা pass (অতিক্রম) ক'রে চলেছে। তবে তার background (পৃষ্ঠভূমি বা অধিষ্ঠান) যে screen-টা (পর্দা) তা কিন্তু ঠিক (স্থির) থাকে। সে' রকম ব্রহ্ম পরিবর্তনশীল্ জগতের কল্পিত অধিষ্ঠান। জগৎ প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে, কিন্তু ব্রহ্ম স্থির ও কূটস্থ। মায়া তাই change (পরিবর্তন) ছাড়া অন্য কিছু নয়। মায়া ও জগতের তাই পারমার্থিক সত্তা কিছু নেই। মায়ার বিকার আছে, কিন্তু আত্মা সর্বদাই নির্বিকার। এই ভাবটা তন্ত্রে আর এক রকম ক'রে বোঝানো হয়েছে।

কালী জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিময়ী। তিনিই লীলা করেন শিবের বুকে দাঁড়িয়ে। শিব নির্বিকার। তন্ত্রে শিবকে তাই শব বলা হয়েছে। শিবের বুকে কালী চিরচঞ্চলা। Static ও dynamic। শিব বা ব্রহ্ম static (স্থির বা অচঞ্চল) আর কালী dynamic (চঞ্চলা)। এই শিব অদ্বৈতবেদান্তের নির্গুণব্রহ্ম নন, কারণ নির্গুণব্রহ্মে মায়া নেই,—সৃষ্টির কল্পনাও নেই। তন্ত্রের শিব শক্তিকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তন্ত্রের শিব তাই সগুণব্রহ্ম।

তন্ত্রেও নির্গুণব্রহ্মের কল্পনা আছে। তাঁর নাম সদাশিব। সগুণব্রহ্ম হলেন মহাকাল। মহাকাল সদাশিবের উপর শায়িত। কালী মহাকালের উপর আসীনা। তন্ত্রে তাই দুই শিবের কল্পনা করা হয়েছে। শক্তি কিনা primordial energy (বিশ্বপ্রকৃতি বা মহামায়া)। কারণাকার শুদ্ধচৈতন্যরূপী শিবের সঙ্গে শক্তি মিথুনীকৃত থাকেন। যে ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয় বা যে ব্রহ্মে সৃষ্টির বীজ কল্পনা করা হয় তা সগুণব্রহ্ম। তন্ত্রের মহাকাল ও কালী দুই একসঙ্গে থাকেন। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' (তৈত্তিরীয় উ৹ ৩।১) বাক্যের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন যা থেকে সৃষ্টি হয়, যাতে সৃষ্টি স্থিত ও যাতে তা লয় পায় তাই সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্মে সৃষ্টি নেই বা সৃষ্টির কল্পনাও নেই। সৃষ্টিই বৈচিত্র্য —যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ। সমুদ্র স্থির, নিস্তরঙ্গ ও প্রশান্ত। একেই শিব বা সগুণব্রহ্মের অবস্থা ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। প্রশান্ত সমুদ্রের উপর যখন তরঙ্গ উঠলো তখনই সৃষ্টি। তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রকে শক্তি, কালী বা সৃষ্টি বলা হয়। দুই একই, কেবল একটাতে ক্রিয়া নেই কিনা একটা কারণ বা অব্যক্ত রূপে থাকে আর একটায় ক্রিয়া থাকে কিনা ব্যক্ত বা সক্রিয়। শিব ও শক্তির কল্পনাও তাই। তবে বেদান্তে যে নির্গুণব্রহ্ম তাতে মায়ার লেশমাত্র নেই। একথা

বোঝানোর জন্য নিশ্চঞ্চল সমুদ্রের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা করা হয়েছে। আসলে static-এর ধারণা ঐ নির্গুণব্রহ্মকে উপলক্ষ্য ক'রে। সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলতে সগুণব্রহ্ম বা অব্যক্ত। সৃষ্টি বা মায়াকে লক্ষ্য করেই static ও dynamic শব্দ-দুটি আমরা ব্যবহার করি। Static কিনা অব্যক্ত বা সগুণব্রহ্ম—ঈশ্বর। সৃষ্টির বীজ তাতে অব্যক্ত অবস্থায় বা কারণকারে থাকে, আর dynamic কিনা ব্যক্ত—যেমন বীজটা গাছে পরিণত হ'ল। একটা কারণ আর একটা কার্য—cause and sequence। একেরই আবার দুটো রূপ বা অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন সাপের চলা আর সাপের স্থির অবস্থা। কিন্তু একই সাপ। জলেরই তরঙ্গ, আবার তরঙ্গই জল।

তন্ত্রে শিব শক্তির background (অধিষ্ঠান)। শিবের উপর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, অথচ শিব বিকারশূন্য। এজন্য বলা হয়েছে শিবের বুকে কালী। কালী নৃত্য করেন কিনা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, আর শিব শব বা নিষ্ক্রিয় হয়ে কালীর পায়ের তলায় থাকেন। একটি ক্রিয়াশীল ও অপরটি নিষ্ক্রিয়। তন্ত্রে ও বেদান্তে একই ভাব, তবে conception-র (ধারণার) পার্থক্য। তন্ত্রকে তাই অনেকে বেদান্তের practical side (ব্যবহারিক দিক) বলেন।[৩৫]

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও একথা মানেন, তবে একটু অন্যভাবে। তাঁরা বলেন সমস্ত বিশ্ব এক শক্তির বিকাশ। শক্তি তাঁদের মতে *energy*।[৩৬] *Energy*-কেই তন্ত্রে আদ্যাশক্তি বলা হয়েছে। একই *energy* (শক্তি) কখনো ব্যক্ত আবার কখনো অব্যক্ত। বৈজ্ঞানিকেরা ব্যক্ত অবস্থার নাম বলেন kinetic আর অব্যক্তের নাম potential।[৩৭] একটা স্থূল ও অপরটা সূক্ষ্ম বা কারণ। ব্যক্ত ও অব্যক্ত। বেদান্ত-দর্শনেও তাই। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই মায়াকে আশ্রয় ক'রে কখনো ব্যক্ত আবার কখনো অব্যক্ত। বেদান্তের যিনি ব্রহ্ম, বিজ্ঞানের তাই

energy (শক্তি)। তবে আবার ঠিক একও নয়। বৈজ্ঞানিকেরা এখনো এতদূর মানতে রাজী নন।

সাংখ্যের প্রকৃতিও তাই। তবে প্রকৃতিকে সাংখ্যে জড়া বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে energy-র heat ও motion (তাপ ও গতি) দুটো বিকাশ। সাংখ্যেও আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির কথা আছে। Contraction ও repulsion। বিজ্ঞানের মতে heat, light, motion, sound electricity (তাপ, আলো, গতি শব্দ, বৈদ্যুতিক শক্তি) সবই এক energy-র ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বিকাশ। বৈজ্ঞানিকেরা তাই বলেন heat-energy, light-energy।[৩৮]

কিন্তু এই *energy* বৈজ্ঞানিকদের মতে indestructible ও uncreated (ধ্বংসবিহীন ও নিত্য)। Matter-ও (জড়ও) তাই। আজকাল energy-কেও আবার ভাগ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের *conservation of energy* (শক্তিসংরক্ষণ) অনেকটা তাই। *Conservation of energy*-মানে *energy* যে কোন আকার বা রূপই নিক না কেন আসলে তার কোন ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না, amount বা পরিমাণ সমান থাকে। তবে রূপের কেবল পরিবর্তন হয়। *Conservation of energy* (শক্তিসংরক্ষণ) আমাদের নিজেদের (শরীরের) দিক দিয়েও বটে। Vital energy-কে রক্ষা বা সঞ্চয় করার নামই *conservation of energy*। *Vital energy* কিনা প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিকে বেদে বা শ্রুতিতে 'প্রজ্ঞা' বলা হয়েছে। প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাত্মা ও প্রাণ একই।[৪০] প্রাণকে আবার ব্রহ্ম (সগুণ) বলা হয়েছে। One breathed the breathless breath। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র বস্তু (সৎ) ছিল। এই হ'ল ঋগ্বেদে নারদীয়সূক্তের "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা। প্রাণশক্তি বা প্রাণের কম্পন থেকে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ঃ "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"।[৪১] আচার্য শঙ্কর 'এজতি'-শব্দের অর্থ করেছেন 'কম্পতে'। কম্পন

বা vibration। প্রাণের vibration (কম্পন) থেকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। বিজ্ঞানে তাই বলা হয়েছে: "everything, in this world, is in the state of motion or vibration (জগতের সকল-কিছু পদার্থ কম্পনের আকারে থাকে)। বিশ্বের সকল জিনিসই ক্রমাগত কাঁপছে—in constant motion or vibration। Vibration-ই change বা পরিবর্তন। আবার পরিবর্তনই প্রপঞ্চ বা সৃষ্টি।

সবই প্রাণের খেলা। সবই প্রাণের স্পন্দন। প্রাণই প্রাণশক্তি। রাজযোগে প্রাণায়ামের কি প্রয়োজন তার কথা আগে বলেছি। প্রাণায়ামের উপযোগিতা কেবল প্রাণশক্তিকে conserve (সংরক্ষণ) করার জন্য। Spinal column-এর (মেরুদণ্ডের) দু'ধারে ইড়া ও পিঙ্গল দুটো নাড়ী আছে। মাঝখানে সুষুম্না নাড়ী। যোগশাস্ত্রে এদের গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলে কল্পনা করা হয়েছে। কল্পনাই সাধনার means (অবলম্বন)। তবে কল্পনারও একটা অবলম্বন (অধিষ্ঠান) থাকে। কোন বস্তু ছাড়া কোন কল্পনা হয় না। ব্রহ্ম কিন্তু কল্পনার বাইরে। জগৎ মনেরই সৃষ্টি। মন কিনা কল্পনা। প্রজাপতি কল্পনা করলেন 'একোঽহং বহু স্যাম'—আমি 'বহু হব', তাই তিনি বহু হলেন। এও নিছক কল্পনা। সাধনার জগতে কল্পনার প্রয়োজন আছে।

সুষুম্না যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে তাকে বলে basic lotus (মূল বা আধারপদ্ম)। ওকেই মূলাধার বলে। যোগীরা পদ্ম কল্পনা করেন। মূলাধারই store-house of *energy* (প্রাণশক্তির ভাণ্ডার)। Current of energy (তরঙ্গ আকারে প্রাণশক্তি) স্বভাবত ইড়া ও পিঙ্গলা দিয়ে প্রবাহিত হয়। যোগীরা একে সুষুম্না-পথ দিয়ে চালাতে চেষ্টা করেন। এর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। তাই ওজঃশক্তির প্রয়োজন। ধ্যান, ধারণা ও প্রাণায়াম যারা

অভ্যাস করে তাদের ওজঃশক্তি বাড়াতে হয়। ওজঃশক্তি বাড়ানো মানে শক্তি সঞ্চয় করা। সুষুম্নায় প্রাণশক্তিকে concentrate বা কেন্দ্রীভূত করার নাম *conservation of energy* (শক্তিসংরক্ষণ)। কল্পনার ভিতর দিয়ে বাস্তবে পৌছানো যায়। প্রজাপতি কল্পনা করলেন আর অমনি বাস্তব জগৎ সৃষ্টি হ'ল। তেমনি 'আমি ব্রহ্ম' বারবার চিন্তা ও মনন করলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

রাজযোগ অভ্যাস করতে হলে সংযম শিক্ষা করা দরকার। খাওয়া, পরা, চলা ও বসা থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনের সমস্ত-কিছু অভ্যাসকে regulate (নিয়ন্ত্রিত) করতে হয়। Regulate করা মানে নিজের বশে আনা বা control (দমন) করা। শরীর তো মনের দাস। মনকে বশে আনতে পারলেই শরীর আপনি বশে আসে। মনঃসংযম হলে বা মন আয়ত্তে এলে দুনিয়ার সকল বস্তু নিজের আয়ত্তে আসে। রাজ্য জয় করার চেয়েও মন জয় করা অত্যন্ত কঠিন। রাজযোগে তাই মনকে জয় করতে বলা হয়েছে। মনকে জয় বা দমন করা মানেই প্রাণশক্তিকে আয়ত্তে আনা—প্রাণের উপর control (প্রভুত্ব) আনা। যোগশাস্ত্রে তাই প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান ও ধারণার ব্যবস্থা আছে।

প্রাণায়াম করার নির্দিষ্ট একটা process (প্রণালী) আছে। মনে মনে কল্পনা করতে হয় nerve-current-কে (নাড়ী দিয়ে যে প্রাণশক্তি বয়ে যাচ্ছে তাকে) মূলাধার দিয়ে সুষুম্নায় নিয়ে যাচ্ছ। মূলাধারে *vital energy* (প্রাণশক্তি) stored up (জমা বা সঞ্চিত) থাকে। তাকেই কুণ্ডলিনী বলে। কুণ্ডলিনী আর কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি একই। তন্ত্রে কুণ্ডলিনীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।[৪৪] আসলে ওটা *vital energy* বা প্রাণশক্তি। *Energy* সাধারণ অবস্থায় inactive-র (জড়ের) মতো থাকে। সাধক রামপ্রসাদ গানে বলেছেন: 'প্রসুপ্তা ভূজগাকারা * * স্বয়ম্ভুশিববেষ্টিনী'। স্বয়ম্ভু শিব[৪৫] মূলাধারেও

থাকেন। সহস্রারে শিবের নাম পরমশিব। ইনিই pure consciousness (শুদ্ধচিৎ) বা শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। মূলাধারে যে শিব থাকেন তিনি জীবরূপী শিব। সাধারণ জীবই পরে শিব হয়। তখন জীব পরমশিব। *Vital energy*-ই (প্রাণশক্তিই) pure consciousness-এ (শুদ্ধচিৎ-এ) রূপান্তরিত হয়।[৪৬] রূপান্তরিত হওয়া মানে being into becoming (কারণ কার্যে রূপান্তরিত হওয়া)।

জীব স্বরূপে শিব। অজ্ঞানে থাকে বলেই জীব। শক্তি শিবকে সাড়ে তিন আবর্তে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে—'প্রসুপ্তভুজগাকারা'। জীবের অজ্ঞানের অবস্থাকে এরকম ক'রে বোঝানো হয়েছে। 'ভুজগাকারা' কিনা শক্তি সাপের মতো এঁকে বেঁকে ওঠে। শক্তির গতি এঁকে বেঁকে যাওয়া। বিজ্ঞানে *energy*-র (শক্তির) গতিও তাই। Sound-এর (শব্দের) গতি wave-form-এ (তরঙ্গের আকারে)। শক্তিকে তাই সাপ বলা হয়েছে। শক্তি মূলাধারে যেন circle form (বৃত্ত গঠন) ক'রে থাকে। Circle (বৃত্ত) অনন্তের চিহ্ন,—the emblem of eternity। শক্তি যে অনাদি ও অনন্ত circle-ই (বৃত্তই) তার প্রমাণ। শক্তিকে তাই circle কল্পনা করা হয়েছে। জীব ও মায়া উভয়েই অনাদি ও অনন্ত। যতদিন অজ্ঞান ততদিন জীব আর ততদিনই অনন্ত। জ্ঞান হ'লে এ'সব বোধ আর থাকে না। তখন মনে হয় উপাধি বা মায়া সান্ত। জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের নাশ হয় বলেই অজ্ঞান বা মায়া সান্ত।

সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনী যখন ঘুমন্ত বা coiled up হ'য়ে (বৃত্তের মতো জড়িয়ে) থাকে তখন জীব। জীব তখন অজ্ঞানে থাকে। তখনও জীবের চেতনা হয় নি। জাগ্রত মানেই to restore consciousness (স্বরূপজ্ঞানকে ফিরিয়ে পাওয়া)। সহস্রারে পরমশিব স্বয়ংপ্রকাশ ও চৈতন্যরূপে সর্বদাই প্রকাশিত। এই চৈতন্যই আত্মা। উপনিষদে এঁকে 'প্রজ্ঞাত্মা' বলা হয়েছে।

প্রকাশস্বরূপ আত্মাই জীবের আসল স্বরূপ। সাধকের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে সিদ্ধি লাভ হয়। সুপ্তশক্তিকে মূলাধারে জাগ্রত ক'রে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলন করাতে হয়। অব্যক্তকে ব্যক্ত ক'রে পরে স্বরূপে স্থির করার নাম মিলন। এর সব সাধনা বা process (প্রণালী) আছে। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন হলে জীবের স্বরূপের জ্ঞান হয়। তখনই মুক্তি। সাধক তখন জন্ম ও মৃত্যুর পারে যায়। তখন আর জন্ম হয় না।

যোগশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমির (স্তর) কল্পনা করা হয়েছে। এক এক ভূমির অনুভূতি এক এক রকমের। যোগীরা ভাবরাজ্যে এ'সব উপলব্ধি করেন। মনেরই এক একটা স্তর বা অবস্থা। এ'সব ভূমি এক একটা চক্র বা পদ্ম। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। ষট্‌চক্রের পর সহস্রার প্রধান চক্র বা পদ্ম। যোগশাস্ত্রে সহস্রারকে সপ্তমভূমি বলা হয়েছে। সকল চক্রের ধ্যান ও রূপের কল্পনা করা হয়েছে। আমি যখন আমেরিকায় তখন একদিন এক বিশিষ্ট ডাক্তার-বন্ধুর অনুরোধে একটি dissection-এর class attend করি (শবব্যচ্ছেদের ক্লাসে যোগদান করি)। আমার অত্যন্ত কৌতূহলও হয়েছিল এসব দেখার। Spinal column-এর (মেরুদণ্ডের) ভিতর একটা cord থাকে। সেই spinal cord থেকে শরীরের সমস্ত nerve (শিরা) বেরিয়েছে। এদের spinal nerves (মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু) বলে। Spinal cord-এর মাঝখানে খুব একটা সরু ও সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। তাকে central canal of the spinal cord (মেরুদণ্ডের ভিতরে ছিদ্রপথ) বলে। তা একটা fluid substance (জলের মতো তরল পদার্থ) দিয়ে ভর্তি থাকে। যোগীরা একেই সুষুম্না ব'লে কল্পনা করেছেন। কল্পনা ভাবরাজ্যের কথা। যেকোন ভাব না থাকলে সাধনা পরিপুষ্ট হয় না। ভাব বা কল্পনাই পরিশেষে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

(১০ই ডিসেম্বর ১৯২৪)

(বুধবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা)

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী',—যার যেমন ভাবনা সে সে'রকম ফল পায়। ছেলেবেলা থেকে যদি তোমার মনে প্রবল ইচ্ছা থাকে যে তুমি একজন উকিল হবে তবে নিশ্চয়ই পরে উকিল হবে। আবার যদি মনে করো একজন বড় গায়ক হবে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাই হবে। গোড়া থেকে যদি তোমার লক্ষ্য থাকে তুমি একজন বড় সাধক হবে ও এই জন্মেই ভগবান লাভ করবে তবে অবশ্যই তা হবে। আসলে তোমার চিন্তাস্রোত যে দিকে থাকবে সেইদিকে তোমায় টেনে নিয়ে যাবে। চিন্তাস্রোত তোমার শরীর, মন, বুদ্ধি, চরিত্র সব-কিছুকে mould (গঠন) করে।

কিন্তু চিন্তাস্রোতের origin (উৎপত্তি) কোথা থেকে? ওর origin (সৃষ্টি) মনে। মন বলতে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণের কাজ চার রকম: (১) সংকল্প ও বিকল্প (২) কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয়ীকরণ, (৩) কোন জিনিস জানার আগ্রহ ও অনুসন্ধান, ও (৪) অভিমান। সবগুলিই অন্তঃকরণের বৃত্তি। বৃত্তি কিনা মনের কার্যাকারে পরিণতি। বৃত্তি মনের একটা form বা গঠন। একই অন্তঃকরণ যখন সংকল্প বা বিকল্প করে অর্থাৎ 'এই জিনিসটা করব' কি 'করব না' এ'রকম 'ইতি' ও 'নেতি' ভাব গ্রহণ করে তখনই 'মন'। কোন কার্য করব—কি করব না, তার নিশ্চয় করার যে বৃত্তি তাই 'বুদ্ধি'। ঠিক ঠিক ভাবে জানার, ধারণার বা

কল্পনার নাম 'চিত্ত', আর কোন-কিছু করা অথবা না-করার জন্য অভিমানের নাম 'অহংকার'। একই অন্তঃকরণ চার রকম কাজ করে ব'লে চারটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে অন্তঃকরণ একটাই। একেই ইংরাজীতে mind অথবা mind substance বলে।

মনের শক্তি অসাধারণ। এমন কোন অসাধ্য কাজ নেই যা মন করতে পারে না। শাস্ত্রে মনকে তাই মত্তহস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মত্তহস্তী যেমন ভয়ানক প্রকৃতির, এক মুহূর্তও স্থির থাকে না, মনও তেমনি সর্বদা চঞ্চল। এই এক বিষয় ভাবছে, আবার পরক্ষণে অন্য একটা বিষয় চিন্তা করছে, সেই চিন্তা গেল তো আবার একটা চিন্তার তরঙ্গ উঠলো, সেটাও কিছুক্ষণ পরে আবার মিশে গেল। এ' রকম ক'রে চিন্তার পর চিন্তার স্রোত চলতে থাকে—একমুহূর্তও বিরাম নেই। এ' যেন চলমান জলস্রোত। মনকে আর এক কথায় তরঙ্গযুক্ত সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মহাসমুদ্রে তরঙ্গের যেমন বিরাম নেই, একটার পর একটা উঠছে, ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে মিশে যাচ্ছে আবার উঠছে, মন-সমুদ্রেও তাই, মনে একটা চিন্তা উঠে মিশিয়ে গেল তো আবার একটা চিন্তাতরঙ্গ উঠলো। psychologist-রা (মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা) মনকে তাই finner matter in vibration (সূক্ষ্ম পদার্থসমূহের কম্পনসমষ্টি) বলেন। Mind substance-এর (মনরূপ পদার্থের) fine particle-গুলো (সূক্ষ্ম উপাদানগুলো) ক্রমাগতই কাঁপছে কিনা ক্রিয়াশীল।[৪৭] চিরচঞ্চল তাই মন। চঞ্চল মনকেও আবার আয়ত্তে আনা যায়। আয়ত্তে আনা মানেই স্থির করা। যে উপায় বা প্রণালী দিয়ে চঞ্চল মনকে স্থির করা যায় তার নাম 'যোগ'। 'যোগ' কিনা কর্মের tricks বা কৌশল। গীতায় বলা হয়েছে: "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"।

মনই দেহ-সংসারের কর্তা। দেহযন্ত্র ওঠে বসে চলে—সবই মনের ইঙ্গিতে। মনই দেহকে সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যায়। যে

কাজই তুমি করো তা বাসনার আকারে প্রথমে মনের মধ্যে ওঠে, তারপর মন প্রেরণা পাঠায় brain-এর (মস্তিষ্কের) through (ভিতরে) দিয়ে দেহের পেশীগুলিতে আর সেই প্রেরণার (stimulation) সংঘাতে পেশীগুলি ক্রিয়াশীল হয়। যেমন তুমি একটা চেয়ার তুলবে। প্রথমে ঐ চেয়ার তোলার সংস্কার ইচ্ছার আকারে তোমার মনের ভিতর জাগলো। তারপর সেই ইচ্ছা আবার vibration-এর (কম্পনের) আকারে তোমার brain-এর ভিতর গেল ও brain-centre (মস্তিষ্ককেন্দ্র) থেকে তারপর তোমার হাতের পেশীগুলিতে গিয়ে আঘাত করলো। দেহের প্রত্যেক পেশীতে ও প্রতিটি অংশে হাজার হাজার সূক্ষ্ম পরমাণু আছে। সেই পরমাণুদের প্রাণ আছে, কারণ তারা জীবিত। সুতরাং মন থেকে ইচ্ছা যখন vibration-এর (কম্পনের) আকারে উঠলো ও হাতের পেশীগুলিতে আঘাত দিলে, পেশীর পরমাণুগুলো তখন সঙ্গে সঙ্গে vibrated (কম্পিত) হ'য়ে ওঠে আর তখনই তোমার হাত চেয়ারটিকে তোলার জন্য প্রেরণা পায় ও তোলে। সুতরাং চেয়ার তোলার ইচ্ছা প্রথমে মনে ওঠে, মন সেটা পাঠায় brain-এ, brain-এ self-consciousness (আত্মা) থেকে sanctioned (সমর্থিত) হ'য়ে আসে মনেতে, তারপর মন তাকে পাঠায় হাতের পেশীতে যে সব পরমাণু রয়েছে সেগুলিতে, তারপর তোমার হাত কাজ করে। এই যে internal process (ভিতরের ব্যাপার) এটা ঘটে এক নিমেষের মধ্যে, তাই আমরা এর কিছু বুঝতে পারিনি, কেবল দেখি মনেতে ইচ্ছা ওঠামাত্র কাজটা হয়ে গেল।

মনকে psychologist-রা (মনস্তত্ত্ববিদেরা) সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করেছেন : conscious (চেতন), subconscious (অবচেতন) বা unconscious (নিশ্চেতন বা অচেতন) ও superconscious states of mind (চেতনাতীত মনের অবস্থা)।[৪৮] Conscious state of

mind (মনের চেতন স্তর) হ'ল যে মন বর্তমানে কাজ করছে। যেমন আমরা জেগে আছি, চলছি, ফিরছি, কথা কইছি, চিন্তা করছি, খাচ্ছি, বসছি—এই সব। Subconscious বা unconscious state of mind (মনের অবচেতন বা নিজ্ঞান স্তর) হ'ল যেখানে কাজের সংস্কারগুলো জমা ও সুপ্ত হ'য়ে থাকে। Subconscious mind (অবচেতন মন) কিন্তু conscious mind-ই (চেতন মনের), কেননা subconscious mind-এ (অবচেতন মনে) যেটা সূক্ষ্ম সংস্কারের আকারে থাকে, conscious mind-এ (চেতন মনে) সেটাই স্থূল বা কার্যের আকারে প্রকাশ পায়। একটা অব্যক্ত আর অপরটা ব্যক্ত, একটা কারণ আর অপরটা কার্য—এই যা প্রভেদ। জিনিস একটাই, যেটা অব্যক্ত সেটাই পরে ব্যক্ত।[৪৯] Unconsciousness ও subconsciousness (নিশ্চেতনা ও অবচেতনা) একই কথা।[৫০] সাধারণত unconsciousness-কে (নিশ্চেতনাকে) আমরা বলি অজ্ঞান বা অচৈতন্যের অবস্থা। মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে গেলে আমরা মনে করি যে তার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু আসলে তা নয়। অজ্ঞান অবস্থায় 'জ্ঞান থাকে না' মানে জ্ঞান subconscious (অবচেতন) অবস্থায় থাকে। Then it goes back to its causal state (তখন ব্যক্ত জ্ঞান তার কারণ অবস্থা অব্যক্তে ফিরে যায়)। সুতরাং অজ্ঞান বা চৈতন্য অবস্থায় জ্ঞান থাকেই, তবে তা বাইরে প্রকাশ পায় না—এই যা। এখন জ্ঞান যদি সে অবস্থায় না থাকে তবে অজ্ঞান অথবা মূর্ছার অবস্থা থেকে ফিরে এলে জ্ঞান বা আগেকার সকল স্মরণশক্তিই বা মানুষ আবার ফিরে পায় কি ক'রে? আসলে সকল জিনিসের স্মৃতি মানুষের জ্ঞানে (consciousness-এ) থাকে। কোন স্মৃতিই কোনদিন নষ্ট হয় না, তবে তার প্রকাশ বা অপ্রকাশ থাকতে পারে। প্রকাশ হ'লে তাকে বলি conscious (সজ্ঞান) আর অপ্রকাশ হ'লে তাকে বলি subconscious অথবা

unconscious (নির্জ্ঞান)। তাই unconscious state-ও (নির্জ্ঞান অবস্থাও) মনের positive state (অস্তিবাচক অবস্থা),—negative (নেতিবাচক) নয়।[৫১] অচৈতন্য বা অজ্ঞান মানে devoid of consciousness or knowledge (চৈতন্য বা জ্ঞানের না থাকা) নয়, চৈতন্য বা জ্ঞানের তা unmanifested (অব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত) অবস্থা মাত্র।

মনের এমনই শক্তি তা জগতে সকল-কিছুই করতে পারে। মনের এই শক্তিকে will-power বা will-force (ইচ্ছাশক্তি) বলে। Supernatural power (অপ্রাকৃতিক শক্তি), অলৌকিক শক্তি বা ভৌতিক শক্তি ব'লে যাদের মনে করি সে সকল আসলে মনেরই শক্তি। Hypnotism, telepathy বা though-transference, clairvoyance, clairaudience বা thought-reading (সম্মোহন বা বশীকরণ, পরচিত্তজ্ঞান, দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ বা অপরের মনের কথা জানা) এ'সবই মনের শক্তি। কিন্তু সাধারণ লোকে মনে করে এ' সকল ভৌতিক অথবা অশরীরি কোন spirit-এর (অপদেবতা বা ভূতের) শক্তি। কিন্তু সবই মনের শক্তি।[৫২] আত্মা সর্বশক্তিমান। সকল শক্তি অব্যক্তভাবে আত্মায় থাকে। তাই লোকে ইচ্ছা করলে মনের শক্তির বিকাশসাধন করতে পারে। আমাদের দেশে যোগীদের দেখ। তাঁরা মনকে concentrate (একাগ্র) ক'রে মনের শক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন। মনের এই শক্তিগুলির নাম psychic power (মানসিক শক্তি)। পাতঞ্জলদর্শনে অনিমা, লঘিমা, প্রাকাম্য প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি বা যোগবিভূতির উল্লেখ আছে। যোগীদের এই অষ্টশক্তি মনেরই শক্তি। কিন্তু অষ্টসিদ্ধি দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কমলাকান্ত বলেছেন: "কত মনি পড়ে আছে ঐ চিন্তামণির নাচত্বয়ারে"। অষ্টশক্তি নাচত্বয়ারের মণিমানিক্য, চিন্তামণিকে পেতে গেলে অষ্টসিদ্ধির মোহ ত্যাগ করতে হয়।

আমেরিকায় আজকাল mental science-এর (মনোবিজ্ঞানের) যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সেখানকার লোকেরা society (সমিতি) ক'রে psychic power-এর (মনঃশক্তির) রীতিমত চর্চা করছে। এখন সেখানে এ্যালোপাথিক treatment-এর (চিকিৎসার) উপর মানুষের আর ততো আস্থা নেই, will-power (মনঃশক্তি) দিয়ে সব রোগ সারাবার চেষ্টা চলছে। এ্যালোপাথিকের মতে মানুষের শরীর একটা লোহার কড়ার মতো। তার ভিতর বিভিন্ন অর্গ্যানরূপ element (উপাদান) আছে। তাদের chemical action (রাসায়নিক ক্রিয়া) খারাপ হলেই অসুখ হয়, তাই herb বা medicine-এর (ঔষধের) সাহায্যে সেই অসুখ সারানো যায়। এ্যালোপাথিক সায়েন্সের মতে ওষুধই সমস্ত রোগ সারায়। কিন্তু স্পিরিচুয়ালিষ্টরা বলেন তা নয়, মনই কর্তা, মনের বিকৃত অবস্থাই অসুখ, সুতরাং mental power বা will-force (মনঃশক্তি) দিয়ে সমস্ত অসুখ সারানো যায়।

এ'সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন লণ্ডনে তখন এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়। ডাক্তার ছিলেন একজন মেণ্টাল হিলার।[৫৩] তাঁর কাছে একদিন শুনলেম যে এক ইংরাজ মহিলার পেটে কোন জিনিসই হজম হচ্ছে না, যা খায় তাই বমি হয়ে বেরিয়ে যায়। ডাক্তার মেয়েটির মনে suggestion (ইঙ্গিত) দিয়ে will-power-এর সাহায্যে তাকে চিকিৎসা করেন। একদিন তাঁর সঙ্গে মেয়েটিকে দেখতে যেতে আমায় অনুরোধ জানালেন। কৌতূহল নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি জীর্ণ শীর্ণ এক মহিলা, যা খায় তাই বমি হয়ে যায়। মেয়েটি সামনের চেয়ারে এসে বসলো। ডাক্তারও সামনে বসে মেয়েটিকে বল্লেন তাঁর (ডাক্তারের) একটি অঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে। মেয়েটি ডাক্তারের অঙ্গুলির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর

অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ডাক্তার তার unconscious (অজ্ঞান) অবস্থায় কিছু বিস্কুট, দুধ ও রুটী খাইয়ে দিলেন। মেয়েটি তার কিছুই জানলো না। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এলো, বমি-টমি আর হলো না, বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকলো।

জীবনে যেকোন বিষয়েই উন্নতি করতে চাও না কেন will-power-এর (মনঃশক্তির) সাহায্য নিতেই হবে। মনকে কোন এক বিষয়ে concentrate (স্থির বা ধারণা) করতে হয়। Concentration-এর (ধারণার) ফল *conservation of energy* (শক্তিসংরক্ষণ)। Concentration-কে সাধারণত আমরা বলি attention (মনঃসংযোগ)। কোন এক বিষয়ে attention (মনঃসংযোগ) থাকলে যেমন অন্য কোন বিষয় শুনতে, দেখতে বা বুঝতে পারা যায় না, আধ্যাত্মিক জগতেও তাই। মন ইষ্টবস্তু বা লক্ষ্যে স্থির না থাকলে অধ্যাত্মজীবনে কখনো উন্নতি করা যায় না। যেমন তুমি পড়ছ, পাশে একটা গোলমাল হ'ল, তোমার মন অমনি সেদিকে attracted (আকৃষ্ট) হ'ল, পড়ায় আর মন বসলো না, সুতরাং attention-এর (মনঃসংযোগের) অভাব হ'ল বা attention (মনঃযোগ) distracted (নষ্ট) হ'য়ে গেল। কিন্তু ঐ গোলমাল হলেও তোমার মন যদি তার জন্য disturbance feel (চাঞ্চল্যবোধ) না করে তাহলে বুঝতে হবে মনকে তুমি contral (সংযত) করতে পেরেছ। মনের এই সংযত অবস্থার নাম attention বা মনঃসংযোগ। Attention বা concentration-এর (মনঃসংযোগের) পর meditation বা ধ্যান। ধ্যানের পর সমাধি ও ব্রহ্মোপলব্ধি। কাজেই মনকে সংযত করা দরকার।

কিন্তু মন স্বভাবতই চঞ্চল। তার গতি সর্বদা বাইরের দিকে। জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বিষয় প্রভৃতি ভোগ করতেই মন মত্ত। কঠোপনিষদে আছে,

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥[৫৪]

পরমেশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখী ক'রে সৃষ্টি করেছেন। তাই সমস্ত প্রাণী বাহ্যবস্তুকে কেবল দর্শন করে—অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। খুব কম লোকই আছে যারা আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বাইরের দিক থেকে টেনে এনে অন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন করে। ইন্দ্রিয়েরা যন্ত্র আর মন তাদের চালক। ইন্দ্রিয়েরা বহির্মুখী অর্থে মনই ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে পার্থিব বিষয় ভোগ করে। মুমুক্ষু সাধকেরা তাই ইন্দ্রিয় সংযত করার আগে মনকে বশীভূত করতে চেষ্টা করেন। মনের বৃত্তিগুলোই মনের চঞ্চল অবস্থা। যোগীরা concentration এবং meditation-এর (ধারণা ও ধ্যানের) সাহায্যে মনকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্থির করেন। মন স্থির হলে মনের নাশ হয় আর তখনই ঠিক ঠিক পরমাত্মার দর্শন বা আত্মানুভূতি হয়।

মনকে একটা আলোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ লণ্ঠনের আলোর রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্য তার force (শক্তি) কম হয়। মনও তাই। বাইরের বিচিত্র বিষয়ের দিকে মন ছুটতে থাকলে তার শক্তিগুলো distracted (বিক্ষিপ্ত) হয়ে পড়ে, ফলে ছড়ানো মন দিয়ে কোন কাজই ভালভাবে করা যায় না—আধ্যাত্মিক উন্নতি তো পরের কথা। মনকে তাই সার্চলাইটের মতো কোন এক বিষয়ে concentrate (কেন্দ্রীভূত) করতে হয়। সার্চলাইটের আলো যেমন একই দিকে পরিচালিত হলে বহুদূর প্রসারী ও প্রখর হয় তেমনি মনকেও একটিমাত্র বিষয়ে নিবিষ্ট করলে তার শক্তি অসাধারণ হয়। যোগীরা মনকে তাই সংযত ক'রে

জাগতিক ও অতীন্দ্রিয় সকল-কিছু জিনিসের রহস্য জানতে চেষ্টা করেন।[৫৩]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন মন একটা সরষের পুঁটুলি। একবার ছিঁড়ে গেলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনের সংস্কারগুলো সরষের মতো। কত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার মনের (অন্তঃকরণের) ভিতর জমা হ'য়ে থাকে। একবার ছড়িয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তারপর এ'জন্মেই কত সব কাজ করছ, তাদের সংস্কারগুলোও মনের ভিতর জমা হচ্ছে। সুতরাং মনকে তার খুশীমতো ছেড়ে দিলে তো পাগল ক'রে দেবে। কত সংস্কার উঠবে, কত প্রবৃত্তির ভিতর পড়ে হাবুডুবু খাবে, প্রবৃত্তির কি আর শেষ আছে! 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্ধতে',—আগুনে ঘি ঢাললে আগুন নিভে না? আগুন নেভাতে গেলে জল ঢালতে হয়। আগুন হ'ল প্রবৃত্তি আর ভোগ হবি কিনা ঘি, সুতরাং ভোগ ক'রে প্রবৃত্তির আগুন নেভাতে পারবে না। তাই habit by counter-habit; অভ্যাসকে দমন করতে গেলে বিপরীত অভ্যাস দিয়ে দমন করতে হয়। প্রবৃত্তির আগুন নেভাতে গেলে যে বিষয়ে তোমার প্রবৃত্তি তার বিপরীত প্রবৃত্তি দিয়ে তাকে দূর করতে হয়। এর নামই বিপরীত ভাবনা বা negative process (নেতিবাচক প্রণালী বা পথ)। বেদান্তে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার জন্য তাই 'নেতি নেতি' বিচার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 'নেতি নেতি' কিনা 'ইহা নয়, ইহা নয়'। এই ভোগসর্বস্ব প্রবৃত্তির জগৎ সত্য নয়—মিথ্যা, সত্য একমাত্র নিবৃত্তিমূলক পথ এটাই নেতি নেতি বিচার।[৫৫] এ'পথেই মুক্তি লাভ হয়।

ধর্মোপার্জনে চালাকী চলে না। যতটুকু দেবে ততটুকুই পাবে। ভগবানকে পেতে গেলে বা সত্য উপলব্ধি করতে হলে ষোলআনা মন ঈশ্বরে দিতে হয়। নইলে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন পাঁচসিকে পাঁচআনা বিশ্বাস। যে কাজই করোনা কেন মনকে সংযত ও

concentrate (একমুখী) করতে হয়। মন ও মুখ এক ক'রে whole-heartedly (সর্বতোভাবে) সাধনভজনে ডুবে যেতে হয়। সাধনভজন ছাড়া মনকে সংযত করা কঠিন। মন ভয়ানক পাজী। ভাবের ঘরে চুরি করাই তার অভ্যাস। হয়তো মনে করছ ঠিক পথে যাচ্ছ, কিন্তু একটু হুঁশিয়ার হলে দেখবে মন তোমায় ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ লোকের বুদ্ধি কোন্‌টা সৎ তা ধরতে পারে না। তাই বিচার চাই। বুদ্ধিকে মার্জিত করতে হয়। অসৎ চিন্তা ছেড়ে কেবল সৎ চিন্তা করতে হয়। তা হলেই মন জব্দ হয়। ক্রমাগতই সচ্চিন্তা অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাসই সাধনা। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। সাধন না করলে সিদ্ধি হয় না। মন স্থির হলে তবে সিদ্ধি লাভ হয়। অভ্যাস বা সাধন করলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। মন যদি একবার স্থির বা নিজের বশীভূত হয় তো ব্যস, মুক্তি তখন করায়ত্ত।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই মন স্থির করার কথা বারবার বলেছেন। অর্জুন যখন দেখলেন মত্তহস্তীকেও দমন করা যায় কিন্তু মনকে সংযত করা কঠিন তখনই তিনি শরণাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন,

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥[৫৬]

হে কৃষ্ণ, আকাশের বায়ুকে যেমন কোন একটা জায়গায় আবদ্ধ রাখা কঠিন, মনকেও তেমনি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথা শুনে বল্লেন,

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥[৫৭]

অর্জুন, মনকে সহজে দমন করা যায় না—চঞ্চল সেকথা তো ঠিকই, কিন্তু ধ্যান প্রভৃতির অভ্যাসে ও বিষয়বিতৃষ্ণার সাহায্যে মনকে সংযত করা যায়। বিষয় ভোগ করার জন্য মন সর্বদা

ছুটে যায়, কিন্তু জোর ক'রে তাকে টেনে এনে আত্মচিন্তার ডুবিয়ে রাখতে হয়। এরই নাম প্রত্যাহার। এটা বারবার অভ্যাস করতে হয়। সাধারণত যাকে আমরা ধ্যান বলি সেটা আসলে ধ্যান নয়—প্রত্যাহার।[৫৮] প্রত্যাহার দৃঢ় হলে 'ধারণা' ও ধারণা দৃঢ় হলে 'ধ্যান' হয়। নইলে বসে চোখ বুঁজলেই তো আর ধ্যান হয় না। ধ্যান এত সহজ জিনিস নয় জানবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥[৫৯]

শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছেনঃ "প্রশান্তমনসং হ্যেনং * * উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্" ॥[৬০] রজোগুণের স্বভাব চাঞ্চল্য, তাই সত্ত্বগুণের প্রকাশে মন যদি একবার শান্ত হয় তাহলে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা যায়। ইন্দ্রিয়দের নিবৃত্ত করতে হবে যাতে তারা বিষয়ের দিকে না যেতে পারে। অবশ্য সেই যেতে না দেওয়া বা নিষেধ করাটাও হবে মন দিয়েই আবার,[৬১] কেননা মনই ইন্দ্রিয়দের চালক, মন যদি ইন্দ্রিয়গুলোর দিকে না যায়, তবে ইন্দ্রিয়েরা আপনা-আপনি নিবৃত্ত হয়ে যায়। ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাই ভোগের বিষয়গুলো থেকে মন তুলে নিয়ে আত্মাতে স্থির করতে হয়। মন আত্মচিন্তা ও আত্মবিচারই শুধু করবে, আর কোন বিষয় চিন্তা করবে না তাহলেই মন আত্মস্থ হবে ও যথার্থ স্থিতি ও শান্তি লাভ করবে।[৬২]

আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর পৃথিবীতে নাই। সকল ধর্মের সার কথাও তাই। যক্ষ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যখন প্রশ্ন করলেন,

অহন্যহনিভূতানি গচ্ছন্তীহ যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমশ্চার্যমতঃপরম্ ॥

যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বলেছিলেন,

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োর্বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥[৬৩]

'গুহা' অর্থে হৃদয় এবং ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব আত্মা। আত্মাই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়। "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্"— উপনিষদেও এই আত্মাসম্বন্ধে বলা আছে।[৬৪] তৈত্তিরীয়-উপনিষদে আছেঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। * * যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্"।[৬৫] এখানে 'গুহা' বলতে শুধু হৃদয়াকাশ নয়—হৃদয়াকাশে অবস্থিত বুদ্ধিকে লক্ষ্য করা হয়েছে।[৬৬] হৃদয়ে যে বুদ্ধি ও বুদ্ধিতে যে চৈতন্য প্রকাশমান (উপহিত) তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম, তাঁকেই জানতে হবে। অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চৈতন্যই আত্মা, আর সেই চৈতন্য বা আত্মাকে উপলব্ধি করা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

উপলব্ধির পন্থা হ'ল মহাপুরুষেদের সঙ্গ ও অনুগ্রহ লাভ। সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে মনে সাধুপথে যাবার প্রবৃত্তি ও প্রেরণা জাগে, মনে পবিত্রতা, ব্যাকুলতা ও দৃঢ়তা আসে। মহাপুরুষদের জীবনই আমাদের জলন্ত আদর্শ। গীতাতে তাই বলা হয়েছে,

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥[৬৭]

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যা করেন সাধারণে তাকে অনুসরণ করে ও জীবনে আলো পায়। আবার তাঁরা যেটাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক বলে আচরণ করেন অন্য লোকে তাই অনুসরণ করে এবং তাতে তাদের যথার্থ কল্যাণ হয়। ভগবানকে যাঁরা ডাকেন বা তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে চেষ্টা করেন তাঁরাই জগতে সাধক নামে

পরিচিত। তাদের চিত্ত নির্মল ও বিষয়বাসনা থেকে অনেকটা নির্মুক্ত, তাই তাদের মন ভগবানের দিকে স্বভাবতই ছুটে যায়। সাধারণ মানুষের মনে বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে বলে স্বচ্ছ নয়। তাদের মলিন মন বাসনার পিছনে ক্রমাগত ছুটে ছুটে বেড়ায়। নির্মল অন্তঃকরণযুক্ত সাধকদের সঙ্গ করলে, তাঁদের সঙ্গে ভগবদ্‌বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করলে মন ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হয় এবং মনে ঈশ্বর বা আত্মাসম্বন্ধে জানার আগ্রহ জাগে। সৎ আলোচনা ও সৎচিন্তার প্রভাব মনের উপর যথেষ্ট ক্রিয়া করে। তাতে সাধারণ মন উন্নত হয়, নির্মল হয় ও আত্মাভিমুখী হয়। পার্থিব বিষয়ানুসন্ধান তো মন করছেই, কিন্তু তাতে মনের জড়তা কাটে না। শুদ্ধ ও নির্মল হলে তবে মন আত্মার অনুসন্ধান করে। মনের পিছনে যে চৈতন্য থাকে সেই চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। মনকে তাই বাহ্যবিষয়াভিমুখী না ক'রে তার চালক বা কারণ শুদ্ধচৈতন্যের দিকে চালিত করতে হয়। চৈতন্যাভিমুখী হলে মন আর মন থাকে না, চৈতন্যসমুদ্রে নুনের পুতুলের মতো গলে একাকার হয়। মন তখন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তীরাও একথাই বলেন। ব্রহ্ম মনের পারে হলেও মনকে instrument (যন্ত্র বা দ্বার) ক'রে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে হয়।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৪

(বুধবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা)

মনের পাঁচ প্রকার অবস্থা : ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। ব্যাস পাতঞ্জলদর্শনের 'অথ যোগানুশাসনম্' এই প্রথম সূত্রের ভাষ্যে "ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমতি চিত্তভূময়ঃ" বলে পাঁচটি চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থার কথা বলেছেন। এই পাঁচটির ভিতর (১) মনের অস্থির বা চঞ্চল অবস্থার নাম 'ক্ষিপ্ত'; (২) মন যখন কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য নিদ্রা তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হয়ে সকল কর্তব্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন মনের যে অবস্থা তার নাম 'মূঢ়'; (৩) কোন একটা সুখের বা আনন্দের জিনিস পেয়ে মন কিছুক্ষণ তাতে স্থির থাকলো কিন্তু পরক্ষণেই স্বভাবদোষে আবার অস্থির বা চঞ্চল হ'ল এ'রকম অবস্থার নাম 'বিক্ষিপ্ত'; (৪) মন যখন রজস্তম ভাবকে অতিক্রম ক'রে সত্ত্বগুণের অবস্থায় পৌঁছোয় এবং ভিতরেই হোক আর বাইরে হোক অপর সমস্ত বস্তু ত্যাগ ক'রে একটি মাত্র বস্তুতে বা লক্ষ্যে স্থির থাকে তখন সেই অবস্থার নাম 'একাগ্র', আর (৫) সকল বৃত্তি লোপ পেয়ে নিরালম্বভাবে মন যখন নিজের কারণে স্থির, ধীর ও অচঞ্চল থাকে তখন সেই অবস্থার নাম 'নিরুদ্ধ'।[৩৭] এই পাঁচটি অবস্থার ভিতর ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত সকল সাধারণ মানুষের ভিতর দেখা যায়। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা-দুটিকে অভ্যাস ক'রে আয়ত্ত করতে হয়। একাগ্র অবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি লাভ হয়। এখন সম্প্রজ্ঞাত যোগ কাকে বলে? "সম্প্রজ্ঞায়তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ধ্যেয়স্বরূপমত্র",— অর্থাৎ মনের যে অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাকেই

'সম্প্রজ্ঞাত যোগ' বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগের ফলে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ পাঁচটি ক্লেশ দূর হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিষয়ভেদে বিতর্কানুগ, সবিচার, সানন্দ ও অস্মিতানুগত এই চার রকম সমাধিতে বিভক্ত। বিতর্কানুগত যোগে কোন একটি স্থূল মূর্তিকে অবলম্বন ক'রে মনের বৃত্তিধারা প্রবাহিত হয়, আর সূক্ষ্মবিষয়ে মনের বৃত্তি স্থির হলে তাকে 'সবিচার যোগ' বলে। ইন্দ্রিয়বিষয়ে মন স্থির হলে তার নাম 'সানন্দ', আর একমাত্র আত্মার বিষয়ে মনের বৃত্তি স্থির বা তদ্‌গত হলে তাকে অস্মিতানুগত যোগ বা সমাধি বলে। এ'সকল যোগ বা সমাধি কোন-না-কোন একটা বিষয়কে অবলম্বন ক'রে হয় ব'লে এদের সবিষয়-সমাধি বলে,[৬৮] আর যখন কেবল সংস্কার থাকে, অন্য কিছু থাকে না তখন তার নাম নির্বিষয়-অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি।[৬৯]

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ মনের পাঁচটি অবস্থা প্রকৃতির গুণ থেকে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির গুণ বলতে সত্ত্ব, রজ ও তম। সাংখ্যসূত্রে আছেঃ "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যবস্থা প্রকৃতিঃ" (১।৫৯),—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র ও সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র থেকে স্থূলজগতের সৃষ্টিঃ "প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল-ভূতানি"।[৭০] প্রকৃতি ও তার তিনটি গুণ পরস্পরে আলাদা নয়—একই, কেননা তিনগুণকে নিয়েই প্রকৃতি। সত্ত্বগুণে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বা বৃত্তি থাকে না, রজোগুণে চাঞ্চল্য ও কর্মকুশলতার বিকাশ থাকে এবং তমোগুণ uncontrolled state of mind (মনের অসংযত অবস্থা)। গীতায় এই তিনগুণের স্বভাবসম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

*   *   *

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।

*　　*　　*

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।

*　　*　　*

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।[৭১]

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি। অথবা তিনগুণই প্রকৃতি। সত্ত্বগুণ নির্মল, স্বচ্ছ ও প্রকাশক। রজ প্রবৃত্তির উদ্বোধক। সকল বাসনা ও আসক্তিই রজোগুণ থেকে সৃষ্টি হয়। তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান, সকল প্রাণীকে তা মোহে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। মোটকথা সত্ত্বগুণে সুখ, রজোগুণে কর্মকুশলতা ও তমোগুণে চিত্ত ও বিবেক মলিন হয়।[৭২]

সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনা এ'সবই মন বা চিত্তের বৃত্তি। বৃত্তি কিনা কার্য, বিকৃতি বা বিকার। আসলে চিত্তের বৃত্তি বলতে আমরা বুঝি মন বা চিত্তরূপ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের close contact (ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ): "বিষয়সম্বন্ধা যা চিত্তপরিণতি বৃত্তিঃ"। যেমন একটা ছবি দেখলে তার প্রতিকৃতি আমাদের চিত্তে reflected (প্রতিফলিত) হলো, অথবা শব্দ শুনলে মনে তার একটা sensation (সংবেদন) হলো।[৭৩] চিত্ত বা মনের reflection-ই (প্রতিবিম্বই) বৃত্তি। মোটকথা মনের চঞ্চলতাকেই বৃত্তি বলে। স্থির সমুদ্র, তাতে তরঙ্গ উঠলো, এই তরঙ্গ বৃত্তি। বৃত্তি রজোগুণের প্রকাশক। মন বা চিত্ত তখন স্বরূপ থেকে চ্যুত হয়।

বৃত্তি বা চাঞ্চল্যের বিপরীত অবস্থা একাগ্রতা। যেমন আমি কথা কইছি আর তোমরা সকলে মন দিয়ে শুনছো। এই একমনে শোনার নাম একাগ্রতা। কিন্তু এ'সময়ে মন যদি অপর কোন একটা বিষয়ে ছুটে যায় তবেই মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মনের একমুখী হওয়ার নাম একাগ্রতা। মন বিষয়ের দিকে ক্রমাগতই

ছুটে বেড়ায়। নানাদিকে ছুটে বেড়ানো তার স্বভাব। তাকে জোর ক'রে একটা জিনিস বা বিষয়ে তাই বসাতে অভ্যাস করতে হয়। সেজন্য will-power (ইচ্ছা বা মনঃশক্তি) দরকার। যার যত will-power (মনঃশক্তি) বেশী সে তত শীঘ্র মনকে কোন একটা বিষয়ে concentrate (স্থির) করতে পারে। দুর্বল লোকদের ধ্যান হয় না। তারা মনকে নিজেদের বশে আনতে পারে না, কাজেই মন একাগ্র হয় না।

মনে করো একটা ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দ করছে আর তোমাদের ভিতর কেউ হয়তো বই পড়ছে বলে ঐ শব্দ শুনতে পেলে না, কেননা মন তখন তার পড়ার উপর নিবিষ্ট আছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধর্ম শোনা, তা হয়তো কান পালন করছে কিন্তু পড়ার দিকে মন নিবিষ্ট থাকায় সে শব্দ শুনতে পেলে না। এর কারণ ইন্দ্রিয় তো আর শোনার কর্তা নয়, ইন্দ্রিয় মনের instrument (যন্ত্র) মাত্র। সুতরাং এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকলে অন্য বিষয় সে আর গ্রহণ করতে পারে না।[৭৪] তাই জো সো ক'রে মনকে কোন একটা বিষয়ে নিযুক্ত বা নিবিষ্ট করতে পারলেই হলো। মন নিবিষ্ট হলে মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়। তখন মন সেই বিষয়ে স্থির হ'য়ে বসে, অন্য দিকে আর যায় না। এর নাম একাগ্রতা।

কোন বিষয়ের sensation (সংবেদন) হয় আমাদের কি ক'রে? ধর—তুমি একটা শব্দ শুনলে আর শব্দের sensation (সংবেদন) তোমার হলো, কিন্তু কি ক'রে বা কি process-এর (প্রণালীর) ভিতর দিয়ে সেই sensation (সংবেদন) এল তা হয়তো তুমি জান না। শব্দ প্রথমে auditory nerve-এর (কানের মধ্যে স্নায়ুর) ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে একটা vibration (কম্পন) সৃষ্টি করে, সেই vibration (কম্পন) আবার brain-cells-এ (মস্তিষ্কে) গিয়ে আর একটা vibration (কম্পন) সৃষ্টি করে, ঐ vibration-

গুলো (কম্পনগুলো) আবার চৈতন্যদীপ্ত মনের কাছে পৌঁছুলে মন যে রকম অনুভব করে আর তার নামই sensation (সংবেদন)। সকল perception (প্রত্যক্ষ) বা sensation-এর (সংবেদন) জন্য মনকে তাই medium (মধ্যস্থ) হয়ে থাকতে হয়, আর ঐ মনের পিছনে যে চৈতন্য থাকে তাই হলো conscious entity (সচেতন বস্তু)। ঐ entity মনের সাহায্যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে। Brain (মস্তিষ্ক) যেন একটা higher (বড়) আফিস বা কোর্ট, সেখানে self-consciousness (আত্মা) বড় একজন অফিসার বা বিচারক। মনের সাহায্যে সেই কনসাসনেস (জ্ঞান) আফিস বা কোর্টকে control ও conduct করে (নিজের আয়ত্তে রেখে পরিচালনা করে)। সাধারণত মনকে আমরা সকল-কিছু কাজের কর্তা ব'লে মনে করি। কিন্তু মনও আসলে instrument (যন্ত্র), তার নিজের কোন চৈতন্য নেই। মনের পিছনে চৈতন্যরূপী আত্মা থাকে বলেই মনের কর্তৃত্ব। সুতরাং যে কোন একটা incident (ঘটনা) বাইরের জগতে ঘটলে ইন্দ্রিয়ের কাজ হলো তাকে তৎক্ষণাৎ brain-এ (মস্তিষ্কে) পাঠিয়ে দেওয়া। ইন্দ্রিয়েরা যে যার nerve-channel (স্নায়ুপথ) দিয়ে সেই incident (ঘটনা) message-এর (সংবাদ) আকারে higher (বড়) কোর্টে পাঠিয়ে দেয়। কোর্ট বা brain (মস্তিষ্ক) তা receive (গ্রহণ) ক'রে তৎক্ষণাৎ আবার মনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। মনও receive (গ্রহণ) করেই বলে—হ্যাঁ, এটা এই জিনিস। মনের এই সম্মতির নাম sensation (সংবেদন) বা perception (প্রত্যক্ষ)। কাজেই sensation বা perception-এর (সংবেদন বা প্রত্যক্ষের) জন্য conscious entity (চেতন বস্তু) একজন থাকা চাই। এই conscious entity-ই (চেতন বস্তুই) আত্মা। এই entity সব-কিছু করে মনের সাহায্যে। তাই mind as a medium or approver (মধ্যস্থ বা সমর্থক হিসাবে মন)

যেকোন sensation, feeling বা perception-এর (সংজ্ঞা, সংবেদন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের) পিছনে থাকে। আসলে আত্মাই সব-কিছুর এবং মনেরও directer (চালক)। আত্মা না থাকলে psycho-physical condition (শারীর-মানসিক ক্রিয়া) বা process (প্রণালী) fulfilled (পরিপূরণ) হলেও বিষয়ের অনুভূতি হয় না। যেমন মানুষের শরীর থেকে আত্মা বার হলে তার dead body-র (মৃত শরীরের) আর কোন sensation বা feeling (সংজ্ঞা বা অনুভূতি) থাকে না। শরীর, মুখ, চোখ, নাক, কান সবই থাকে, কিন্তু আত্মা থাকে না ব'লে মৃতশরীর কিছু শুনতে বা দেখতে পায় না।[৭৫]

ইন্দ্রিয়েরা যন্ত্র আর মন এদের চালক। মনেই ইচ্ছাশক্তি থাকে। মনের বাসনা, কামনা ও যা-কিছু বৃত্তি সবই ইচ্ছাশক্তির ফল। যেমন জল ও তার তরঙ্গ। মানুষ মরে গিয়ে আবার শরীর ধারণ করে। এই শরীর ধারণ করা মনের ইচ্ছাশক্তির ফল। মানুষ মরে গেলে সে mental plane-এ (মনোজগতে) বাস করে, তার কাজ-কর্ম, খাওয়া-পরা, বলা-কওয়া সব তখন হয় mental plane-এ (মনে)। ভোগ করার ইচ্ছাও তখন মনে থাকে। তবে সূক্ষ্মশরীরে ঠিক ঠিক ভোগ চরিতার্থ হয় না ব'লে তার আবার স্থূলশরীর নেওয়ার ইচ্ছা হয়। স্থূলশরীরকে তাই শাস্ত্রে ভোগায়তন অর্থাৎ ভোগের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে। স্থূলশরীর নিতে গেলে পঞ্চভূতের জগতে আবার জন্মাতে হয়, নইলে স্থূলবিষয় ভোগ করা যায় না। স্থূলবিষয় ভোগ করার জন্য আমাদের বাস্তব জগতে আসা। তবে বাসনা তার কারণ। মৃত্যুর পর জীবাত্মা (প্রেতাত্মা) যখন আবার শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করে তখন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি সৃষ্টি করে। ইচ্ছাশক্তি না থাকলে শরীর ধারণ সম্ভব হয় না। ইচ্ছাশক্তি তাই সকল জিনিসের মূলে থাকে। যেমন কোন-কিছু খাদ্য চিবিয়ে

খেলে যে হজম হয় সে হজমের ইচ্ছা আগে থাকতে থাকে মনে, সেজন্য আমাদের দাঁত সৃষ্টি হয়। সে'রকম দেখার ইচ্ছা থেকে চোখ, শোনার ইচ্ছা থেকে কান, চলার ইচ্ছা থেকে পা, খাবার ইচ্ছা থেকে মুখ, আস্বাদনের ইচ্ছা থেকে জিহ্বা, stomach (পাকস্থলী) এ'সব সৃষ্টি হয়। সবই জানবে ইচ্ছাশক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। Will-power (ইচ্ছাশক্তি) শরীরের প্রতিটি পরমাণুর উপর act (কাজ) করে। ইন্দ্রিয়গুলো যন্ত্রমাত্র। মনের will-power (ইচ্ছাশক্তি) ইন্দ্রিয়গুলিকে চালায়। মানুষের মৃত্যু হলে বাইরের ইন্দ্রিয়গুলো নষ্ট হয় বটে, কিন্তু শোনার, দেখার বা খাওয়ার ইচ্ছাগুলো মনেই থেকে যায়। ঐ ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তিগুলো minutest etherial particles-এর (অতিসূক্ষ্ম বায়বীর অংশকণার) মতো। মৃত্যুর পর পার্থিব শরীর পড়ে থাকে, কিন্তু মনের সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি জীবাত্মাতে (প্রেতশরীরে) থেকে যায়। Spirit-রা (প্রেতাত্মারা) যে শরীর ধারণ করে তাও ইচ্ছাশক্তির জন্য। তবে spirit-রা (প্রেতাত্মারা) তাদের সৃষ্টি করা শরীরের অস্তিত্ব ঠিক জানতে পারে না বলে বেশীক্ষণ শরীর ধরে রাখতে পারে না, তারি জন্য কিছুক্ষণ পরে তাদের শরীর গলে যায়, হাওয়ার শরীর হাওয়াতে মিশে যায়। আমাদের স্থূলশরীরও তাই। আমরাই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি করি। তবে স্থূলশরীরকে সর্বদা অনুভব করতে পারি বলে তা আর গলে যায় না।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ,"—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি বা মনের চাঞ্চল্য দূর করার process-কে (প্রণালীকে) 'যোগ' বলে। মন ছুটে ছুটে বেড়ায়; ছুটে বেড়ানোই তার স্বভাব। কিন্তু তাকে একটা বিষয়ে ধরে স্থির রাখতে হবে। তাই কোন একটা ভাল জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে হয়। যেমন একটা পদ্ম কিম্বা গোলাপ ফুলের বিষয়

তুমি চিন্তা করছ। প্রথমে তার পাপড়ির চারদিকে মনটাকে ঘোরাও, then fix your mind upon its centre, and concentrate upon it. That concentration of mind is called *meditation* (তোমার মনকে ফুলের ঠিক মাঝখানে বসাও এবং সেখনেই স্থির কর। এই স্থির করার নাম বা অবস্থাই ধ্যান)। নিজের সংস্কারবশে মন চারদিকে ছুটে বেড়ায়, কিন্তু জোর ক'রে তাকে কোন একটা বিষয়ে স্থির করতে হয়।

Concentration (মনঃসংযোগ) অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু একবারে বা একদিনে তা হয় না। ক্রমাগত একই চিন্তা করতে করতে মনের চঞ্চল স্বভাবের পরিবর্তন হয়। Conquer habit by counter-habit (বিপরীত অভ্যাস দিয়ে যে অভ্যাস আছে তাকে দূর কর)। অভ্যাস করলে শেষে স্থির হওয়াই আবার সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। একবার সংস্কার সৃষ্টি হলেই হলো, তখন আর জোর করতে হবে না, ইচ্ছামাত্রে মন একটা বিষয়ে স্থির হয়। জোর করার দরকার হয় গোড়ার দিকে। এরই নাম যত্ন—'তত্র যত্নোঽভ্যাসঃ'। অভ্যাসের দ্বারা মন স্থির হলে তখন যত গোলমালই হোক না কেন, মনকে আর কোন-কিছু চঞ্চল করতে পারে না, মন তখন কোন একটা বিষয়ে স্থির হয়ে বসে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে তখন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের হলে (Hall) আমি বেদান্তসম্বন্ধে ক্লাস করি। একদিন *concentration* (মনঃসংযোগ) সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। বক্তৃতা চলছে এমন সময় বাইরের রাস্তা দিয়ে একদল ব্রিটিশ সৈন্য মার্চ ক'রে ব্র্যাসব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে pass (অতিক্রম) করলো। যাঁরা শুনছিলেন তাঁদের কিন্তু ভারি disturbance (গোলমাল) হচ্ছিল। রেভারেণ্ড হয়েসও (Rev. Dr. Haweis) সেদিন ক্লাসের একজন শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হ'লে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: "Swamiji, did you

not feel any disturbance ?" (স্বামিজী, আপনি কি কোন গোলমাল অনুভব করেন নি ?)। আমি বল্লাম—না ? তখন তিনি সৈন্যদের ব্যাণ্ড বাজিয়ে ও মার্চ ক'রে যাওয়ার কথা বল্লেন এবং আমি তার কিছুই শুনতে পাইনি জেনে আশ্চর্য হ'য়ে বল্লেন : "Swamiji, you have given us today a perfect demonstration of *concentration*" (স্বামিজী, আজ আপনি আমাদের মনঃসংযমের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেন)।

Concentration (মনঃসংযোগ) না থাকলে কোন কাজে success (কৃতকার্যতা) হয় না। যদি বলো মনকে cancentrate (সংযত) করবো কি ক'রে, তার উত্তর বলি—সাধন ক'রে। সাধন করতে হয়। সাধনই practice (অভ্যাস)। Practice makes a man perfect (অভ্যাস মানুষকে পূর্ণ করে)। যীশুখৃষ্ট বলেছেন : "Search and ye shall find ; knock and the door shall be opened unto you" (অনুসন্ধান করো—পাবে ; আঘাত করো তবে দরজা খুলবে)। সাধন ছাড়া সিদ্ধি লাভ হয় না—তা যে কোন বিষয়ে বলো।

তবে উপযুক্ত গুরু চাই। শিক্ষক না হলে যেমন লেখাপড়া বা কোন-কিছু শিক্ষা করা যায় না, সাধনজগতেও তেমনি একজন গুরু দরকার। পথপ্রদর্শক একজন চাই, নইলে নিজে নিজে সব সময় কি আর হয়। দর্জীর কাজ শিখবে তার জন্য একজন টিচার (শিক্ষক) চাই, গান শিখবে তার জন্য একজন উস্তাদ চাই, স্কুল-কলেজে যাবে সেখানেও টিচার (শিক্ষক) বা প্রফেসাররা আছেন, এটর্নীশিপ পাশ করবে তার জন্যও একজন পাকা এটর্নীর কাছে এ্যাপ্রেন্টিস থাকতে হয়। সব ব্যাপারের জন্য যখন একজন না একজন শিক্ষকের দরকার তখন সাধনভজনের বেলায় বা আত্মজ্ঞান লাভ করার সময়ই কেবল গুরুর দরকার নেই

এ' বল্লে চলবে কেন। টিচার বা ডিরেক্টর (শিক্ষক বা চালক) একজন সকল বিষয়েই চাই। যে পথের সন্ধান জানে সেই ঠিক ঠিক পথ দেখাতে পারে। ভগবান লাভ করতে গেলে তাই একজন সিদ্ধ গুরু বা আচার্যের দরকার।

কোন জিনিস জানা মানে মনের দরজায় ধাক্কা দেওয়া। Knock and the door shall be opened unto you (ধাক্কা মারো, দরজা খুলবে)। কিন্তু এই knock (ধাক্কা) ক্যামন ক'রে দিতে হয় তার process বা tricks (প্রণালী বা কৌশল) জানা চাই। জানতে গেলে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক বা গুরু চাই। তার জন্য চেষ্টা বা অধ্যবসায় করতে হবে এবং গুরু তোমায় সাহায্য করবেন। সাধন-ভজন নিজেকেই করতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সাধন করা দরকার। একদিন করলে আর পাঁচদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুলে এ'রকম করলে হবে না। এ'সব নিছক কুঁড়েমি, নিছক idleness। Idle (কুঁড়ে) হ'লে সাধনজীবনে কেন—কোন জীবনেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না। Sincerity আর earnestness (ঐকান্তিকতা ও অকপটভাব) থাকা চাই। প্রতিটি কাজের পিছনে আকুলতা না থাকলে কোন-কিছু হয় না। যতক্ষণ মুক্তির কপাট না খোলে ততক্ষণ সাধনার দরজায় ঠিকঠিকভাবে ধাক্কা দিতে হয়। উঠে পড়ে লাগা চাই। ম্যাদাটের কোনদিন ধর্ম হয় না। অভ্যাস, নিষ্ঠা, তীব্র বৈরাগ্য এসব না হ'লে শুধু মালা জপলে হয় না। মালাও জপতে হবে আবার একনিষ্ঠও হতে হবে। তাই নিষ্ঠা চাই, জানার আগ্রহ চাই। এ'জীবনেই ভগবান লাভ করবো এ'রকম আকুলতা ও মনের প্রতিজ্ঞা চাই। আমরা যখন বরানগর-মঠে সাধনভজন করতাম তখন কত ঝড়ই না আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গ্যাছে। কতদিন আহার জুটত না, অনাহারেই কেটে গ্যাছে। হয়তো জুটলো একবেলা নুন ভাত—তাই খেয়ে

আমরা দিন কাটিয়ে দিয়েছি। কাপড়—তাও সকলের ছিল না। একটা মাত্র পোষাকী কাপড় থাকত—তাই পোরে বাইরে গিয়ে কারু সঙ্গে দেখাশোনা ক'রে আসতাম। কৌপীনমাত্র ছিল তখন সম্বল। অন্য কোন দিকে তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অনেক সময় দিনরাত কোথা দিয়ে চলে যেত হুঁস থাকত না। দেহটাকে দেহ বলেই জ্ঞান করতাম না। সর্বদাই ধ্যান, বিচার আর শাস্ত্রালাপ করতাম আর ভাবতাম ক্যামন ক'রে আমরা ঈশ্বর বা জ্ঞান লাভ করবো।

তাই উঠে পড়ে লাগতে হয়। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। সাধনভজনে রোক্ করতে হয়। মনের strength (শক্তি) না থাকলে হয় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ',—দুর্বল শরীর ও মন নিয়ে ভগবান লাভ হয় না। প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আমি এ' জীবনেই ভগবান লাভ করবো। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'—এরকম প্রতিজ্ঞা চাই।। বুদ্ধদেবের কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল,—অচল অটল! 'বোধি' লাভ করার জন্য তিনি যোগাসনে বসে প্রতিজ্ঞা করলেন—

> ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
> অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

হয় এ'জন্মেই বোধি লাভ করবো—নয় শরীর ধ্বংস হোক। এ'রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা না থাকলে ভগবান্ লাভ হয় না। চেষ্টা করব না, অমনি বাজি মাৎ করবো—তা হয় না। ভগবান লাভ বা মুক্তি গাছের ফল নয় যে যখন ইচ্ছা দুটো পেড়ে খাবে। রীতিমত সাধনভজন করতে হয়। চেষ্টা চাই, অধ্যাবসায় চাই, নইলে হয় না। Earnestness, sincerity ও perserverance (ঐকান্তিকতা, অকপটভাব ও অধ্যবসায়)। এ' তিনটি সাধনজীবনে থাকা চাই। অম্বলচাখার মতো করলে হয় না। নিষ্ঠার সঙ্গে উঠেপোড়ে লাগতে

হয়—তবেই সিদ্ধি। সিদ্ধি কি আর মুখের কথা যে একটু করলাম আর হয়ে গেল!

মনে করো উস্তাদের কাছে গান শিখছ বা কোন আর্টস্কুলে painting (চিত্রবিদ্যা) শিখছ। এখন যতক্ষণ না একটা task (বিষয়) ভাল রকম ক'রে আয়ত্ত করছ ততক্ষণ কি আর উস্তাদ বা শিক্ষক তোমায় নূতন একটা task (বিষয়) দেবেন? মনে রাখবে ফাঁকি দিয়ে বা চালাকি ক'রে কেউ কখনো সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। যতটা সাধনায় ফাঁকি দেবে ততটা মুক্তির বেলায়ও ফাঁকিতে পড়বে। তাই নিয়মতভাবে অভ্যাস আর নিষ্ঠা চাই। ধ্যান করতে না পারো আসন করেও একবার বসা চাই। ফল ক্রমশঃ পাবে। একদিনেই কি আর হয়? 'Rome was not built in a day' (রোমনগরী একদিনে তৈরী হয় নি)। বারবার যত্ন ও অভ্যাস করতে হয়। এই যত্নের নামই অভ্যাস—'তত্র যত্নোঽভ্যাসঃ'।

সত্যকারের কি আর তোমাদের মধ্যে ভগবান লাভের ইচ্ছা আছে। জিজ্ঞাসা করতে হয় জিজ্ঞাসা করো যে আজ্ঞে মহারাজ, ভগবান লাভ ক্যামন ক'রে হয়? ভগবান যেন ময়রার দোকানের মোয়া, পয়সা ফেলবে আর কিনে খাবে। এ'সব বুজরুকীতে সত্যকারের কিছু হবে না বাপু! সত্যই যদি কিছু জীবনে করতে বা কিছু লাভ করতে চাও তো sincerely (অকপটভাবে) তা চাইবে আর তা'হলেই সত্য লাভ হবে। আমি সত্য বলছি ধর্মজীবনে উন্নতি করা যায়। এ'জীবনেই তোমরা ভগবান লাভ করতে পারো যদি চেষ্টা কর। চেষ্টা কিনা সাধনা বা অভ্যাস। আসলে চাই আকুলতা ও নিষ্ঠা। মানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছ তখন ঈশ্বর লাভ না করলে বৃথাই জন্মটা নষ্ট হবে। এখনো সময় আছে। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। ভগবান তোমাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, কেবল চাই একান্ত ইচ্ছা

আকুলতা। তোমরা না চাইলে তিনিই বা তোমাদের দেবেন কেন বলো। চাওয়াই তো সাধনা। সাধনা কিনা এগিয়ে যাওয়া। তোমরা এক পা এগিয়ে গেলে ভগবান তোমাদের দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন। সত্যি বলছি। কিন্তু এ'সবে কি আর তোমাদের বিশ্বাস আছে, না—ভগবান লাভেই আকুলতা আছে।

'যোগ' মানেই চিত্তের বৃত্তি বা চাঞ্চল্যকে নিরুদ্ধ করা—"যোগাশ্চিত্তবৃত্তিঃনিরোধঃ"। নিরুদ্ধ করা মানেই মনের বৃত্তি এদিকে সেদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে এক ক'রে কোন একটা কেন্দ্রে স্থির করা। মন যখন পাঁচটা জিনিসে ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে চারটে জিনিসে বসাতে অভ্যাস করতে হয়। চারটে জিনিসে বসলে তারপর তাকে তিনটে জিনিসে, পরে ছুটোয়, শেষে একটাতে স্থিরভাবে বসাতে হয়। এ'রকম চেষ্টা বা যত্ন করার নাম 'অভ্যাস'। তারপর 'বিষয়বিতৃষ্ণা'। যে লোক মিষ্টি খেতে ভালবাসে তা তাকে ছাড়তে গেলে বিপরীত অভ্যাস করতে হয়। Conquer habit by counter-habit। একটা অভ্যাসকে জয় বা দমন করতে গেলে তার বিপরীত অভ্যাসের প্রয়োজন। মন তো ভোগ চাইবেই, ভোগ করাই তার স্বভাব। অভ্যাস করলে ভোগ না-করাটাই আবার স্বভাবে পরিণত হয়। Habit is the second nature। মনকে যেমন অভ্যাস করাবে ঠিক তেমনি হবে। মন তোমার দাস, কিন্তু অজ্ঞানের জন্য মনের তুমি দাস হয়ে আছ। চঞ্চল মনকে তাই সংযত করতে হয়। মন ভোগের দিকে স্বভাবতই ছুটবে, কিন্তু তাকে সংযত করা চাই। এ'রকম বারবার করাব পর মন ভোগের বিপরীত দিকে যেতে আবার আনন্দ পাবে। এ'অবস্থা এলেই জানবে মনে বৈরাগ্যের ভাব পরিস্ফুট হচ্ছে। পতঞ্জলিও বলেছেন: "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ"। 'তন্নিরোধঃ' কিনা মনকে নিরোধ বা জয় করা। মনের চঞ্চল বৃত্তিগুলোকে নিজের আয়ত্তে এনে

একটা লক্ষ্যে স্থির করতে হয়। তার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য চাই। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"। 'তত্র' কিনা আত্মায় মনকে স্থির করার নাম যত্ন বা 'অভ্যাস'।

মনের কি রকম চঞ্চল স্বভাব জানো? একদিন রামচন্দ্র বশিষ্ঠ-দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন মনের চঞ্চল ভাব কি রকম। বশিষ্ঠদেব বল্লেন,

মর্কটো মদিরোন্মত্তঃ বৃশ্চিকেন হি দংশিতঃ।
পশ্চাদ্ ভূতগণৈর্যুক্তঃ তাদৃশোহি মনো রাম॥

হে রাম, মন যেন একটি বানরের মতো। বানর স্বভাবতই চঞ্চল প্রকৃতির, কিন্তু তার উপর সে মদিরোন্মত্ত ও ভূতগ্রস্ত। তা ছাড়া তাকে আবার বৃশ্চিকে দংশন করেছে। কাজেই ভেবে দেখ মনের কী রকম ভীষণ অবস্থা! এ'জগতে যত রকম জিনিস দেখবে বা যত আবিষ্কার বা গবেষণার বিষয় আছে সবার মূলে ঐ মনের power of concentration (একাগ্রতাশক্তি) আছে। সমস্তই যোগের ফল। স্যর জে. সি. বোস গাছে কি রকম ক'রে জল খায় এই নিয়ে প্রায় দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। গাছটা হয়তো ৩০০ ফুট উঁচু, pumping machine-ও (নলকূপ) ৩০০ ফুটের বেশী জল তুলতে পারে না,[১৬] সুতরাং ৩০০ ফুট উঁচু গাছটার সমস্ত শরীরে জল ক্যামন ক'রে ওঠে। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে শেষে আবিষ্কার করলেন তার process (প্রাণালী)। এই অধ্যাবসায়ই power of concentration-এর পরিণতি। এর নামই যোগ।

মোটরগাড়ী, ট্রামগাড়ী, ইলেকট্রিক ফ্যান সবই যোগশক্তির বলে আবিষ্কার হয়েছে। এরোপ্লেন-আবিষ্কারের কথাই একবার ভাবো। ইংরাজেরা প্রথমে আকাশে উড়তে চেষ্টা করলে। তারপর কতলোক ব্যোমযানে চড়ার attempt (চেষ্টা) ক'রে পড়্‌লো ও মলো তার আর ইয়ত্ত নেই। কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে শেষে এরোপ্লেন

আবিষ্কার করতে লোকে কৃতকার্য হোল। মানুষের সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টিকেও ছাপিয়ে গেল। তবে ভগবান কি আর তোমাদের ছাড়া! চৈতন্যের আকারে তিনি সবার মধ্যে আছেন। চৈতন্য কিনা জ্ঞান। চৈতন্য আছে বলেই মানুষ বুদ্ধিমান, নইলে পাথরের মতো জড় হয়ে থাকত। চৈতন্য ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। প্রতিভা কিছু অলৌকিক বা accidental (আকস্মিক) নয়, মনঃশক্তি ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই জগতে সকল-কিছুর আবিষ্কার হয়। মনের culture (অনুশীলন) যিনি করেন তিনিই সমস্ত psychic power-এর (মনঃশক্তি) রহস্য জানতে পারেন। এ'জগতে যত-কিছু শক্তির বিকাশ দেখছ সবই মনের।[৭৭] মন miniture form-এ (ছোট আকারে) একটা বিরাট জগৎ। মনের কি tremendous power (অদ্ভুত শক্তি) সে সম্বন্ধে সাধারণ লোক কিছু জানে না আর জানে না বলে তারা দুর্বল। যোগীদের অলৌকিক শক্তির বিকাশও মনঃসংযমের ফল।

টমাস এডিসন ইলেকট্রিক লাইট, গ্রামোফোন, ইলেকট্রিক পাখা প্রভৃতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর কি অধ্যবসায়! তাঁর সঙ্গে আমার নিউ ইয়র্কে দেখা হয়। তিনি সাক্ষাৎ যোগীপুরুষ। শরীরের দিকে এতটুকুও হুঁশ নেই। দেখলাম নিজের theory (মতবাদ) নিয়ে তিনি ধ্যানী যোগীর মতো দিনরাত ডুবে আছেন। খাবার বা নাইবার দিকে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। ল্যাবরেটরির ভিতর খাবার রেখে আসা হতো, কোনদিন খেতেন, কোনদিন হয়তো খাবার চাপা দেওয়া পড়ে থাকতো। এমনই ছিল তাঁর মনঃসংযম ও একাগ্রতা! আমার সঙ্গে তিনি একান্ত বন্ধুর মতো আলাপ করলেন। কানে শুনতে পেতেন না তাই এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেল্লেন যা কানে লাগালে শোনা যেতো। আমি ইণ্ডিয়া (ভারতবর্ষ) থেকে গেছি ও বেদান্ত প্রচার করি জেনে তিনি ভারি খুশি হলেন।

ভারতবর্ষ ও বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হোল। তিনি মন দিয়ে শুনলেন। প্রায় দু'ঘণ্টা তাঁর ল্যাবরেটারিতে ছিলাম। ওরকম অমায়িক ব্যবহার আমি সত্যই কারুর মধ্যে দেখিনি।[৭৮]

Wireless telegraph-ও (বেতার-সংবাদও) যোগশক্তির ফলে আবিষ্কৃত। এখন আবার চেষ্টা হচ্ছে telephone-এ কথাবার্তা হবে আর যারা কথা কইবে তাদের পরস্পরের ছবি সামনের কোন একটা attached (লাগানো) গ্লাসে reflected (প্রতিফলিত) হবে। এর নাম টেলিভিসন। সম্প্রতি আমেরিকায় এ'রকমের আবিষ্কার successful (কৃতকার্য) হয়েছে যার ফলে ঘরে বসে দূরের জিনিস বা ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সবই যোগশক্তির ফল। মনঃসংযম ও একাগ্রতাশক্তি এলে জগতের কোন-কিছুকে আর আশ্চর্য বলে মনে হয় না। যোগশক্তির প্রভাবেই তো রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছুরির ব্লেড, ভাঙা হাঁড়ি ও ইট ইত্যাদি পেয়েছিলেন। তারপর ক্রমাগত গবেষণার পর তিনি স্থির করেছিলেন সেই ব্লেড, হাঁড়ি আর ইট ৫০০০ বছর আগেকার জিনিস। জগতে যত রকম শক্তি বলো সবই একাগ্রতাশক্তির ফল। তোমাদের মনঃসংযম নেই, জানার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা নেই, তাই তোমাদের কাছে সবই নতুন ও আশ্চর্য বলে মনে হয়।

মনের দৃঢ় একাগ্রতা দরকার। ধ্যান-ধারণা অভ্যাস না করলে মনের একাগ্রতা আসে না। বি. এ., এম. এ. পাশ করতে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারো আর সর্বজ্ঞ হবে বা অলৌকিক শক্তি কিছু লাভ করবে তার জন্য এক পয়সা খরচ না বা কোন চেষ্টা করবে না এ' ক্যামন ক'রে হয়। যোগসিদ্ধি লাভ করা কি সোজা কথা! যে পাখোয়াজী হাত দিয়ে কাটা কাটা বোল বার করছে ভাবো তার কত কষ্ট হয়েছে আর কত বৎসরই না একনিষ্ঠভাবে তাকে

পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরিশ্রমের জন্যই সে একজন experienced (বিচক্ষণ) পাখোয়াজী হতে পেরেছে।

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্"।[৭৯] পরাগতি কিনা আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞান লাভ না করলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কখনো ছিন্ন করা যায় না। আত্মোপলব্ধিই পরাগতি। এই লাভ অনেক জন্মের পর তবে হয়। আজকাল বড় জোর পঞ্চাশ কি পঁচাত্তর বৎসর একটা লোক বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু প্রায় ত্রিশ বছর তার কাটে ঘুমিয়ে, বাকি পঁয়তাল্লিশ বছরের ভিতর কুড়ি বছর যায় লেখাপড়া শিখতে আর পঁচিশ বছর যায় চাকুরীতে ও অন্নচিন্তায়, সুতরাং কখনই বা সে ধ্যান-ধারণা করবে বলো—আত্মজ্ঞান লাভ তো আরো দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

বহুজন্ম সাধনা ক'রে তবে মানুষ আমাকে কিনা আত্মাকে জানতে পারে এই ভাবে যে বাসুদেবই জীব-জগৎ সব হয়েছেন। এ'রকম মহাপুরুষ জগতে অতি দুর্লভ। দুর্লভ এই জন্য যে,

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥[৮১]

সহস্র সহস্র মানুষের ভিতর কদাচিৎ কেউ কখনো আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য যত্ন করে। তারপর যারা জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে তাদের ভিতর ক্বচিৎ কেউ আমাকে কিনা আত্মাকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারে। তাই সত্যকারের যাঁরা যোগী—অহরহ যাঁরা সাধনভজনে ডুবে থাকেন তাঁরাই কেবল জ্ঞানলাভ করেন।[৮২]

যোগসাধন করতে হলে ব্রহ্মচর্য চাই। আগে নিয়ম ছিল পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের গুরুগৃহে বাস করতে হোত। তাই নৈষ্ঠিকভাবে তারা গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যপালন, শাস্ত্রপাঠ ও গুরুসেবাদি

করত। তারপর যে ইচ্ছা করত সে চিরজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকত, ফিরে গিয়ে আদর্শ সংসারী হোত। পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত নয়তো বাড়ী গৃহীজীবন যাপন ক'রে ইচ্ছা করলে তারা সন্ন্যাসী হোত। উপনিষদে এ'সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, যেমন "ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ"।[৮৩] কিন্তু এ' সকলের যে আবার ব্যতিক্রম হোত না তা নয়। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে ব্রহ্মচর্যের অবস্থা থেকেই ছেলেরা সন্ন্যাসী হতে পারত। যেমন "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ"।[৮৪] তীব্র বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল! বৈরাগ্য কিনা বিষয়ে বিতৃষ্ণা বা ভোগবাসনার ত্যাগ। বাসনার ত্যাগই সন্ন্যাস। কেবল গেরুয়া আর লোটা-চিম্‌টে নিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এগুলো বাইরের চিহ্ন। যেমন ব্রাহ্মণকে চিনতে গেলে উপবীত বা যজ্ঞসূত্র থাকা দরকার। উপবীত বা যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিয়ে দেয়, তাই একে চিহ্ন বা নির্দেশক বলে। সেরকম গেরুয়া, ভস্ম, কমণ্ডলু, মালা এ'সকল সন্ন্যাসীর চিহ্ন। আসলে ত্যাগ না এলে সন্ন্যাস হয় না। ত্যাগ মানেই বাসনা বা কামনার ত্যাগ। নির্বাসনার অবস্থাকেই ঠিক ঠিক সন্ন্যাস বলে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ' অবস্থাকে নিষ্কাম বলেছেন। নিষ্কাম সাধকই যোগী ও যথার্থ ত্যাগী। তাঁরা কোন রকম ফলকামনাযুক্ত কর্মে বা বাসনায় আসক্ত হন না। তাঁরা সর্বদাই জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, সমদর্শী ও শুদ্ধচিত্ত। গীতায় আছে,

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥[৮৫]

জ্ঞানী সংসারে সমস্ত কাজ করেন কিন্তু কিছুতে লিপ্ত হন না। "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা",—পদ্মপাতায় জল থাকলে যেমন পদ্মপাতায় মোটেই জল লাগে না, সংযতচিত্ত সন্ন্যাসীরাও তেমনি। সংসারে থাকলেও

সংসারের কোন আসক্তি তাঁদের আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁরা নির্লিপ্ত হয়ে কামনার জগতেই বাস করেন। এই নির্লিপ্ততার নাম 'ত্যাগ'। ত্যাগেই জীবনে আদর্শ ও আশ্রয় হওয়া উচিত। "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ",৮৬—যাগযজ্ঞাদি কর্ম ক'রে, পুত্র ক'রে, সংসারধর্ম পালন ক'রে কিম্বা ঐশ্বর্যের বিনিময় দিয়ে কখনো উৎপাদন আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ত্যাগ বা সন্ন্যাস চাই। বাসনার ত্যাগ না হলে মুক্তি বা ভগবান লাভ অসম্ভব। তবে যদি বলো পিতৃঋণ, ঋষীঋণ এ'সব পরিশোধ করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে কর্তব্য, তাতে আমি বলি ওসব হ'ল সংসারাশ্রমীদের জন্য। ত্যাগী যারা তাদের আবার ঋণ কিসের!

আগে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। যার যেমন ইচ্ছা বা বাসনা সে' অনুসারে কেউ ব্রহ্মচারী হোত, কেউ বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করত। আবার কেউ বা আদর্শ সংসারী থেকেই সারা জীবন কাটিয়ে দিত। সে নিয়ম বরং ভাল ছিল বলতে হবে। নইলে সন্ন্যাসীও হলে আবার বিষয়-সম্পত্তির নেশাও কাটাতে পারলে না, মান-অভিমান, ঝগড়া-গণ্ডগোল হিংসা-দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা নিয়ে সারাটা জীবন কাটালে—এতে না হ'ল ত্যাগ আর না হ'ল ভোগ। দুয়ের মাঝখানে পড়ে সারাটা জীবন কাটালে, তাতে আর কি হলো, তাতে একূলও গেল, ওকূলও গেল, তার চাইতে আদর্শ সংসারী হওয়া বরং অনেক ভাল ছিল। সন্ন্যাসীর আদর্শ হোল কোন দিকে আসক্তি থাকবে না—এক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ছাড়া। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ আসক্তি হলেও আসক্তি নয় কারণ এ'আসক্তি বন্ধন নাশ করে। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন হিংচে শাকের মধ্যে নয়, মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়, কেননা হিংচেশাকে পিত্ত সারে ও মিছরিতে সর্দি নষ্ট হয়।

সন্ন্যাসী নিজের যেমন হিত করবে তেমনি পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। নিজের হিত মানে নিজে কতটুকু সংযমী, নিস্পৃহ ও

জ্ঞাননিষ্ঠ হতে পেরেছ সেদিকে লক্ষ্য রাখা, আর পরের হিত কিনা পরোপকার করা, পক্ষপাতশূন্য হয়ে সকলকে ভালবাসা এবং নারায়ণ-জ্ঞানে দেশ ও দশের সেবা করা। সন্নাসীরা এই সব সৎ কাজ করবে। 'আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' সন্ন্যাসীর জীবন। ভগবানের কাজ ভেবে আসক্তিহীন হয়ে সকল কর্ম করতে হয়। কিন্তু যখনই নিজের কর্তৃত্ব কাজে আরোপ করবে এই ভেবে যে তুমি নইলে কোন কাজ হবে না তখনই কাজে আসক্তি আসবে আর তাতে তোমার অনিষ্টই হবে। তাই সর্বদা ভাববে কর্তা তুমি নও, কর্তা একমাত্র তিনি যিনি তোমাকে চালাচ্ছেন, তুমি যন্ত্র মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন নাহং নাহং—তুহুঁ তুহুঁ। এ'রকম নিস্পৃহভাবে সন্ন্যাসীরা কাজ করতে পারে, তাতে তাদের কোন দোষ হয় না। সন্ন্যাসীর কাজ সর্বদাই পরহিতার্থে হবে। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে করতে তবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হলে কাজের উপর থেকে অভিমান বা মায়া নষ্ট হয় আর তখনই ঠিক ঠিক আত্মনিষ্ঠার ভাব হৃদয়ে জাগে। আত্মনিষ্ঠ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার নামই 'কর্মযোগ'। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন,

> ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥[৮৭]

কর্মানুষ্ঠান না ক'রে কেউ কখনো নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না। কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ এবং আত্মবিবেক জাগ্রত হয়। কর্ম দিয়ে কর্মত্যাগ কিনা নৈষ্কর্ম্য বা নিষ্কাম ভাব লাভ। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা বলতেন। তাই আসক্তিহীন হ'য়ে কর্ম করতে হয়ঃ "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর"।[৮৮] নিরাসক্তভাবে কর্ম করলে জ্ঞান লাভ হয়। সন্ন্যাসীরা কাজ করার সময় সর্বদা এই spirit (ভাব) নিয়ে কাজ করবে। যারা সংসারে থাকে তাদের পক্ষেও তাই। প্রাচীনকালে যারা সংসারাশ্রমে থাকত

তারা এই কর্মযোগের আদর্শকে জীবনে পালন করতে চেষ্টা করতো। তাই সংসারে থেকেও তারা এক একজন ব্রহ্মজ্ঞানবরিষ্ঠ হোতে পারতো, সংসারের বাসনা কামনা তাদের কোনদিন বাঁধতে পারতো না। এখন সে চতুরাশ্রমও নাই বা চতুর্বর্ণও নাই, আছে মাত্র দুটি আশ্রম—সন্ন্যাস আর গৃহস্থ।

বর্ণ দুটি—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। আগেকার দিনে বর্ণবিভাগ ছিল গায়ের রঙ হিসাবে। এখন তার সবই উল্টো। তখন ব্রাহ্মণ ছিল শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় হরিদ্বর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। সে হিসাবে ইংরাজেরা হয় এখন ব্রাহ্মণ, জাপানিরা ক্ষত্রিয়, আরববাসীরা বৈশ্য আর যত হিন্দু—মায় নিম্নশ্রেণী থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সব শূদ্র। পরে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ করা হলো। গুণ যেমন সত্ত্ব, রজ, তম। কর্ম হোল যার যা পেশা। এই গুণ আর কর্ম অনুসারে তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ ভাগ করা হয়েছিল। গীতাতে তার আভাস পাওয়া যায়ঃ "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"।[৮৯] কিন্তু আজকাল গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ গণনা করতে গেলে শূদ্রের ক্লাশে (শ্রেণীতে) পড়বে বার আনা লোক।

ব্রহ্মচর্য সকল জাতিরই উন্নতির মূল। শরীর ও মন যদি নিরোগ, সতেজ ও সবল না থাকে তবে দুর্বল ও রুগ্ন শরীর নিয়ে ধর্মসাধন আর কতটুকু করবে বলো। ব্রহ্মচর্য পালন করলে শরীর নিরোগ ও সতেজ হয়। মনও সবল এবং সুদৃঢ় হয়। মন সুদৃঢ় হলে চিত্ত সহজে স্থির হয়। নইলে শরীরে আজ এই অসুখ, কাল ও-অসুখ; আজ এ-ওষুধ খাচ্ছ, কাল ও-ওষুধ খাচ্ছ; অজীর্ণতা, ডিস্‌পেপ্সিয়া, মাথার অসুখ, ইনডাইজেসচন এই সব অনবরত লেগে আছে, তার জন্য ডাক্তার, কবিরাজ, মাদুলী, কবচ এই নিয়ে অস্থির, সুতরাং সাধন-ভজন আর করবে কখন এবং ভগবানকে

ডাকারই বা সময় কোথা বলো। ছেলেবেলা থেকে তাই শরীর ও মনের দিকে নজর দিতে হয়। তারি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম শিক্ষা করা দরকার। আগে তাই ছিল। ছেলেবেলা থেকে পিতা-মাতারা ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিত। ছেলেরা সেখানে উপযুক্ত গুরুর অধীনে থেকে বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্য পালন করতো, শরীরের যত্ন নিতো ও গুরুজনদের সেবা-শুশ্রূষা ক'রে নিষ্ঠা ও আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করতো, তারপর ইচ্ছা করলে সংসারাশ্রমে গিয়ে আদর্শ গৃহস্থ হতো অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতো। এখনকার পিতামাতারা কি তাই করে? বরং বাল্যকালেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য অস্থির। সংযত জীবন নিজেরাই শিক্ষা করে না তা ছেলেমেয়েদের কি আর শিক্ষা দেবে। ছেলেমেয়েরাও তাই বেশীর ভাগ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত,—পিতামাতাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা!

পিতামাতাদের তাই আগে শিক্ষিত ও সংযত হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েরা তো তাদেরই দেখে শিখবে বা তাদের অনুসরণ করবে। পিতামাতারা যদি নিজেরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে তবে পুত্র-কন্যারা যে উচ্ছৃঙ্খল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গৃহস্থমাত্রের তাই আদর্শ জীবন যাপন করা উচিত। বৈদিক সমাজের আদর্শকে আবার আমাদের দেশে পুনরাবর্ত্তন করতে হবে। একটি দুটি পুত্র-সন্তান হ'লে সংসারীমাত্রের উচিত সংযত জীবন যাপন করা। কামচরিতার্থের জন্য বিবাহ নয়। বৈদিক সমাজে পত্নীর আর এক নাম ছিল তাই-সহধর্মিণী! স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী একসঙ্গে ধর্ম আচরণ করতো বলে স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হোত। অশ্বমেধ বা যেকোন যজ্ঞে যজ্ঞকর্ত্তার বামদিকে পত্নীর আসন নির্দিষ্ট থাকত। যজ্ঞভাগ পত্নীকেও দেওয়া হোত। রামচন্দ্র যখন রাজসূয়যজ্ঞ করেন তখন সীতার অবর্ত্তমানে স্বর্ণসীতা তৈরী করিয়েছিলেন।

পত্নী না থাকলে তখন যজ্ঞই পূর্ণ হোত না। পত্নীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গরূপে গণ্য করা হোত, পত্নীর আর এক নাম তাই অর্ধাঙ্গিনী। অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা পতি-পত্নীর এই সমান অধিকার প্রমাণ করার জন্য।[১০] আজকাল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন পুরুষের ভোগ ও সুখ-সুবিধার জন্য যেন স্ত্রীজাতির জন্ম। এ'ধারণা অবশ্য এখন ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

জাতির নৈতিক চরিত্রের উপরই সমাজ ও দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। চরিত্র গঠন করা জীবন ও জাতির উন্নতির পক্ষে একটা মস্ত বড় জিনিস। পুত্র-কন্যারা সংযতচিত্ত, সুদৃঢ় ও বীর্যবান হলে তবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ, নচেৎ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার কোন আশা নেই। চরিত্রগঠন, শরীরগঠন ও মনের গঠন এ' সব জানবে স্বাধীনতা-অর্জন ও স্বাধীনতারক্ষার পথে একান্ত আবশ্যক। বাইরে স্বাধীনতা লাভ করার আগে তাই নিজের শরীর ও মনের উপর স্বাধীনতা অর্জন করা দরকার। যোগশিক্ষার উপকারিতা এজন্যই। যোগী যিনি তিনি নিজের মনকে সংযত করতে পেরেছেন। যিনি মনকে বশে রেখে নিজের ও অপর সকলের উন্নতির জন্য নিজেকে একাগ্রভাবে পরিচালিত করতে পারেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে যোগী। একনিষ্ঠ ও সংযতচিত্ত না হলে শুধু আধ্যাত্মিক জগতে কেন—নৈতিক, সাংসারিক অথবা যে কোন জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। জীবনে তাই মনঃসংযম, তিতিক্ষা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শিক্ষা করা দরকার।

॥ গীতা

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪

(শুক্রবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা)

॥ গীতা ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শান্তিপাঠ ক'রে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ব্যাখ্যা সুরু করলেন। তিনি বল্লেন

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥[১]

'যে আত্মা বা প্রাণশক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত তাঁকে অবিনাশী বলে জানবে। কেউ এই অব্যয় আত্মার বিনাশসাধন করতে পারে না'। আত্মা বা প্রাণশক্তি বিরাট বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছেন। "আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ",—আকাশ যেমন সকল সময় সর্বত্র বিদ্যমান তেমনি প্রাণশক্তিও জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত কিনা অনুস্যূত। প্রাণশক্তি থেকেই জড়জগতে সকল শক্তি এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বিকাশ লাভ করে। প্রাণশক্তির বিস্তৃতি এবং বিকাশই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করেছেন সমগ্র বিশ্ব সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু কিনা electrons বা বিদ্যুতিন্ দ্বারা ব্যাপ্ত, বিন্দুপরিমিত স্থানও অণু-পরমাণু ছাড়া নয়। সর্বত্র তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতীন্দ্রিয় electrons-য়ে (বিদ্যুতিনে) পূর্ণ। অণু-পরমাণুর মধ্যেও প্রাণশক্তি ও স্পন্দন আছে। প্রাণশক্তি বা প্রাণ প্রজ্ঞা ও আত্মা থেকে অভিন্ন। আত্মাই ব্রহ্ম। উপনিষদে আছেঃ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম",—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম ছাড়া নয়। এক ব্রহ্মকেই ভিন্ন ভিন্ন ক'রে বলা হয়েছে জীব, জগৎ, ঈশ্বর এই সব। ভেদভাবই অজ্ঞান। যেটা যা তাকে তাই বলে না

দেখার নাম 'অজ্ঞান'। শঙ্করাচার্য বলেছেন 'অতস্মিংস্তদ্ বুদ্ধি"। শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম অজ্ঞান বা অধ্যাস। জগৎ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। যাকে তুমি জগৎ বলছ সেটাই আসলে ব্রহ্ম, কিন্তু তুমি তাকে দেখছ বা বলছ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এটাই ভ্রম। বিপরীত জানার নাম ভ্রম কিনা অধ্যাস। স্বরূপে তাই জীব ও জগৎ সবই ব্রহ্ম। মাণ্ডূক্যে বলা হয়েছে: "সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম"।

জগতের আসল স্বরূপ তুমি জান না এবং আর জান না বলে তাকে বলছ বিনাশী ও ক্ষয়শীল। বলছ matter (জড়জগৎ) spirit (আত্মা) থেকে আলাদা। আসলে জগৎ matter (জড়বস্তু) নয়, কিন্তু spirit বা আত্মাই। আত্মা বা ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর কোন সত্তা নেই। দ্বিতীয় মানেই মিথ্যা। মিথ্যা কিনা সত্য নয়। ব্রহ্ম থেকে জগৎ ভিন্ন অর্থে জগৎ মিথ্যা। ভিন্নত্বের ধারণাই মিথ্যা। মিথ্যা হোল যার সত্তা কোন সময়ে নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে দেখবে একটা মাত্র আছে, বহু তার বিকাশ। বিকাশ পরিণামী। ব্রহ্মজ্ঞান জগতের মিথ্যাত্ববোধ ও ব্রহ্ম সত্য এই সত্যত্ববোধ একইসঙ্গে (simultaneously) হয়। আগে বা পরে নয়। জীবসত্তাই ব্রহ্মসত্তা এবং এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান।

'অব্যয়' কিনা যার ক্ষয় ও ব্যয় নাই। যার ক্ষয় বা ধ্বংস আছে তাই অনিত্য। আত্মা নিত্য সুতরাং অব্যয়। আত্মাকে কেউ কখনো বিনষ্ট করতে পারে না। আত্মাকে তাই অবিনাশী বলা হয়েছে। আত্মা নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল কিনা কূটস্থ ও সনাতন —"নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"। যেখানে আত্মা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই সেখানে তিনি কার দ্বারাই বা হত বা বিনষ্ট হন। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্",—দুই থাকলে তবে ভয়। দুই থাকলেই একে অপরকে হত্যা করবে এই ভয় থাকে। যেখানে

দুই নাই—অদ্বিতীয় সেখানে কে কাকে ভয় করবে, কে কাকে আর হত্যা করবে। আত্মাই একমাত্র নিত্য ও সত্য। সৃষ্টি কল্পিত হলেও আত্মাই সে কল্পনার কারণ ও অধিষ্ঠান। এই ভাব দেখাবার জন্য কঠোপনিষদে বলা হয়েছে: "মহদ্ভয়ং",—অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মহদ্‌ভয়স্বরূপ। তিনি নিজে কারু কাছ থেকে কখনো ভয় পান না, কিন্তু অন্য সকলে তাঁর ভয়ে সর্বদা ভীত: "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ", —অর্থাৎ অগ্নি তাঁর ভয়ে তাপ দিচ্ছে, সূর্য তাঁর ভয়ে কিরণ দিচ্ছে, ইন্দ্র বায়ু ও যম তাঁর ভয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছে, কিন্তু তিনি (আত্মা) নিজে অবিকারী, অভয় ও নিশ্চল। আত্মা নিজে কারু কখনো অধীন হন না। তিনি স্বাধীন ও নিত্য এবং অন্য সকল বস্তু তাঁর অধীন কিনা ক্ষয়শীল ও অনিত্য। এটি প্রমাণ করার জন্য কঠোপনিষদে ঐ দুটি শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, যম প্রভৃতি এদের নাশ আছে কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম অবিনাশী ও নিত্য। সৃষ্টির দিক থেকে তাই আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। আবার আত্মা সৃষ্টির কোন রকম কারণ নন, তিনি কারণাতীত, কেননা কারণ বল্লেই কার্যরূপ সৃষ্টির (বিশ্বের) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তিনি সকল সম্পর্কের বাইরে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥

দেহী বা শরীরীই আত্মা। একমাত্র দেহী নিত্য আর দেহ বিনাশী কিনা অনিত্য। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন: 'হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধে বিনষ্ট হবে ভাবছ এ' কেবল তোমার শরীর বিনষ্ট হবে, দেহী বা আত্মার কোনদিন নাশ হয় না। দেহী বা আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য, সুতরাং তুমি যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ হচ্ছ কেন ? যুদ্ধ কর'।

শরীরে যিনি থাকেন তিনি শরীরী। শরীরী অর্থাৎ আত্মা থাকেন বলেই শরীরের শরীরত্ব, নইলে পঞ্চভূতের খাঁচার আর কি মূল্য আছে বলো। শরীরী বা আত্মা সকলের শরীরে চৈতন্যরূপে আছেন। আত্মা চিৎ বা pure consciousness (শুদ্ধচৈতন্য)। Consciousness (চৈতন্য) বা শুদ্ধচিৎ আবার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার ইত্যাদি নামে প্রকাশ পাচ্ছে। বিবেক বা সদসৎজ্ঞানও (discrimination) শুদ্ধচৈতন্যের reflection (প্রতিবিম্ব বা ছায়া)। Reflection কিনা reflected consciousness অর্থাৎ চিদাভাস বা বৃত্তি। একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশঃ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"। এক আত্মচৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে থাকেন আর তারি জন্য মানুষ নিজেকে শরীরী বলে অনুভব করে। কিন্তু শরীর ও শরীরী এ'দুটোর জ্ঞান এক নয়—যদিও বস্তু হিসাবে জ্ঞান এক। শরীরের জ্ঞান 'অহং' বা অভিমানাত্মক—যাকে ইংরাজীতে egoistic consciousness বলে আর শরীরের জ্ঞান যিনি করেন তিনি শরীরী। শরীরী শরীর থেকে তাই সম্পূর্ণ আলাদা। শরীর শরীরীর covering কিনা আবরণ। শরীরীই আত্মা। শরীরীর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি অজর ও অমর, কিন্তু শরীরের ধ্বংস আছে। শরীর শরীরী থেকে ভিন্ন বলে মিথ্যা কিনা ধ্বংসশীল, অথচ মানুষ ভুলে মনে করে শরীরই শরীরী বা আত্মা। আসলে শরীরকে আত্মা বলে জানার নামই ভ্রম। ভ্রম সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করায়। গীতায় অর্জুনকে তাই জ্ঞান দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ 'শরীরী নিত্য, অবিনাশী ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত, সুতরাং তাঁর মৃত্যু নাই। অতএব অর্জুন, যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হবে এ'চিন্তা করছ কেন? দেহ তো আর তোমার আত্মা নয়, দেহের নাশ আছে। দেহ নষ্ট হলেও তুমি আবার নতুন দেহ পাবে, সুতরাং চিন্তা কি,, যুদ্ধ কর'। অর্জুন শরীরের মোহে ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনের মায়ায়

আচ্ছন্ন ছিল বলে শ্রীকৃষ্ণ তার ভ্রম দূর করতে চেষ্টা করলেন। শরীরকে শরীরী বোলে বোঝাতেই অর্জুনের ভ্রম হয়েছিল। শরীর মরে আর শরীরী বা আত্মা কখনও মরে না একথাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে বল্লেন,

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

'যে আত্মাকে হন্তা মনে করে এবং যে ভাবে আত্মা নিহত হন এই দু'জনের মধ্যে কেউই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। আসলে আত্মা কাকেও হত্যা করেন না বা নিজেও কারু দ্বারা হত হন না'। আত্মা নিহত হন বা আত্মা কাকেও হত্যা করেন একথা ভাবা মানেই আত্মাকে নিজেদের মতো মরণশীল মানুষ বলে চিন্তা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যত-কিছু হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা বা ভাল ও মন্দ দোষ-গুণ নির্দ্বন্দ্ব আত্মার উপর চাপিয়ে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে আত্মায় এ'সমস্ত ধর্মের কোনটাই থাকে না, তিনি 'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ'। একেই বলে identification of the body with the soul—শরীরকে আত্মা বোলে ভাবা বা শরীরের জ্ঞান ও আত্মার জ্ঞান এ'দুটোকে এক ক'রে চিন্তা করা। আত্মা কোনদিনই মরণশীল শরীর নয় অথচ শরীরের সকল ধর্ম আত্মাতে আমরা আরোপ করি। এই আরোপ করাই মিথ্যা। আরোপ কিনা যে যা নয় তাকে তাই বলে ভাবা। এর নাম বিপরীত বুদ্ধি। বিপরীত বুদ্ধির অপর নাম ভ্রম বা অধ্যস্ত বুদ্ধি।

মানুষের স্বভাব হোল সকল জিনিসকে বিশিষ্ট ক'রে ভাবা। সে কোনদিন নির্ধর্মক বস্তু ভাবতে পারেনা, কারণ মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়েই তো পার্থিব সব-কিছু ধরতে ছুঁতে হয়। Time, space ও causation-এর (দেশ, কাল ও নিমিত্তের) বাইরে মানুষের বুদ্ধি যেতে পারে না। ঈশ্বর স্বরূপে extra-cosmic বা transcendent

(বিশ্বাতীত বা নির্গুণ) হলেও আমরা তাঁকে intra-cosmic বা immanent (জগতের অন্তর্ভুক্ত বা বিশ্বগত) বলে চিন্তা করি। চিন্তার এলাকার ভিতর নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা সগুণ অর্থাৎ গুণযুক্ত করি। গুণ ও কর্মের স্বভাব limit (সীমাবদ্ধ) করা। কোন এক অখণ্ড বস্তুকে কর্ম, গুণ বা quality দিয়ে আমরা limit (সীমাবদ্ধ) করি। আত্মা বা ব্রহ্মে কিন্তু কোন গুণ বা কর্ম কল্পনা করা যায় না, আত্মা 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো'। আত্মার জন্ম নাই, সুতরাং মৃত্যু নাই। যার জন্ম আছে তারই মৃত্যু আছে। জন্ম মানেই to come under limitation (সীমার মধ্যে আসা)। Limitation-ই (সীমা বা পরিচ্ছিন্নতাই) time, space and causation (দেশ, কাল ও নিমিত্ত)। এটাই অজ্ঞান। নিষ্কল ব্রহ্মে অজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সুতরাং কোন limting categories (সসীম করবে এমন কোন গুণ) তাঁতে থাকে না। তিনি অনন্ত ও অসীম। কিন্তু যিনি অনন্ত ও অসীম তাঁর আবার অন্ত বা সীমারও কল্পনা হতে পারে। তাই স্বরূপত ব্রহ্ম দুয়ের পারে কিনা 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'।

নাম ও রূপই limitations বা limiting adjuncts। নাম ও রূপই 'মায়া'। মায়া মানে non-existence (অসত্তা) বা শূন্য নয়। মায়ার একটা সত্তা আছে, তবে relative (আপেক্ষিক)। অদ্বৈত বেদান্তও মায়ার relative existence বা empirical reality (আপেক্ষিক সত্তা বা ব্যবহারিক সত্যতা) স্বীকার করে। আপেক্ষিকভাবে জগত তাই সত্য, কিন্তু পারমার্থিকভাবে জগতকে সত্য ভাবার নাম মায়া। সৃষ্টি আছে বলেই আমরা মায়া স্বীকার করি, নইলে ব্রহ্মের দিক থেকে অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি নেই, সুতরাং মায়াও নেই। উদাহরণ যেমন স্বপ্ন। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি ততক্ষণই স্বপ্ন সত্য, কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে স্বপ্ন আর সত্য থাকে না, তখন মিথ্যা হয়। সে'রকম জ্ঞান হলে আর মায়া থাকে না। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই মায়া, সংসার বা

সৃষ্টি। আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বোলে সংসার বা সৃষ্টির জ্ঞানও থাকে না। সৃষ্টি তখন মিথ্যা বা স্বপ্নের মতো অনিত্য মনে হয়। সংসার বা সৃষ্টি তাই সত্য ততক্ষণ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সৃষ্টি সেজন্য আপেক্ষিক সত্য—পারমার্থিক নয়। শঙ্করাচার্যও বলেছেন ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্বপর্যন্ত সৃষ্টি বা জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ও সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু উপলব্ধির পর মিথ্যা জ্ঞান হয়। মিথ্যা কিনা অনিত্য বা পরিবর্তনশীল। ভাষ্যে শঙ্কর একথাই বলেছেন।[৯] প্রকৃতপক্ষে আত্মায় কোন মায়ার লেশ নাই। আত্মার জন্মও নাই—মৃত্যুও নাই। তাছাড়া আত্মায় কোনরকম বিকার কল্পনা করাও ভুল।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥[১০]

আত্মা কখনো জন্মায় না বা মরেও না। সাধারণভাবে জন্ম অর্থে আগে যা ছিল না পরে তা হোল, আর আগে ছিল ও পরে নষ্ট হোল এর নাম মৃত্যু। বেদান্তে ব্যক্ত হওয়ার নাম জন্ম ও অব্যক্তের নাম মৃত্যু। আত্মায় এ' দুটো অবস্থার কোনটাই থাকে না। তিনি অজ বা জন্মহীন, নিত্য ও অবিনশ্বর। শাশ্বত কিনা সর্বপ্রকার ক্ষয়রহিত ও পুরাণ বা অনাদি। শরীরের নাশ হলেও শরীরী বা আত্মার কখনও নাশ নেই। তাই আত্মা সকল সময় বিনাশহীন, অক্ষয় ও অব্যয়। হিন্দু দার্শনিকদের মতে জন্ম মানে এ' নয় যে যা কখনো ছিল না তাই হোল। অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি কখনো হয় না। চার্বাকদের কথা স্বতন্ত্র। তারা স্থূলদেহের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই মানতে রাজী নয়। স্থূলদেহই তাদের মতে আত্মা। তাদের মতে দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে আত্মারও ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়। দেহ নষ্ট হলে

আত্মাও তাদের মতে ধ্বংস হয়। সকল জড়বাদী দার্শনিকদেরও এই অভিমত।

চার্বাক ও চার্বাকমতাবলম্বী লোকেরা সমাজের মধ্যে একটা reactionary (প্রতিক্রিয়ামূলক) দল। আত্মার সত্তা বা অস্তিত্ব সকলেই মানে, সুতরাং চার্বাকেরা একটা নূতন-কিছু প্রচার ক'রে আস্তিক্য-বাদীদের বিরুদ্ধে revolt (বিদ্রোহ) করলো। সমাজের ভিতর এ'রকম বিদ্রোহ বা দ্বন্দ্ব চিরকাল আছে এবং এখনও তাই। স্বাধীন মত চিরকালই থাকবে, তাতে সমাজে ক্ষতির চাইতে উপকার বরং বেশী। সমাজ ক্রমাগত একটানা ভাবে চললে stagnant (বদ্ধ) হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাই reactionary movement-এর (প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনের) দরকার আছে। সমাজের ভিতর একটা না একটা প্রতিক্রিয়ামূলক দ্বন্দ্ব থাকা চাই, তাতে life-এর (জীবনের) প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ বা মতের মধ্যে সংস্কার মাঝে মাঝে তো হবেই। মতের পর মত কত না উঠেছে ও উঠবে তাতে সমাজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, বরং সমাজের মধ্যে একটা unity (একতা) ও strength-এর (শক্তির) ভাব বাড়বে বৈ কমবে না। কেবল একটা একটানা মত চলবে তারই বা মানে কি। উত্থান ও পতন নিয়েই জগৎ। চলমানতা বা পরিবর্তনই তো জগৎ। সুতরাং কত মত আসবে ও যাবে তাতে নিত্যসত্তার কোন হানি হয় না।

আমাদের দেশে অসৎ (শূন্য) থেকে সতের উৎপত্তি স্বীকার করে এ'রকম শাস্ত্র অনেক আছে। শাস্ত্র কতকগুলো মতবাদমাত্র। শাস্ত্র দেশ, কাল ও পাত্রের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি হয়। মানুষই শাস্ত্র তৈরী করে সমাজের যখন যেমন অবস্থা দেখে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সংখ্যাও কম নয়। ঈশ্বর ও আত্মার প্রসঙ্গ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সংসার বা সমাজের প্রয়োজনই বড়। এই প্রয়োজন প্রধানত দু'রকম : আধ্যাত্মিক ও সামাজিক। স্মৃতি, ধর্মসূত্র, সংহিতা হোল সামাজিক

শাস্ত্র। এগুলি সমাজের আচার-ব্যবহার, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি নির্ধারণ করে। উপনিষৎ, গীতা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক এ'সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্র। এদের দর্শনও বলে। দর্শন উপলব্ধিমূলক শাস্ত্র। অনুভূতির চোখ দিয়ে দেখার নামই 'দর্শন'। To see God face to face,—অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার নাম দর্শন। সত্যবস্তু এক হলেও তাকে বোঝার ও বোঝানোর রীতি একরকম নয়। Power of appreciation (বোঝার ক্ষমতা) আবার সকলের সমান নয়। যার যেমন শক্তি বা বুদ্ধি সে তেমনই বোঝে। সত্যস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মকে বোঝার বা জানার উপায় তাই ভিন্ন ভিন্ন। মত-মতান্তরও তাই অনেক। মতই পথ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যত মত তত পথ, কিন্তু লক্ষ্য সবারই এক। যে যেমন অনুভব করেছে সে তেমনই আত্মাকে বর্ণনা করেছে। দর্শনশাস্ত্র তাই একটা নয়। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত এই সব কত রকম দর্শন। জীব, জগৎ, ঈশ্বর এদের মীমাংসার জন্যই শাস্ত্র বা দর্শনের সৃষ্টি। এদের মীমাংসাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দর্শন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ সকল দর্শনই চায়।

সত্যবস্তু এক। সত্য কখনো দু'ই বা অনেক হতে পারে না। তবে তাকে পাবার জন্য কত সাধক কতরকমভাবে চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন। এই চেষ্টার নামই সাধনা। সাধনা সাধারণ মানুষের কাছে পরে মত ও পথ হয়ে দাঁড়ায়। একজন সাধক হয়তো একরকমভাবে সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করলে আর অপর সকলে পরে তারই পথ ও মতকে অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলো। সে' চলার উপায়ই মত বা পথ। এভাবে যতরকম সাধনা ততরকম মতের ও পথের সৃষ্টি। এ'রকম ক'রে বসতে হবে, এ'রকমভাবে ধ্যান করতে হবে—এই সব। কিন্তু সত্যবস্তু সর্বদাই এক। এক নিত্যবস্তুকেই রকম রকম ক'রে সাধকেরা উপলব্ধি করেন মাত্র। যেমন চিনি—

তাকে বর্‌ফিই করো, মিঠাইই করো আর সরবৎই করো—যেভাবে খাওনা কেন। তাই উপায় আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য বা বস্তু এক।

ন্যায়-বৈশেষিকের মতে কার্যের সৃষ্টি বা উৎপত্তি আছে, অর্থাৎ কারণে কার্য ছিল না এবং নূতনভাবে তা সৃষ্টি হোল। উৎপত্তির আগে ঘট ছিল না, ঘট কারণরূপ মাটিতে ছিল ও পরে উৎপন্ন হোল এবং কুম্ভকার ঘট তৈরী করলো। একে বলে অসৎকার্যবাদ। তাদের মতে কার্য কিনা সৃষ্টি আগে ছিল না—অসৎ ছিল, পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হোল। এরই নাম অসৎকার্যবাদ। কার্য কিনা ঘট আগে ছিল না সুতরাং অসৎ, কিন্তু পরে সৃষ্টি হোল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘট সৃষ্টি হোল, তাই ইচ্ছা ঘটের নিমিত্তকারণ আর মাটির পরমাণুগুলো সমবায়ীকারণ। অসৎকার্যবাদে কার্য কারণ থেকে আলাদা। অসৎ থেকে সেখানে সতের সৃষ্টি। অসৎ কিনা ছিল না—পরে হোল। শূন্যবাদ অনেকটা তাই। সাংখ্যদর্শন একথা স্বীকার করে না। সাংখ্যের মতে অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হ'তে পারে না। সাংখ্যসূত্রে আছে: "নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ,"—অর্থাৎ কিছুই ছিল না, আকস্মিকভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হোল এ'কথনো হয় না। গীতার "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" কথাগুলি সাংখ্যেরই প্রতিধ্বনি। বাস্তবিকপক্ষে সৎ থেকেই সতের সৃষ্টি হয়। একে বলে সৎকার্যবাদ। যা পূর্বে কারণকারে ছিল তাই পরে কার্যের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। সাংখ্য, বেদান্ত এরা সৎকার্যবাদী। সৎকার্যবাদীরা বিশ্বসৃষ্টির আগে একটা কারণ স্বীকার করে। সাংখ্যে কার্য ও কারণ ভিন্ন নয়। সাংখ্যের মতে কারণই কার্যের আকারে প্রকাশ পায়; effect-ই (কার্যই) cause-এর (কারণের) একটা ভিন্ন রূপ, অর্থাৎ cause itself becomes an effect (কারণ নিজেই কার্যের আকারে রূপান্তরিত হয়)।

জগৎ বা সৃষ্টির কথা ভাবতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একজন সৃষ্টিকর্তার কথাও ভাবতে হয়, কেননা কারণ ছাড়া কার্য ভাবা অসম্ভব।[১৫]

কারণ ঈশ্বর[১৬] আর কার্য সৃষ্টিবৈচিত্র্য বা বিশ্বপ্রপঞ্চ। সৃষ্টি দেখে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অনুমান করি,—যেমন মাটির ঘট দেখে বলি এটা একজন কুম্ভকার তৈরী করেছে। কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম কখনো কিছু সৃষ্টি করেন না। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলাই ভুল। 'তিনি সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ'। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি এ'দুটো মায়ার এলাকার কথা; পার্থিব মায়ারাজ্যে না এলে এসব কিছুই হবার যো নেই। মাণ্ডুক্যকারিকায় গৌড়পাদ তাই বলেছেন: "অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ,"—মায়ার প্রভাবে তিনি (ব্রহ্ম) বহু রূপে প্রকাশ পান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন খাদ না হলে গড়ন হয় না। সোনার গয়না গড়ার সময় তাই কিছু কিছু তামার খাদ মেশাতে হয়, খাঁটি সোনায় গড়ন হয় না। শুদ্ধব্রহ্মে সৃষ্টি নেই, সৃষ্টির জন্য তাই মায়ার সাহচার্য দরকার। গড়নে খাদ কিনা মায়া। মায়ার সাহায্য না নিলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাই মায়ার রাজ্যে বাস করেন।[১৭] মায়াকে সহায় ক'রে হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তবে প্রজ্ঞা-ঈশ্বর যিনি তিনি মায়াধীশ বা মায়ার অধিশ্বর। অব্যক্ত-ঈশ্বরে সৃষ্টির ইচ্ছা থাকে, কিন্তু বাস্তবভাবে সৃষ্টি করেন হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর। হিরণ্যগর্ভ মায়ার অধীন। মায়া কার্যকরী হয় বলে সৃষ্টি সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অব্যক্ত-ঈশ্বর-সম্বন্ধে বলেছেন সাপের ভিতর বিষ থাকে, সাপের কিছু করতে পারে না, কিন্তু বিষ অপরের অনিষ্ট করে। ঈশ্বরে কারণকারে মায়া থাকে কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপকে তা বিকৃত করতে পারে না। ঈশ্বর আবার সগুণ ও নির্গুণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন রূপ ও অরূপের কথা। অরূপের ধ্যান হয় না। অরূপ নির্গুণ কিনা attributeless (গুণহীন) ব্রহ্ম। নাম ও রূপই গুণ। অরূপ বা নির্গুণকে উপলব্ধিমাত্র করা যায়। অরূপ অর্থাৎ নিরাকার। নিরাকারকে কি ক'রে ধ্যান করবে বলো! তখন বোধে বোধ। বোধে বোধ কিনা

কেবল অনুভূতি। ব্রহ্ম এক আর অনুভূতি তা থেকে ভিন্ন এ'রকম নয়, ব্রহ্ম অনুভূতিরই স্বরূপ। *Realization* of the Absolute (ব্রহ্মের অনুভূতি) বলতে *realization*-ও (অনুভূতিও) যা Absolute-ও (ব্রহ্মও) তাই।[১৮] ব্রহ্ম ও ব্রহ্মানুভূতি তাই এক ও অভিন্ন।

মায়াধীশ ঈশ্বর অব্যক্ত। পূর্বেই বলেছি অব্যক্তে সৃষ্টির বীজ কারণাকারে থাকে। কার্যের আকারে তা প্রকাশ পায় হিরণ্যগর্ভে। এই হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও বিশ্বস্রষ্টা। হিরণ্যগর্ভে মায়া ব্যক্ত, তাই সৃষ্টি সম্ভব। Time, space ও causation-এর (দেশ, কাল ও নিমিত্তের) ভিতর এলেই ব্রহ্ম সগুণ এবং ঈশ্বর। সগুণ কিনা গুণযুক্ত। Time, space ও causation-ই গুণ বা মায়া। মায়াই কার্য। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। নয়কে হয় করা ও হয়কে নয় করা মায়ার কার্য। কার্যই শক্তি। ঈশ্বর শক্তিমান, কিন্তু ব্রহ্মে শক্তি নাই। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।

জগৎ বা সৃষ্টি attribute (গুণ) ছাড়া কিছু নয়। Attribute-এর (গুণের) স্বভাব limit (সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ) করা। যেমন 'ফুল'—এই কথা বল্লে পৃথিবীতে যত রকম ফুল আছে collectively (সমষ্টিভাবে) সবগুলোকে বোঝায়। কিন্তু যখনই বলবে 'লাল ফুল', 'সাদা ফুল' বা 'হলদে ফুল' তখন আর সব ফুলকে বোঝায় না, কেবল ফুলের মধ্যে যেগুলো লাল, সাদা বা হলদে রঙের সেগুলোকে বোঝায়। আবার যদি বলো 'খুব লাল ফুল' তাহলে লাল ফুলের ভিতর যেগুলো বেশী লাল সেগুলোকে মাত্র বোঝায়, কম লালরঙের ফুলকেও বোঝাবে না। সে রকম attribute (গুণ) যতই কোন জিনিসের সঙ্গে যোগ করবে ততই তার পরিধি limited (সীমাবদ্ধ) হয়ে পড়ে। Attribute-কে তাই limiting adjunct বা determining property (সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ক'রে এ'রকম গুণ) বলে। Limiting property হোল quality—যাকে

আমরা সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় বলি বিশেষণ। বিশেষণের স্বভাব বিশেষ্যকে limit (সীমাবদ্ধ) ও definite (নির্দিষ্ট) করা। রামানুজের মতে ঈশ্বর সমস্ত quality বা গুণের ও শক্তির আকর।[১৯] তিনি বলেছেন: "সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ"। ঈশ্বরে সমস্ত গুণের সমাবেশ—তেজ, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য: "তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধ, সুবীর্যাদিগুণৈকরাশিঃ"।[২০] অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্মে কোন গুণ থাকতে পারে না, কারণ গুণ থাকলে ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হন। তাই তাঁকে সর্বগুণবর্জিত pure consciousness অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান বা 'চিৎ' মাত্র বলা যায়।

বিভিন্ন উপনিষদেও সৃষ্টির কল্পনা আছে। যেমন "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,"—তিনি (সগুণব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ) জগৎ সৃষ্টি ক'রে তার (সৃষ্টির) মধ্যে প্রবেশ করলেন; "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব,"—এক হলেও তিনি বহু রূপ ধারণ করলেন, "একোঽহং বহু স্যাম্,"—তিনি এক কিন্তু বহু হলেন। অনুপ্রবেশ, প্রতিরূপ, বহু এ'সবই সৃষ্টির কথা। সৃষ্টি কিনা বৈচিত্র্য বা মায়া। একেরই বিচিত্র বা বহু রূপে প্রকাশের নাম সৃষ্টি। কঠোপনিষদে (১।২।১২) আছে: "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি", —এক হয়েও তিনি (আত্মা) নিজেকে বহুভাবে বিভক্ত করেন। তবে উপনিষদে সৃষ্টির কথা থাকলেও শঙ্করাচার্য বলেছেন উপনিষদের তাৎপর্য সৃষ্টিতে নয়। সৃষ্টি তাঁর মতে মিথ্যা অর্থাৎ কল্পিত, কেননা সৃষ্টি মানেই বহু বা বৈচিত্র্য। ব্রহ্মে বহুত্ব নেই—একত্বও নেই, তিনি বহু ও একের ঊর্ধ্বে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে: "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। নাম ও রূপ মিথ্যা আর নাম ও রূপের পারে যিনি তিনি ব্রহ্ম, তিনিই সত্য। ঘট নষ্ট হলেও তার উপাদানকারণ যেমন মাটি থাকে তেমনি জগৎ নাম-রূপের বিকার, নাম-রূপ নষ্ট

হলেও তাদের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম 'সৎ'-রূপে থাকেন। সৎই substratum of the world (জগতের অধিষ্ঠান)। 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'— 'মৃত্তিকাই সত্য' একথা বলায় ব্রহ্ম যে একমাত্র সত্য, তিনি ভিন্ন আর সব অসত্য বা মিথ্যা একথাই বলা হোল। 'সৎ'-স্বরূপ ব্রহ্মের উপর জগৎ অধ্যস্ত এবং অধ্যস্ত বলেই মিথ্যা। তাই জগতের ব্যবহারিক সত্তামাত্র স্বীকৃত, পারমার্থিক সত্তা কিছুমাত্র নেই।

জগৎও নাম-রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে", —সৃষ্টির আগে তিনি (ব্রহ্ম) অব্যাকৃত (অব্যক্ত ঈশ্বরের) অবস্থায় ছিলেন। তখন না ছিল সৎ, না ছিল অসৎ। তারপর নামে ও রূপে তিনি নিজেকে ব্যাকৃত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশ বা ব্যক্ত করলেন। আপন শক্তির সাহায্যে তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। শক্তিই মহামায়া। বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা হলে মায়া বা মহামায়া আর মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য বিবেকচূড়ামণিতে শক্তিকে বলেছেন অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়া। যেমন,

> অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা,
> কার্যানুমেয়া সুধীয়ৈব মায়য়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে।
> *   *   *   মহাদ্ভুতানির্বচনীয়ারূপা ॥

মায়া বা অবিদ্যাই সত্ত্ব, রজ, তমোগুণময়ী ও অনাদি। মায়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করে। মায়াকে সাংখ্য বলেছে প্রকৃতি আর তন্ত্রে মায়া আদ্যাশক্তি। বেদান্তও মায়াকে শক্তি বলেছে, তবে এ' শক্তি মিথ্যা কিনা অনির্বচনীয়া। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি তেমনি অভেদ। বৈষ্ণবাচার্যেরা মায়া বা শক্তির আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ স্বীকার করেন, যেমন অচিন্ত্যশক্তি, স্বাভাবিকশক্তি, মায়াশক্তি, হ্লাদিনীশক্তি। বৈষ্ণবদর্শনের মতে ব্রহ্ম

শক্তিমান সুতরাং সগুণব্রহ্ম। শক্তিকে তাঁরা মিথ্যা বলেন না, বলেন পরমাত্মার সঙ্গে শক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ। জীব-গোস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। অদ্বৈতবাদীরা মায়াকে যেমন অঘটনঘটনপটীয়সী বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মতেও তাই। তবে অদ্বৈতবাদীরা মায়াকে অনির্বচনীয়া বলেন আর মায়া ও ব্রহ্মের মধ্যে পারমার্থিক কোন ভেদ স্বীকার করেন না। ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার বা জগতের সম্বন্ধস্বীকারকেও অদ্বৈতবাদীরা কাল্পনিক বলেন। অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্ম নির্বিকার ও কূটস্থ। শুদ্ধব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ব্রহ্মকে দেখিয়ে দিয়ে মহামায়া অদৃশ্য হন, ব্রহ্মের কাছে যেতে পারে না।

আত্মা কখনো জন্মান না বা মরেন না। জন্মায় বা মরে যা তা অনাত্মা বা জড়। জন্ম, ক্ষয়, বৃদ্ধি, অস্তিত্ব, পরিণাম ও বিনাশ এই ছ'রকম বিকার জড়ের ধর্ম। আত্মায় এ'সবের বালাই নেই। আত্মা নির্বিকার সুতরাং ছ'টি বিকাররূপ কোন ধর্ম আত্মায় থাকে না। অর্জুন মোহবশত আত্মা শরীর থেকে আলাদা একথা বুঝতে পারে নি। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও অবিনশ্বর, শরীর জড় ও বিকারধর্মী—এই জ্ঞান বা বিবেক অর্জুনের তখন লোপ পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই পরমজ্ঞান দিয়ে বল্লেন: "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে",—অর্জুন, শরীরকে মাত্র হত্যা কিনা বধ করা যায়, আত্মা বা শরীরী কিন্তু চিরকাল অক্ষয় ও অব্যয়। সুতরাং এ' তোমার কী রকম হীনবুদ্ধি যে শরীর নষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে শরীরী বা আত্মাও বিনষ্ট হয় একথা তুমি চিন্তা করছ। জড়শরীরের ধর্ম তুমি চৈতন্যময় আত্মার ওপর আরোপ করতে যাচ্ছ কেন? এ' তোমার অবিবেক। তুমি বিচারবুদ্ধি দিয়ে সৎ-কে অসৎ থেকে আলাদা করতে পারছ না। মরণশীল শরীর ধ্বংস হলেও শরীরীর কখনো ধ্বংস হয় না একথা তুমি অনুভব করো। আত্মা যেমন এখনো আছেন, শরীরের ধ্বংস

হলে তেমনিই থাকবেন। তাঁর কি কখনো জন্ম, মৃত্যু বা কোন রকম বিকার হতে পারে?

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

পার্থ, যে জ্ঞানীপুরুষ আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বোলে জানেন তিনি ক্যামন ক'রে কাকে হত্যা করেন আর কাকেই বা হত্যা করান? হত্যা করা বা করানো এ'দুটো কাজে কর্তার ইচ্ছা বা কর্তৃত্ববোধ থাকা চাই। 'আমি'-বোধই কর্তৃত্ববোধ। কিন্তু 'আমি' বা 'আমার' বোধ আসে কি ক'রে? আত্মা নিস্পৃহ ও নিষ্কাম, তিনি একমাত্র সৎ, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর একটা 'আমি' বা personality-র (ব্যক্তিত্বের) আরোপ তাঁতে ক্যামন ক'রে হয় আর কেই বা করে। তিনি আপ্তকাম ও পূর্ণ, সুতরাং তাঁর আবার কী অভাব বা কামনা থাকতে পারে যা তিনি পূর্ণ করতে চাইবেন। কি দিয়েই বা তিনি কামনা পূর্ণ করবেন। দুই বা অনেক থাকলেই দেওয়া, নেওয়া, আমি, তুমি—এসব বোধ থাকে, কিন্তু যেখানে তিনিই মাত্র সত্য ও অদ্বিতীয় সেখানে কিছু দেওয়া নেওয়া বা কারু সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা ক্যামন ক'রে হয়। সেখানে শত্রুও নেই, মিত্রও নেই, সুতরাং দ্বেষ-হিংসাও নেই বুঝতে হবে।

কিছু অভাব থাকলেই তা পূর্ণ করার প্রবৃত্তি আসে। প্রবৃত্তিই সংসারের মূল। প্রবৃত্তি থেকে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা এ'সবের সৃষ্টি। প্রবৃত্তি ও সংকল্প একই। সৃষ্টির পূর্বে (সগুণ) ব্রহ্ম ৩০মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন, তাই এক হয়েও তিনি বহুরূপ ধারণ করলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে: "সোঽকাময়। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত" ইত্যাদি। তিনি কামনা করলেন সুতরাং বহু হলেন এবং 'আমি বহু হব' এই আমিত্ব বা 'অহং'-অভিমান ও মায়া তাঁকে এক থেকে দু'য়ে

বা বহুতে পরিণত (বিবর্তিত) করলে। তিনি তপস্যা করলেন অর্থে তিনি সংকল্প করলেন। তাঁর মনে মনে চিন্তাই তপস্যা। তাই বহু হবার ইচ্ছা যখন (সগুণ) ব্রহ্মে জাগ্রত হোল তখন তিনি আর এক বা অখণ্ড নন, তিনি সংকল্পযুক্ত ও বহু হ'য়ে মায়ার রাজ্যে নেমে আসেন। এখানেই শিব ও শক্তি বা অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা। দুই বা ভেদের কল্পনা মায়া না থাকলে হয় না। তন্ত্রে চণকাকারে শিব ও শক্তি এক ও অখণ্ড হলেও দুই। শিব ও শক্তি এক আবার ভিন্ন। একেই বলে শাক্ত্যাদ্বৈতবাদ। শিব ও শক্তি দু'জনে মিলে অদ্বৈত। চণকাকারে এক ও অদ্বৈত। কলাইয়ের মধ্যে দুটি অংশ থাকে অথচ আবরণের মধ্যে তারা এক। ভেদকল্পনা থেকেই relative world-এর (আপেক্ষিক জগতের) সূচনা। Relativity (আপেক্ষিকতা) যেখানে সেখানে দুই বা বৈচিত্র্য থাকে। অদ্বিতীয় দুয়ের পারে। Relative world-ই (আপেক্ষিক জগৎই) মায়ার রাজ্য। দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, 'এ আমাকে হত্যা করবে' বা 'আমি ওকে হত্যা করবো'—এ'সব চিন্তা মায়ার রাজ্যে। মায়ার পারে দ্বন্দ্ব, কলহ কোনটাই নেই, আছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

মায়াই দ্বৈতভূমি বা সৃষ্টি। মায়ার এলাকায় আমি ও তুমি, আপন ও পর, এক ও দুই, রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দ্বৈতধারণা। মায়ামুক্ত আত্মার কথা স্বতন্ত্র। আত্মা জন্ম-মৃত্যুহীন নিত্য ও অবিনাশী। আত্মাকে কেউ কখনো বিনাশ করতে পারে না এবং আত্মাও কাউকে কখনো বিনাশ করেন না। বিনাশ বা হিংসা করা প্রভৃতি কাজ প্রবৃত্তি থেকে আসে। আত্মায় প্রবৃত্তি কোথা। প্রবৃত্তিই সংকল্প বা মায়া। শুদ্ধ আত্মায় যখন মায়াই থাকে না তখন প্রবৃত্তি বা সংকল্প থাকবে ক্যামন ক'রে! আবার প্রবৃত্তি, কামনা বা সংকল্প না থাকলে কাকেও হত্যা করা বা হত্যা করানোর ইচ্ছা জাগে না। আত্মার স্বরূপ যিনি যথার্থভাবে জানেন তিনি মোহবশত আত্মার

ওপর কোন কর্তৃত্ব আরোপ করেন না। অজ্ঞানই মোহের কারণ। জ্ঞানীর কাছে অজ্ঞান থাকে না, সুতরাং অজ্ঞানের কোন কাজও জ্ঞানীকে ভ্রমে ফেলতে পারে না।[৩২] অজ্ঞানীরা আত্মাকে শরীরধারী একজন পুরুষ বোলে মনে করে আর সে' পুরুষই তার ভগবান। ঈশ্বর পাপের শাস্তি দেন, দোষীর বিচার করেন, অপরাধীকে হত্যা করেন—এ'সব অজ্ঞানীরা কল্পনা করে। কিন্তু আত্মার কোন দেহ নাই বা ইন্দ্রিয় নাই। তিনি শরীরে চৈতন্যরূপে থাকলেও শরীরের কোন ধর্ম তাঁকে স্পর্শ করে না। শরীর পঞ্চভূতের খাঁচা, তাই শরীরের বিকার আছে, কিন্তু শরীরের বিকারে শরীরীর কোন বিকার হয় না। তিনি নির্বিকার।

অনেক জাতির ধারণা আত্মাই ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তাকে তারা extra-cosmic personal God (জগৎ থেকে বাইরে সাকার ঈশ্বর) বলে। তাদের ঈশ্বর মেঘের ওপর সিংহাসনে আসীন, হাতে দণ্ড, আমাদেরি মতো পাপ-পুণ্যের বিচার ক'রে পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার আর পাপীকে শাস্তি দেন। খৃষ্টানধর্মে আবার একজন শয়তান (Satan) স্বীকার করা হয়েছে। শয়তানের চক্রে ইভ (Eve) প্রলুব্ধ হোল আর ইভের পাপে তার স্বামী আদমও (Adam) স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এলো।[৩৩] এটাই খৃষ্টানদের ধারণা। খৃষ্টানধর্মের মতে নারীজাতি যত-কিছু পাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ'সব নিছক কল্পনা। কল্পনা সকল জাতির মধ্যে আছে। বেদান্তে পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা নাই, সুতরাং দণ্ড বা পুরস্কার দেবার কর্তাও কেউ নাই। ভগবান, ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা এ'সব মায়ারাজ্যের কথা। যতক্ষণ বিশ্ববৈচিত্র্যরূপ ঐশ্বর্য ততক্ষণই সৃষ্টিকর্তা ; যতক্ষণ কল্পনা বা সৃষ্টিকে সত্য বোলে মনে করছ ততক্ষণই জগতের সত্তা। আত্মা কখনও কিছু সৃষ্টি করেন না, সুতরাং তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয় মায়াকে মাত্র উপলক্ষ্য ক'রে।[৩৪] মায়াতেই সৃষ্টি, শুদ্ধ আত্মায় সৃষ্টি নাই।

পাপ ও পুণ্য বা ভাল ও মন্দ ফলের জন্য ভারতীয় দর্শনে কর্মফল স্বীকার করা হয়েছে। যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফল পায়, তার জন্য ঈশ্বর, সয়তান বা ইভ কেউই দায়ী নয়। কথা এই যে ভাল-মন্দ কর্মফল দেওয়ার ব্যাপারে ঈশ্বরই যদি একমাত্র কর্তা হন তা'হলে একটা personality-রও (ব্যক্তিত্বেরও) আরোপ তাঁতে আমাদের করতে হবে। তিনি যে আমাদেরই মতো একজন মানুষ এবং শক্তিমান একথা মানতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে partiality (পক্ষপাতিত্ব) প্রভৃতি human weakness-ও (মানুষের দুর্বলতাও) আরোপ করতে হবে। কিন্তু কথা এই যে তাঁর সন্তান বা প্রজা সকলেই সুতরাং তিনি একজনকে পুরস্কার দেবেন আর একজনকে শাস্তি দেবেনই বা কেন। পুরস্কার বা শাস্তিরও আবার কম বেশী আছে। যদি বলো তিনি শাস্তি দেন কেবল তাকে যে দোষ করে আর পুরস্কার দেন তাকে যে ভাল বা পুণ্য কাজ করে, কিন্তু তাহ'লেও ভাল-মন্দের বিচারক যদি ঈশ্বর হন তবে বৈষম্যাদি দোষ[৩৫] তাঁতে অবশ্যই আসবে। কখনো কখনো তিনি কারুর ওপর হয়তো কম-বেশী সুনজরও দ্যাখাতে পারেন। তারপর বিচারকের আসনে বসে যখন তিনি বিচার করেন তখন দেশ, কাল এবং নিমিত্তকে কখনো অগ্রাহ্য করতে পারেন না, কাজেই দেশ, কাল ও নিমিত্তের অর্থাৎ মায়ার দ্বারা ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন। কিন্তু এ'সব আশঙ্কা বা কল্পনা অমূলক। আসলে ঈশ্বর কারুর ভাল-মন্দের জন্য কখনো দায়ী নন। তিনি কাউকে পাপ বা পুণ্য—সুখ বা দুঃখ দেন না, সুখ-দুঃখ বা পাপ-পুণ্য যে যার কর্মফলে মানুষ ভোগ করে। তাই গীতায় আছে,

> ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥
> নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥[৩৬]

'আত্মা বা ঈশ্বর মানুষের কোন কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফলপ্রাপ্তি প্রভৃতি সৃষ্টি করেন না। অবিদ্যার জন্য কর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ আমরা আত্মায় বা ঈশ্বরে আরোপ করি মাত্র। আত্মা বা ঈশ্বর কারু পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না, কেবল অজ্ঞানে বা মোহে মানুষ ভাবে আত্মা বা ঈশ্বর সকলকে পাপ-পুণ্য অথবা ভাল-মন্দ ফল দান করেন'। আসলে ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের ধারণা আমাদের কল্পনা বা মনের সৃষ্টি। এমন কি কল্পনা দিয়ে আমরা স্রষ্টা ঈশ্বরও সৃষ্টি করি এবং আমাদের যত-কিছু গুণ বা দোষের বোঝাও তাঁর ওপর চাপিয়ে দিই।[৩৭] বেদান্তেও ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সে ঈশ্বর মায়াধীশ, নির্বিকার ও সাক্ষীস্বরূপ। তিনি এক ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা।[৩৮] উপনিষদে আছেঃ "সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ; একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে";[৩৯]—অর্থাৎ সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষুর নিয়ন্তা হয়েও চক্ষুসম্বন্ধে সকল দোষ থেকে নির্লিপ্ত তেমনি ঈশ্বররূপী আত্মা বা ব্রহ্ম সকল ভূতের অন্তরে থেকেও তাদের শোক-দুঃখের সঙ্গে কখনো লিপ্ত হন না, তিনি সকল সময় শুদ্ধ ও অবিকারী।[৪০] কৌষিতকীতে আছেঃ "ন সাধুনা কর্মনা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্, এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীয়তে";[৪১]—অর্থাৎ সৎকাজ বলো আর অসৎকাজই বলো,—পাপ বলো আর পুণ্যই বলো কোন-কিছুতে চির-পরিশুদ্ধ আত্মা কখনো লিপ্ত হন না। আত্মাকে এ'সমস্ত দোষ বা গুণ কখনো কলুষিত বা সমুজ্জ্বল করতে পারে না। আত্মা সকল সময় নির্লিপ্ত ও সুখ-দুঃখের অতীত। সূর্য যেমন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতি বা বর্ণ বিচার না ক'রে নির্বিচারে ও নিরপেক্ষভাবে সকলের ওপর কিরণ বর্ষণ করে তেমনি ঈশ্বরও সকলের প্রতি সমদর্শী ও ন্যায়বান। কোনরূপ ফলদানে তাঁর নিজের কোন কর্তৃত্ব বা অভিমান থাকে না। তিনি পদ্মপত্রে জলের মতো

নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ এবং দ্রষ্টা। তিনি সাক্ষী ও অন্তর্যামীরূপে সকলের অন্তরে থাকেন, অথচ কোন-কিছুতে কখনো লিপ্ত হন না, মানুষ যে যার কর্ম অনুসারে ফল লাভ করে।

তবে এক কথা যে ভক্তি বা ভক্তের দিক থেকে ঈশ্বর একজন স্বীকার করা হয়, নইলে সান্ত্বনা ও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ মনের দুঃখ কষ্ট কাকে আর জানাবে বলো! ভক্ত তাই দ্বৈতবাদী। অবশ্য বিচার বা জ্ঞানের দিক থেকে স্বতন্ত্র কথা। যেখানে দুই নেই সেখানে কে কার কাছে আর দুঃখ কষ্ট জানাবে। মায়াকে সহায় করেই সৃষ্টিকর্তার কল্পনা।[৪৪] সৃষ্টি আছে বোলেই স্রষ্টা। মানুষ মায়ার অধীন। আত্মায় বা ব্রহ্মে মায়া নেই সুতরাং সৃষ্টিই বা করবে কে, অথচ উপনিষদে আছে তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও নিজেকে নানারূপে প্রকাশ করেন। এই 'সব' বা নানাই বিকাশ বা সৃষ্টি। সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে 'সব' আছে আবার 'নানা'ও আছে। কিন্তু সৃষ্টি বা বৈচিত্র্য আসলে সত্য নয়—আরোপিত ও মিথ্যা, সত্য একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মা। হে অর্জুন, আত্মার কোন শরীর নেই, সুতরাং কোন সংকল্প তাঁতে থাকে না বা তিনি কারু হিংসা করেন না। যেখানে দুই নেই—অদ্বিতীয় সেখানে কে কাকে হত্যা এবং কে কার আর হিংসা করবে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥[৪৫]

লোকে জীর্ণ পুরাণো কাপড় ত্যাগ ক'রে যেমন নূতন কাপড় পরে তেমনি আমাদের আত্মাও জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে অন্য একটা নূতন দেহ ধারণ করেন। অবশ্য দেহ ধারণ করার মালিক আত্মা নন, মায়ার জন্যই ভোগায়তন দেহের সৃষ্টি। শুদ্ধ আত্মায় মায়া বা মায়ার কল্পনা নেই সুতরাং তাঁর শরীরধারণও নেই। তারিজন্য আত্মাকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে হত্যা করা যায় না, অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না, বাতাস শুষ্ক করতে পারে না। বিশুদ্ধ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত, কূটস্থ, অচল ও সনাতন।

আমাদের স্থূলদেহ একটা জামার মতো। দেহ যেন আত্মা আর জামা শরীর। আমরা যেমন একই কাপড় ও জামা ক্রমাগত পরি না—পুরোণোটা ছেড়ে নূতন একটা পরি তেমনি আত্মা বা শরীরী পুরোণো শরীর ত্যাগ ক'রে নূতন শরীর ধারণ করেন। শঙ্করাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে তিনি 'যেন' ('ইব') শরীর ধারণ করেন। এ' হোল তাঁর মায়িক দেহধারণ। শরীর ধারণ করাতেই হয় জীবাত্মার জন্ম, কিন্তু আত্মা কখনো জন্মান না বা মরেন না। জন্ম থাকলেই মৃত্যু। আত্মায় এ'দুটোর কোন ধর্মই কখনো থাকে না। তা'হলে এখন কথা যে জন্ম ও মৃত্যু হয় কার? দেহের—না দেহীর? শরীরের—না শরীরী আত্মার? শরীরের নাশ আছে, কিন্তু শরীরী তো অবিনাশী। গীতায় আছে: "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্ * * নিত্যঃ * * সনাতনঃ"। দেহী বা আত্মায় জন্ম-মৃত্যুরূপ ধর্ম থাকে না, থাকে দেহী আত্মা যেটাকে আশ্রয় করেন সেই দেহে। দেহেরই ক্ষয়-বৃদ্ধি ও জন্ম-মৃত্যু আছে, দেহী এ' সবের পারে। দেহী সর্বগত, নিত্য ও সনাতন। তবে মিথ্যাপ্রত্যয় বা ভ্রমের জন্য মানুষ মনে করে দেহী জন্মাচ্ছে ও মরছে কিন্তু তা ঠিক নয়। দেহী দেহ ইন্দ্রিয় মন কোনটাই নন, তিনি মন বুদ্ধি ও অহংকার

সকল-কিছুর পারে অথচ সবার মধ্যে আবার অনুস্যূত: 'সূত্রে মণিগণা ইব'। অনেকগুলি মণি যেমন একটি সূতোয় গাঁথা থাকে তেমনি। মণি অনেক, সবগুলির ভিতর ছিদ্র থাকে, কিন্তু একটি সূতো দিয়ে সবগুলো গাঁথা। আত্মাও তেমনি সবার মধ্যে থাকেন। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি',—তিনি থাকেন বোলেই জাগতিক সকল-কিছুর সত্তা ও প্রকাশ। তিনি সকলের মূল বা কারণ, তাঁকে অধিষ্ঠান করেই জগতের সমস্ত-কিছু বিদ্যমান।[৪৬]

যারা দেহাত্মবাদী অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বোলে মনে করে তারা আত্মার ক্ষয়-বৃদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি স্বীকার করে। খৃষ্টানদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা দেহের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে ও শেষবিচারের দিন (last day of judgement) জেগে উঠে জগৎপিতার (God the Father) কাছে বিচারের জন্য হাজির হয়, ঈশ্বর তাদের বিচার করেন এবং বিচারে পুণ্যাত্মারা অনন্ত স্বর্গসুখ ও পাপাত্মারা অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। প্রাচীন মিশরে (Egypt) লোকের ধারণা এ'রকমের ছিল। তারা মনে করতো যতদিন দেহ থাকে ততদিন আত্মা থাকে, দেহের নাশ হোলে আত্মারও নাশ হয়। তাই মৃতদেহে নানারকম ওষুধ মাখিয়ে মমি (Mummy) ক'রে তারা বাক্সের মধ্যে তা preserve (রক্ষা) করতো এবং তার সঙ্গে অনেক খাবার জিনিস, বাসন-পত্র, কাপড়-জামাও দিত। এই ক'রে সারা ইজিপ্টের বুকে কত পিরামিড আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে ওষুধ-দেওয়া হাজার হাজার বছরের কত পুরাণো মৃতদেহ ইজিপ্টে আবিষ্কার হচ্ছে। বেদান্তের ধারণা এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গীতার কথাও তাই। গীতায় আত্মাকে বলা হয়েছে অবিনাশী, অব্যয়, নিত্য, অজ ও শাশ্বত। যেমন,

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মার জন্ম হয় না বা আত্মা মরেও না ; তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরেব মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অতিশয় সূক্ষ্মপদার্থ; সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মাকে তাই দেখা যায় না। ইথারের (ether) যেমন সত্তা আছে কিন্তু চোখে দেখা যায় না তেমনি আত্মা অতীন্দ্রিয়। ইথারের (ether) চেয়ে আত্মা আরো সূক্ষ্ম, এজন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে আত্মাকে ধরা-ছোওয়া যায় না। কিন্তু তাই বোলে এ'নয় যে আত্মার কোন সত্তা নেই। আত্মার সত্তা চিরদিন আছে ও থাকবে। সাধারণত আমরা মনে করি যে-বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বা চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় না তার কোন সত্তা নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়। চোখে দেখা যায় না এমন অনেক জিনিস আছে অথচ তাদের সত্তা অস্বীকার করা যায় না। বাতাস চোখে দেখা যায় না কিন্তু তাকে আমরা স্পর্শ করি। নেপচুন (Neptune) চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না কিন্তু তাই বোলে কি বলতে হবে নেপচুনের কোন অস্তিত্ব নেই? Telescope (দূরবীক্ষণযন্ত্র) দিয়ে নেপচুনকে দেখা যায়, সুতরাং তার অস্তিত্ব আছে। সৌরজগতে এমন হাজার হাজার গ্রহ উপগ্রহ আছে যেগুলোকে হয়তো খুব powerful telescope (শক্তিমান দূরবীক্ষণযন্ত্র) দিয়েও দেখা যায় না, কিন্তু তাই বোলে কি বলবে তাদের অস্তিত্ব নেই? তা কেন? কালে (সময়ে) বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরো কত নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হবে, আরো কত শত অজানা অতীন্দ্রিয় জিনিস আমরা দেখতে পাব ও জানতে পারব।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি লণ্ডনে তখন স্যর জে. সি. বোস (স্যর জগদীশচন্দ্র বোস) *X-ray* (একস্-রে) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই আলোকরশ্মি দিয়ে সূক্ষ্মজিনিস দৃষ্টিগোচর করা যায় এবং অন্ধকারের বা ঘরের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে দূরের বা বাইরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। আজকাল *X-ray* (একস্-রে) medical treatment-এ

(ডাক্তারি চিকিৎসায়) ব্যবহার করা হচ্ছে। পেটের ভিতর খাবারের সঙ্গে একটা আলপিন্ হয়তো খেয়ে ফেল্লে, *X-ray*-র সাহায্যে তাকে দেখতে পাবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, প্রকৃতির মধ্যে সকল শক্তিই সুপ্ত আছে। প্রকৃতি কিনা Cosmic Energy। প্রকৃতিই অব্যক্ত বা ঈশ্বর। প্রকৃতিকে তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি, সাংখ্যে মূলাপ্রকৃতি আর বেদান্তে মায়া বা অবিদ্যা বলা হয়েছে। তবে সাংখ্য, বেদান্ত ও তন্ত্রমতের মধ্যে পার্থক্য হোল সাংখ্যে প্রকৃতি জড়া বা inactive, বেদান্তে প্রকৃতি পরিবর্তনশীল অনিত্য এবং তন্ত্রে প্রকৃতি জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছাময়ী। প্রকৃতিই শক্তির আধার। শক্তি যখন বাইরে প্রকাশ পায় না তখন কারণাকারে প্রকৃতিতে সুপ্ত থাকে। বৈজ্ঞানিকদের অবিষ্কার এই প্রকৃতি পর্যন্ত, প্রকৃতির বাইরে তাঁরা এখনো-পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

মানুষ কাজ করে, চিন্তা করে, বিচার করে, আবিষ্কার করে—এ'সবই শক্তির খেলা। কিন্তু এই শক্তি থাকে কোথা? আকাশের মধ্যে নয়, brain-এও (মাথায়ও) নয়। Brain (মস্তিষ্ক) তো একটা যন্ত্রমাত্র। আসলে আত্মায় সকল শক্তি থাকে আর will-power (ইচ্ছাশক্তি) শক্তিগুলোকে unfold (বিকশিত) করে। মনও একটি যন্ত্র। মনের মধ্যে বৃত্তি আছে। বৃত্তি মানেই মনের কাজ বা চাঞ্চল্য। মন যখন স্থির থাকে তখন বৃত্তি বা চাঞ্চল্য থাকে না, অস্থির হলেই বৃত্তির সৃষ্টি হয়। যেমন জল স্থির ও জল তরঙ্গচঞ্চল। তরঙ্গ জলের কার্য ও বৃত্তি। কিন্তু বৃত্তি মন থেকে আলাদা নয়। বৃত্তিই আবার সংস্কার এবং বৃত্তি বা সংস্কারের সমষ্টিই মন বা অন্তঃকরণ। আগেই বলেছি মন যেন জল আর বৃত্তিগুলি তার তরঙ্গ, অথবা বৃত্তি সংস্কারেরই ব্যক্ত বা জাগ্রত অবস্থা। সংস্কার seed form-এ (বীজাকারে) মনের (অন্তঃকরণের) মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। সংস্কারগুলো যখন manifested (বিকশিত) হয় তখন তারা বৃত্তির

আকার ধারণ করে। বৃত্তির একটা বিষয় থাকে। সাইকোলজিষ্টরা (মনোবিজ্ঞানীরা) বলেন সংস্কারের সমষ্টিই আমাদের subconscious mind (মনের অবচেতন স্তর)। Subconscious mind-এ (অবচেতন মনে) কত শত জন্মের সংস্কার বীজাকারে সুপ্ত থাকে। সেখান থেকে সংস্কারগুলো জাগ্রত হোয়ে আমাদের conscious mind-এ (মনের চেতনস্তরে) প্রকাশ পায়। এদের একটা সুপ্ত আর অপরটা জাগ্রত। তবে subconscious mind-ই (অবচেতন মনই) সবার চাইতে বড়। এ'যেন একটা বিশাল সমুদ্র।[৪৮]

Will-power-ও (ইচ্ছাশক্তি ও) মনের একটা বৃত্তি। মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্র মন। কিন্তু মন তো জড়, তাই মনের নিজের কোন শক্তি নেই, মনের পিছনে আত্মা থাকেন বোলে মন কাজ করে। উপনিষদে আত্মাকে তাই জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয়েছে। জ্যোতিঃস্বরূপ কিনা প্রকাশস্বভাব চৈতন্য। চৈতন্যই প্রজ্ঞা। জ্যোতির যেমন প্রকাশ আছে, আত্মচৈতন্যেরও তেমনি প্রকাশ আছে। আত্মার আলোতেই মন প্রকাশ পায় অর্থাৎ মন কাজ করে ও সচঞ্চল হয়।[৪৯] আত্মাই মনের উৎস। মৃত্যুর পর মন ও মনের বৃত্তিগুলো আত্মায় লয় হয়।[৫০] কৌষীতকিতে এ'সব রহস্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মৃত্যু মানে কি? গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" শ্লোকে দেহেরই মৃত্যু হয়,—আত্মা যেমন তেমনি থাকেন একথাই বলা হয়েছে। দেহেরই কেবল ধ্বংস আছে। দেহটা কাপড়ের মতো। একটি দেহ জীর্ণ হোলে আত্মা সেই পুরোণো দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন দেহ ধারণ করেন। এতে আত্মার কিছু যায় আসে না, আত্মা আগেও যেমন ছিলেন পরেও তেমনি থাকেন। পরে এ' দেহ নষ্ট হোলেও তিনি একই রকম থাকেন।

মৃত্যু জিনিসটা তাহলে কি? না—দেহ যেন একটা খাঁচার মতো আর তার ভিতর আবদ্ধ আছেন আত্মা। দেহ পঞ্চভূতের তৈরী

স্থতরাং দেহের পরিবর্তন ও ধ্বংস আছে। প্রতিমুহূর্তে দেহের পরমাণুগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে—এক মুহূর্তের জন্যও স্থির নেই। এখন যে দেহটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এক সেকেণ্ড পরে সে দেহ আর থাকবে না—একেবারে পালটে যাবে। এত তাড়াতাড়ি দেহ পাল্‌টাচ্ছে যে তুমি ধরতে পারবে না, কিন্তু পাল্‌টাচ্ছে। এই পাল্‌টানো বা পরিবর্তন তুমি ধরতে পারবে হয়তো অনেক দিন পরে। এ' পরিবর্তনই মৃত্যু। স্থতরাং এই মুহূর্তে যে শরীর দেখছ পরমুহূর্তে সেটার মৃত্যু হোল। অনবরতই বদ্‌লাচ্ছে। এ'রকম ক্রমাগত বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে শরীরটা শেষে জীর্ণ হোয়ে যায়, শরীরের gland (গ্রন্থি) ও muscle-গুলো (মাংসপেশীগুলো) অকেজো হোয়ে পড়ে, তখনই আত্মার নতুন একটা শরীরধারণের প্রয়োজন হয়। এ'রকম প্রয়োজন অনবরতই চলতে থাকে যতদিন না আত্মার স্বরূপের প্রকাশ হয়। আত্মস্বরূপের প্রকাশ বা জ্ঞান হোলে তখন যাওয়া-আসা সব লেঠা চুকে যায়। মনের সংশয়, কর্মবন্ধন ও আসক্তি সমস্ত দূর হোয়ে যায়ঃ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"। এর নামই মুক্তি।

দেহের ধ্বংশ বা মৃত্যুর পর আত্মা (জীবাত্মা) সূক্ষ্মশরীরে বাস করেন। এখন স্থূলশরীর আর তখন সূক্ষ্মশরীর এইমাত্র যা ভেদ। জাগ্রৎ আর স্বপ্ন। সূক্ষ্মশরীরেও অজ্ঞানের অভিমান যায় না। আত্মা (জীবাত্মা) তখন ঐ সূক্ষ্মদেহটায় অভিমান করে। সূক্ষ্মশরীরের পর আর একটা শরীর আছে, তার নাম কারণশরীর। কারণশরীরে কারণাকারে অজ্ঞান আর চৈতন্য থাকে।[৫১] সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টি হোল সতেরটি অবয়বঃ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি। সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর আর মহাকারণশরীর। মহাকারণের পর আর কিছু নেই, তখন আত্মাই একমাত্র থাকেন। সূক্ষ্মশরীর বিদেহী আত্মা। কারণশরীর হিরণ্যগর্ভ বা অব্যক্ত-ঈশ্বর।

মহাকারণশরীরের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন। মহাকারণের পর আর কি শরীর থাকবে, তখন একমাত্র শুদ্ধব্রহ্ম।

মানুষ মরে গেলে তার স্থূলশরীরেরই (material or gross body) ধ্বংস হয়, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর (psychic, astral or thought-body) থাকে। মৃত্যুর পর ঐ সূক্ষ্মশরীরের নাম 'প্রেতশরীর'। সূক্ষ্ম বা প্রেতশরীরকে দেখা যায় না, তবে মাঝে মাঝে কুয়াশা বা ধোঁয়ার মতো হোয়ে ও এমন কি স্থূলদেহ ধ'রে অপরকে দেখা দিতে পারে।

যার যেমন বাসনা তার তেমনি গতি। আমাদের বেঁচে থাকার সময় যেসব বাসনা প্রবল থাকে অথচ ভোগ হয়নি, মৃত্যুর পর সেগুলো আরো প্রবল হয়। সূক্ষ্মশরীরে প্রেতাত্মা (*psyche*) সেগুলোকে তখন ভোগ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লোকে বাস করে। লোক (plane) আর কি—লোক এক একটা মনের অবস্থামাত্র। মৃত্যুর পর মানুষ বলো আর যেকোন জীব বলো সকলে স্বপ্নলোকে বাস করে। একে স্পিরিচুয়ালিষ্টরা সাতটি স্তরে ভাগ করেছেন। তাছাড়া আরো কত লোক বা স্তর আছে, কিন্তু সবই conception বা মনের ধারণা। ধারণাও imagination (কল্পনা) ছাড়া আর কি। উপনিষদে এবং পুরাণেও ভিন্ন ভিন্ন লোকের কথা আছে।[৫৩]

প্রতিদিন যখন তোমরা ঘুমোও তখন কোথা যাও বা থাকো বলতে পার ? কোথাও নয়, এই দেহের ভিতরই থাকো। ঘুমোবার পর soul বা *psyche* (জীবাত্মা) তোমার mental plane-এ (মন বা স্বপ্নলোকে) বাস করে। Mental বা psychic plane-ই (মনোলোক) প্রেতলোক। উপনিষদে 'হিতা' ও 'পুরীতৎ' নাড়ীর কথা আছে। মানুষ যখন ঘুমোয় তখন প্রাণ বা জীবাত্মা হিতানাড়ীর ভিতর দিয়ে পুরীতৎ নাড়ীতে বিশ্রাম করে।[৫৩] একমাত্র বাসনা বা মনেরই তখন রাজ্য। খাওয়া-পরা, চলাফেরা সবই তখন বাসনায় বা মনেতে হয়। মনের বৃত্তিগুলো

তখন আরো প্রবল হোয়ে দেখা দেয়। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সবই তখন মনে, স্থূল বোলে আর কিছুই তখন থাকে না। দেশ-কালও (time and space) তাই। এক সেকেণ্ড তখন মনে হয় যেন এক যুগ। এখন এখানে আছ, এক সেকেণ্ড পরে হয়তো একেবারে কাশী চলে গ্যালে। দেশ বা কাল থাকে না বোলে পরিমাণের জ্ঞানও তখন থাকে না। আসল কথাও তাই। দেশ-কাল সেখানে কিছুই থাকে না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এসবও থাকে না। কারণ এসব তো স্থূলজগতের জিনিস, সূক্ষ্ম মনের রাজ্যে এদের সত্তা সূক্ষ্ম আকারে থাকে; অর্থাৎ স্থূলের তখন সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে আর মনে মনেই ভোগ হয়।

আগে সূক্ষ্ম তারপর স্থূল। স্থূল হোয়ে জন্মাতে গেলেও সূক্ষ্মজগতে আগে জন্মাতে হয়। যেমন তুমি একজনকে ডাকলে, কিন্তু ডাকার আগে তার ইচ্ছাটা তোমার মনে প্রথমে ওঠে। ইচ্ছা কিনা মনের বৃত্তি। যা সূক্ষ্ম ছিল তা স্থূল হোয়ে প্রকাশ পেলো। সূক্ষ্মেরও আগে কারণ। স্থূল যখন সূক্ষ্মের কার্যাবস্থা তখন স্থূল আকার ধ্বংস হোলেও তা সূক্ষ্ম আকারে মনে থাকে। তাই সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ। সাংখ্যকার কপিলের মতে "নাশঃ কারণলয়ঃ,"[৫৪]—নাশ মানেই কার্য কারণের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।[৫৫] বেদান্তে কার্য ও কারণ একই—কোন ভেদ নেই; কার্য ব্যক্ত আর কারণ অব্যক্ত এই যা ভেদ। বিজ্ঞানের কথাও তাই। তবে বৈজ্ঞানিকরা কার্য ও কারণকে ঠিক এক বলেন না, কার্য ও কারণ তাঁদের মতে আলাদা।

এ'জগতে কোন জিনিসের কোনদিন নাশ হয় না, form বা রূপেরই কেবল নাশ বা পরিবর্তন হয়।[৫৬] বিজ্ঞানও matter-কে (জড়বস্তুকে) energy-র (শক্তির) একটা ভিন্ন রূপ স্বীকার ক'রে indestructible (অবিনাশী) বলেছে। নাশ তাই কোন-কিছুরই কখনো হয় না। কার্যের আকারে যেটা ছিল, ধ্বংস হোলে কারণের

আকারে সেটা আবার ফিরে যায়; ব্যক্ত ছিল, অব্যক্ত হয়—এই যা।

জন্মান্তর আছে বৈকি। আমাদের দেশে চার্বাকদের মতো খৃষ্টানদেরও অনেকে জন্মান্তর বিশ্বাস করে না।[৫৭] কিন্তু মানুষ মরে গেলে তার জীবাত্মা বা আত্মার নাশ হয় না, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে—সূক্ষ্ম থেকে কারণে ফিরে যায়। মানুষ মৃত্যুর পর প্রেতলোকে তার সংস্কার সঙ্গে নিয়ে যায়। স্থূলের সংস্কার তখনও তার থাকে আর সংস্কার থাকে বলেই প্রেতলোকে সে যেন দেখতে শুনতে চলতে ও খেতে পারে। তবে এ'সমস্তই সংস্কারের আকারে হয়। সংস্কার হোল মানুষের thought-form। এই যে জগৎ দেখছ—ধ্বংসের পর এটা thought-form-এ (সংস্কারের আকারে) cosmic mind-এর মধ্যে (প্রকৃতি, অব্যক্ত বা ঈশ্বরে) সূক্ষ্ম আকারে থাকে। একেই প্লেটো বলেছেন *Idea* বা *Type*, আর ক্রিশ্চানেরা বলেন *Logos* বা *Word*।[৫৮] আমাদের ব্যাকরণশাস্ত্রে এর নাম স্ফোট। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি স্ফোটবাদ তথা শব্দব্রহ্মবাদ স্বীকার করেন। ব্যাকরণের দার্শনিক সিদ্ধান্তই তাই। ভর্তৃহরি প্রভৃতি শব্দব্রহ্মবাদের পক্ষপাতী। কারণশব্দের নাম স্ফোট। এই স্ফোট অবিনাশী ও নিত্য। ঘট নষ্ট হলেও যেমন ঘট শব্দ থাকে, বিশ্বপ্রপঞ্চ ধ্বংস হলেও তেমনি তার নিত্য শব্দ থাকে। এই স্ফোটই শব্দব্রহ্ম বা Word। *Idea* বা *Type*-ই সৃষ্টির বীজ। পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে আছে যে মহাপ্রলয়ের পর জীবের অদৃষ্ট বা সংস্কার বীজাকারে প্রকৃতিতে সঞ্চিত থাকে। ঈশ্বর সেই সংস্কারে সাহায্যে আবার নতুন বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন।[৫৯] যা কারণাকারের থাকে তাকে কার্যের আকারে হিরণ্যগর্ভ প্রকাশ করেন মাত্র। ঋগ্বেদে আছে (১০।১৯০।৩): "সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ", —আগেকার সব যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি আবার সৃষ্টি করেন। স্বপ্নে জাগ্রতের সংস্কার থাকে, তাই

স্বপ্নেও মানুষ হাসি-কান্না, খেলা-ধূলা প্রভৃতি করতে পারে। স্থূলের সংস্কার থাকে বোলেই জীব প্রেতলোকে কান না থাকলেও যেন শুনতে পায়, মুখ না থাকলেও যেন খায়, পা না থাকলেও যেন এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতে পারে। সবই কিন্তু সংস্কারবশে স্বপ্নের মতো অর্থাৎ কল্পনায় হয়। অবশ্য স্থূলজগতের মতো দেখা-শোনা প্রভৃতি হয় না, তখন মনেতেই সব-কিছু হয়।[৬০] মনে রাখবে যে স্থূলজগতে যতটুকু করবে ততটুকুই হবে লাভ। যদি তুমি ভাল কাজ করো তবে ভাল সংস্কারের জন্য ভাল ফল পাবে আর মন্দ কাজ করলে দুঃখ কষ্ট পাবে। সংস্কারই তোমাকে পরলোক বা প্রেতলোকে guide-এর (চালকের) মতো সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যায়।

মন কাকে বলে ? মন সূক্ষ্মসংস্কারের সমষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন সংস্কারের পুঁটুলি। অর্থাৎ মন সরষের পুঁটুলির মতো। সংস্কার যেমনটি তৈরী করবে তেমনই তোমার গতি হবে। সংস্কারই তোমার maker (স্রষ্টা) কিনা designer (গঠনকর্তা)। দেহ বলো, মন বলো, বুদ্ধি বলো সব সংস্কারই তৈরী করে। আসলে মনই সব। মনেতে স্বর্গ আবার মনেতেই নরক। স্বর্গ নরক বোলে সত্যকারের কিছু নাই।[৬১] বন্ধন, মুক্তি, মায়া, অবিদ্যা এসবও মনেতে।[৬২] মন যদি একবার বোঝে যে তুমি মুক্ত তাহলেই ব্যাস—মুক্ত হোয়ে গ্যালে। তারপর নিজেকে যে অনবরত 'জীব জীব' বোলে মনে করছ—এও তাই। একবার যদি মনকে বুঝিয়ে বলো তুমি জীব নও—শিব, দেখবে শিব হোয়ে যাবে।[৬৩] তবে শিব বা ব্রহ্ম তো তুমি আছই—হবে আর কি। যা কোনদিন থাকে না তাই আসলে সৃষ্টি হয়। মুক্তি বা মোক্ষের স্বরূপতা তুমি নিজেই। You are already that (তুমিই ব্রহ্ম)। ভুল ক'রে মনে করছ তুমি বদ্ধ, কাজেই মায়াবদ্ধ হোয়ে আছ, আবার ভাব তুমি মুক্ত, অমনি মুক্ত হোয়ে যাবে। মুক্ত হবে নয়—হোয়েই আছে।

আগে মনকে তাই তৈরী করতে হয়। যোগ-যাগ, জপ-তপ, সাধন-ভজন এ'সব মনকে তৈরী করার জন্য। ভূত আছে সরষের ভিতর আর তুমি সেই সরষে দিয়েই ভূত ছাড়াতে যাচ্ছ, সুতরাং ভূত যাবে কেন বলো! আগে সরষে থেকে ভূতকে সরাও, তবে তো সরষেতে মন্ত্র পড়ে ভূতে যাকে পেয়েছে তার গায়ে দিলে ভূত পালাবে। মন থেকে তাই মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ, বাসনা-কামনা, লোভ-মোহ আগে দূর করতে হয়, তারপর যেখানেই থাক—সংসারে হোক বা জঙ্গলেই হোক ; পরলোকেই হোক বা এ'লোকেই হোক সেখানে আত্মস্বরূপে আনন্দে বিভোর থাকবে।

মনকে যারা সংযত করতে পারে তাদের মৃত্যুর পর বিশেষ কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় তাদের যারা বিষয়াসক্ত, যাদের মন টাকাকড়ি ও ঐহিক ভোগসুখ ছাড়া আর কিছু জানে না। তাদের এটা চাই, ওটা চাই, সুখ চাই, সম্পদ চাই—এই চাই চাই রব। তাদের চাওয়া বা বাসনার আর নিবৃত্তি হয় না। চাওয়া ও আশাই জানবে যত দুঃখ ও অনর্থের মূল : "আশাহি পরমং দুঃখ, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"। তুমি আশা করলে একটা ব্যবসাতে দশ হাজার টাকা পাবে কিন্তু পেলে না, অমনি দুঃখ হোল, আর যদি পেলে তো সুখ বা আনন্দ হোল, সুতরাং পেলে আনন্দ আর না পেলেই কষ্ট। তাহলেই দুঃখ ও সুখ টাকা বা জিনিসের মধ্যে থাকে না—থাকে পাওয়া বা না-পাওয়ার মধ্যে অর্থাৎ তোমার মনে। দশ হাজার টাকা যখন পেলে তখন তোমার মন বল্লে 'আমি খুশি হলুম' আর না পেলেই তোমার মন অস্থির হোল। সুতরাং মনেতে দুঃখ আর মনেতেই সুখ। তাই মনকে যদি একবার বোঝাতে পার যে কিছু পেলেও তুমি খুশি হবে না এবং না পেলেও দুঃখ করবে না তাহলেই সুখ বা দুঃখ আর তোমায় বিচলিত করতে পাবে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলেছেন,

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।[৬৪]
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥

"কৌন্তেয়, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম, কেননা তুমি ক্ষত্রিয়। সুখে অনুরাগ আর দুঃখে বিরাগ বা দ্বেষ না কোরে যদি তুমি লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় এসবকে সমান জ্ঞান করো তাহলেই তোমার মন কিছুতে আর বিচলিত হবে না। কিন্তু যদি তুমি কিছু পাবার আশা করো বা না-পাবার আশায় ভয় করো তাহলে মনকে আর কিছুতে আয়ত্তে আনতে পারবে না, বরং চঞ্চলই হবে। শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরো বল্লেন বহু কামনাযুক্ত লোকদের মন অস্থির ও চঞ্চল,[৬৬] সুতরাং কামনা বাসনা যাদের কম তাদের মন স্থির এবং তারাই জগতে শান্তি লাভ করে।

স্বর্গ ও নরক এ'সবও তোমার মনে। সবই mental plane-এর (মনোলোকের) অন্তর্গত। মনেই স্বর্গ-নরক ও সুখ-দুঃখ সব আছে। তাই সবই স্বপ্নবিশেষ।[৫৬] আশা বা বাসনাই এর কারণ। যে'সব লোক এ'জগতে মহাবিষয়াসক্ত অর্থাৎ টাকাকড়ি, নিজের ছেলেমেয়ে ও সুখ-সম্পদ ছাড়া আর কিছু বোঝে না বা জানে না, মৃত্যুর পর তাদের ভারি কষ্ট হয়। তাদের সংসারের ওপর আসক্তি আর কাটতে চায় না অথচ শিহরে মৃত্যু। কী ভীষণ অবস্থা! তারপর যখন তারা বুঝতে পারে যে কিছুতেই আর বাঁচবে না তখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে থাকে, প্রাণবায়ু বেরুতেও তাদের কষ্ট হয়। একদিকে বেঁচে থাকার তীব্র বাসনা আর অন্যদিকে মৃত্যুর প্রবল তাড়না এই দু'য়ের ভিতর পড়ে তখন তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। বাঁচাব জন্য প্রাণপণে struggle (চেষ্টা) করতে থাকে, কিন্তু পারে না। এটাই আসলে জীবন-মরণের' যুদ্ধ। এ'অবস্থায় মুমূর্ষু মানুষের অত্যন্ত কষ্ট হয়। একেই বলে নরকযন্ত্রণা।

বাসনা-কামনাই নরক। মৃত্যুর সময় বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞান বা অচেতন হোয়ে যায়। মরার পরও জ্ঞান আসতে কারু কারু বেশী সময় লাগে। জ্ঞানী ও ত্যাগীদের কথা স্বতন্ত্র। অনেক প্রেতাত্মা মৃত্যুর দু' তিন দিন পরে বুঝতে পারে তাদের শরীর গ্যাছে—বেঁচে নেই। তখন তারা নতুন একটা অজানা রাজ্যে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে সবই অচেনা—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ভাই বন্ধু কেউই নাই। নিজেকে তারা তখন অসহায় মনে করে। আত্মীয়স্বজনের মায়াও তাদের অস্থির করে। কিন্তু উপায় কি! যেতেই হবে, পৃথিবীর মায়া ছাড়তেই হবে। মৃত্যুর কাছে তখন surrender (আত্মসমর্পণ) করা ছাড়া উপায় নাই। বিষয়াসক্ত মানুষের এটাই তো নরকযন্ত্রণাভোগ। বাসনা, দুঃখ, কষ্ট বা মায়া থাকে না বোলে জ্ঞানীরা যন্ত্রণা ভোগ করে না।

প্রেতলোকে যারা দুঃখ-কষ্ট পায় তাদের এই লোক (পৃথিবীলোক) থেকে সাহায্য করা যায়। সচ্চিন্তাই হোল তাদের সাহায্য করার একমাত্র উপায়। মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা সূক্ষ্মজগতে বাস করে বোলে সূক্ষ্মচিন্তাই কেবল তাদের সাহায্য করতে পারে—স্থূল দিয়ে কিছু হয় না। মনে মনে তাই মৃত আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করলে তার vibration-গুলো (কম্পনগুলো) thought-form-এ তাদের কাছে পৌঁছোয়। পরলোক অর্থে psychic বা mental plane (প্রেতলোক বা মানসিক স্তর)। সুতরাং mental vibration-ই (মনের কম্পনই) মৃতাত্মাদের কাছে কেবল পৌঁছোয়। চিন্তার নামই mental vibrations। প্রার্থনা করলে পরলোকে তাই বিদেহীরা মনে শান্তি পায়।

আমি তখন আমেরিকায়। একদিন হঠাৎ দেখি মানুষের একটা মুখ আমার সামনে বাতাসের ওপর ভাসছে। মুখটা মলিন, যেন দুঃখ-যন্ত্রনায় কত কাতর। সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে

রইলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তুমি কে? তোমার কি হয়েছে?" সে বল্লে: "I have committed suicide. Help me, help me" (আমি আত্মহত্যা করেছি, আমায় সাহায্য করুন)! আমি তাকে আশীর্বাদ কোরে বল্লাম: "বেশ, তুমি যদি মনে করো যে আমার প্রার্থনায় তোমার মঙ্গল হবে, আমি আশীর্বাদ করছি তোমার শান্তি হোক"। বাস্তবিক পরমুহূর্তেই দেখি মুখটা তার প্রদীপ্ত ও জ্যোতির্ময় হোয়ে উঠলো। সে হাসিমুখে আমায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাতাসে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হোয়ে গেল! এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের চোখে ভাখ্যা—শোনা নয়। বিদেহী আত্মা বা প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে কল্যাণচিন্তা করলে তারা শান্তি পায়।

ঠিক এ'রকমেরই ঘটেছিল আর একবার আমেরিকায়। সে প্রেতাত্মাটা ছিল একজন sailor (নাবিক)। জলে ডুবে মারা যায়। একদিন দেখি অন্ধকারের ভিতর কে যেন একজন হাৎড়ে হাৎড়ে ব্যাড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কে?" প্রেতাত্মা উত্তর করলে: "I am a sailor. I was drowned in the sea. Now I remember nothing. Help me!" (আমি একজন নাবিক, সমুদ্রে ডুবে মারা গেছি। এখন আর কিছুই আমার মনে নেই। আমায় সাহায্য করুন)। মরার আগে লোকটা নিশ্চয়ই অজ্ঞান হোয়ে গিছলো, দেখলাম তাই কিছুই তার মনে নাই। আমি তাকে আশীর্বাদ করলাম, দেখলাম সে জ্যোতির্ময় দেহে হাওয়ায় মিশিয়ে গেল।[৬৭] এ'রকম হয়। প্রেতাত্মাদের দেখা যায়।[৬৮] আমি আমেরিকায় থাকাকালে এ'রকম শ্রীমাকে, স্বামিজীকে (স্বামী বিবেকানন্দ), বলরাম বাবুকে, যোগেন স্বামীকে (স্বামী যোগানন্দ),[৬৯] লাটু মহারাজকে (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), সিষ্টার নিবেদিতাকে ও গিরিশবাবুকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলেম।

লাটু মহারাজের ঘটনাও তাই। যখন তার দেহ যায় বোধহয় তখনই হবে। হঠাৎ শুনতে পেলাম বেশ ভারি গলায় কে আমার নাম ধরে ডাকলো—"কালী! কালী"! গলার স্বর যেন নাভি থেকে উঠছিল। চারদিকে তাকিয়ে কাকেও দেখতে পেলেম না। তারপর শুনতে পেলাম—"আমি লাটু। তোমায় দেখতে এসেছি"। কথাগুলিতে গভীর ভালবাসা ও স্নেহ মাখানো ছিল। সত্যই লাটু মহারাজ আমায় অত্যন্ত ভালবাসতেন। আমি তখন বুঝলাম নিশ্চয়ই লাটু ভাইয়ের শরীর গ্যাছে। তার পরদিন কেব্‌লগ্রামও (cablegram) পেলাম যে লাটু মহারাজের শরীর গ্যাছে।

গিরিশবাবুকে দেখেছিলাম আরো অদ্ভুত রকমভাবে। গিরিশবাবু স্থূলশরীর ধরে আমায় দেখা দিয়েছিলেন। গিরিশবাবু আমার সামনে এসে চারদিকে মুখ ফিরিয়ে 'থু থু' শব্দ করতে লাগলেন, কোন কথা বললেন না। তারপর দেখি কিছুক্ষণ পরেই বাতাসে মিলিয়ে গ্যালেন। বুঝলাম গিরিশবাবুর দেহ নাই। মৃত্যুর পর জগতটা তার কাছে তুচ্ছ—এটা বোঝাবার জন্যই মনে হয় তিনি 'থু থু' শব্দ করেছিলেন। তার পরদিন কেবেলগ্রামও পেলাম যে গিরিশবাবুর শরীর নাই!

বলরামবাবুকেও এ'রকম একদিন materilaized form-এ (স্থূলশরীরে) দেখেছিলাম। তাঁর মাথায় পাগড়ী বাঁধা আর পাগড়ীর চারদিকে ইলেকট্রিক্ বাল্ব্ (bulb) যেন জ্বলছে। বেঁচে থাকার কালে বলরামবাবু সর্বদাই মাথায় পাগড়ী পরতেন দেখেছি। তাঁর জ্যোতির্ময় শরীর। লম্বা দাড়িও ঠিক সেই রকমের। আমার দিকে স্নেহপূর্ণভাবে তিনি তাকিয়ে থাকলেন—কোন কথা বললেন না। আমি দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন। পরে শুনেছিলাম মৃত্যুর সময় তিনি নাকি কোন কথা বলতে পারেন নি, অজ্ঞান হোয়ে গিছলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর ডানহাতটি আমার মাথার

ওপর রেখে তিনি নিঃশব্দে আমায় আশীর্বাদ করলেন। তারপর তাঁর শরীরটা সাদা কুয়াশার মতো ধীরে ধীরে বাতাসে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

পরলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধে যারা জানতে চায় এসব থেকে তাদের কিছু কৌতুহলের নিবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু মনে রাখা উচিত spirit-world-ও (প্রেতলোকও) দেশ, কাল ও নিমিত্তের বাইরে নয়। তবে স্থূলজগৎ না হোয়ে সূক্ষ্মজগৎ এই মাত্র ভেদ। এতে ভগবান বা মুক্তি লাভ কোনটাই হয় না। আত্মজ্ঞান বা মুক্তি যারা চায় তাদের পক্ষে এ'সবের অনুশীলনে কোন উপকার হয় না, বরং অপকার হোতে পারে, কেননা দেশ-কালের মধ্যে তাদের মন আবদ্ধ হোয়ে থাকে। তাই যথার্থ শান্তি বা মুক্তি যারা চায় তাদের পক্ষে এসব নিয়ে মাতামাতি করা ভাল নয়।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

১লা মার্চ, ১৯২৪

(শুক্রবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা)

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥১০

'হে ভারত, সৃষ্টির আগে প্রাণী অব্যক্ত আকারে ছিল, মৃত্যুর পর আবার অব্যক্তই থাকে, সুতরাং দুঃখের বিষয় কি আছে'। সৃষ্টির এই বিচিত্র বিকাশই শক্তির খেলা। শক্তি অব্যক্ত কিনা latent (সূক্ষ্ম)। এর নাম energy। Energy manifested (মহাশক্তি বা কারণশক্তি ব্যক্ত) হোলে তাকে force (কার্যশক্তি) বলে। Energy আর force দুটোই শক্তি, তবে একটা অব্যক্ত আর অপরটা ব্যক্ত, যেমন বাষ্প ও জল—একটা কারণ ও অপরটা কার্য।

Energy (কারণশক্তি) আর কোথায় নাই বলো, তোমাতে আমাতে জীবে জগতে সর্বত্র আছে। Energy-ই (কারণশক্তিই) আসলে cosmic energy বা প্রকৃতি। Energy (কারণশক্তি) অব্যক্ত বোলে তার কোন আকার নাই, কিন্তু ব্যক্ত হলেই তার আকার দেখা যায়। ব্যক্ত কিনা force। Force-ই সৃষ্টি। সৃষ্টি কিনা কার্য, বিকাশ বা বৈচিত্র্য। কোন একটা জিনিসের নাশ মানেই সেটা ব্যক্ত ছিল, পরে অব্যক্তে আবার ফিরে গ্যালো। 'নাশঃ কারণলয়ঃ', —নাশ মানেই কারণে ফিরে যাওয়া, নষ্ট হওয়া নয়। অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়ার নামই 'নাশ'। আদিতে সত্তা ছিল, মধ্যে ব্যক্ত কিনা manifested যখন তখনও তার সত্তা আছে, আবার অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে গেলেও তার সত্তা থাকে। সত্তা থেকেই সত্তার বিকাশ হয়, কেননা অসৎ থেকে কখনো সতের বিকাশ বা সৃষ্টি হয় না।

Something cannot come out of nothing (অস্তি বা যা আছে তা কখনো নাস্তি বা পরে 'না' হোতে পারে না)। সৎ থেকেই সৎ-এর উৎপত্তি। গীতায় তাই বলা হয়েছে: "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।[৭১]

একদিক থেকে আত্মা অব্যক্ত আর শরীর ব্যক্ত। একটা কার্য আর অপরটা কারণ। তবে কার্য আর কারণ আসলে একটাই—কেবল যেটা আগে হয় সেটাকে আমরা বলি 'কারণ' আর তার পরেরটাকে বলি 'কার্য'। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ একটার পর একটা উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে: প্রথম যে তরঙ্গটা এলো তাকে বলি 'কারণ' আর পরেরটাকে বলি 'কার্য'। এ'রকম একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে তরঙ্গ সৃষ্টি হোতে থাকে, তরঙ্গ হিসাবে সবই তরঙ্গ, কিন্তু আগে ও পরে গণনা কোরে আমরা একটাকে বলি কার্য আর অপরটাকে বলি কারণ—cause and effect। কিন্তু এই কার্য-কারণনীতি fixed (নির্দিষ্ট) নয়, কেননা যাকে আমরা এখন কারণ বলছি আবার তাকেই পরে বলবো কার্য। সুতরাং আগে ও পরে এভাবে সময়ের তারতম্য বা পার্থক্য দিয়ে আমরা একটাকে বলি কার্য আর অপরটাকে বলি কারণ। এটাই law of cause and sequence (কার্য-কারণের নিয়মশৃঙ্খল)।[৭২] সাংখ্য ও বেদান্তের মতে[৭৩] কার্য ও কারণ অভেদ। কিন্তু ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্র কার্য ও কারণকে ভিন্ন বলেছে। মোটকথা কার্য-কারণসূত্রেই সমগ্র বিশ্ব বাঁধা, অথবা বলা যায় কার্য ও কারণধারার সমষ্টিই বিশ্বপ্রপঞ্চ বা সংসার।

কারণ অব্যক্ত আর কার্য ব্যক্ত। তবে অব্যক্তই সত্য বা নিত্য আর কার্য মিথ্যা। এখন যদি বলো কার্য যখন কারণ বা অব্যক্তেরই ব্যক্ত অবস্থা এবং অব্যক্তকে বলা হয়েছে সত্য তখন ব্যক্তই বা মিথ্যা হবে কেন, কারণ সত্য থেকে সত্যেরই বিকাশ হয়। তার উত্তরে বলি

অদ্বৈতবেদান্তমতে এক শুদ্ধব্রহ্ম ছাড়া আর সমস্তই মিথ্যা কিনা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন বা বিকার যে জিনিসের হয় তাই অনিত্য বা মিথ্যা। কিন্তু মায়াবিহীন শুদ্ধব্রহ্ম চিরদিন অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালেই এক, অখণ্ড ও অবিকৃত। তাই তার অবস্থান্তর কল্পনা করাও মিথ্যা বা ভ্রম। আবার যদি বলো অদ্বৈতবেদান্তে তো বলা হয়েছে ব্রহ্ম মায়ার বা মায়িক সৃষ্টির অধিষ্ঠান বা আধার, সুতরাং অধিষ্ঠান বা আধার যখন চিরসত্য তখন অধিষ্ঠেয় বা আধেয় সৃষ্টি তথা ব্যক্ত মিথ্যা হবে কেন। তার উত্তরে বলি অদ্বৈতবেদান্তে শুদ্ধব্রহ্ম কোনদিনই মায়া বা সৃষ্টির অধিষ্ঠান কল্পিতও নন, অধিষ্ঠানরূপে কল্পিত হন মায়াধীশ ও মায়াসবলিত ব্রহ্ম তথা অব্যক্ত ও হিরণ্যগর্ভ। অব্যক্ত-ঈশ্বরে মায়া বা সৃষ্টির বীজ উন্মুখী থাকে—কিন্তু ব্যক্ত বা কার্যাকারে নয়, ব্যক্ত বা কার্যাকারে সৃষ্টি প্রকাশ পায় হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মে বা হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরে। তবে এখানে অব্যক্তই সত্য বা নিত্য বলতে অব্যক্তরূপে শুদ্ধব্রহ্ম উপচারিত; অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্মকেই এখানে অব্যক্ত বোলে কল্পনা বা উপচার করা হয়েছে, নচেৎ অব্যক্ত বা অব্যক্ত-ঈশ্বর 'মায়াধীশ' হোলেও মায়াযুক্ত সুতরাং মিথ্যা বা অনিত্য। এভাবে আত্মা অব্যক্ত সুতরাং নিত্য আর শরীর ব্যক্ত সুতরাং অনিত্য। ব্যক্ত মানেই কার্য বা বিকারী। বিকার মানে একটা থেকে অন্য একটা রূপে বা আকারে পরিবর্তন। যার পরিবর্তন আছে তাই অনিত্য। জগৎ বিকারী, কেননা ক্রমাগতই তার পরিবর্তন হচ্ছে। বিকারী বস্তু-মাত্রেরই জন্ম আছে সুতরাং মৃত্যু আছে। বিশ্বসংসারের পরিবর্তনের আর বিরাম নাই। পরিবর্তন মানেই বিকৃতি সুতরাং ধ্বংসশীল ও অনিত্য।[৭৪]

এই পরিবর্তনই আবার force বা শক্তি। Force (শক্তি) সর্বদাই গতিশীল কিনা active (ক্রিয়াশীল)। Force (শক্তি) আছে বোলেই পার্থিব সকল জিনিসের সত্তা আমরা অনুভব করি। বাতাস বইছে,

আমরা চলছি, ফিরছি, কথা কইছি—এ'সবই force বা শক্তির কার্য। শক্তি আছে বোলেই জগতে সকল কার্য ঘটে। সকল পার্থিব ঘটনার পিছনে তাই গতি বা শক্তি থাকে। জগৎ চলমান মানে জগৎই শক্তির খেলা। Energy অব্যক্ত, তাই force (শক্তির আকার) না থাকলে energy-র সত্তা আমরা বুঝতে পারতাম না। তবে স্বরূপে force-ও যা energy-ও তাই। একটা ব্যক্ত বা কার্য আর একটা অব্যক্ত বা কারণ।

আমাদের মধ্যেও অনন্ত শক্তি আছে, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না, কেবল বুঝি বা ধরি আমাদের সামনে যেটুকুমাত্র ব্যক্ত হয়। কারণ বা বীজের আকারে অনন্তশক্তি আমাদের সকলের ভিতরেই আছে। আমাদের মধ্যে শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত দু'ভাবে থাকে। শক্তি ব্যক্ত হওয়া মানেই কার্যের আকারে প্রকাশ পাওয়া। রেলওয়ে-ইঞ্জিন তীরের মতো বেগে ছুটে যায় শক্তিরই বলে। কিন্তু ইঞ্জিনের ঐ শক্তি থাকে কোথা? Steam-এ (বাষ্পে)। কয়লায় heat (তাপ বা আগুন) potential form-এ (বীজ বা অব্যক্ত আকারে) থাকে। কয়লায় অগ্নির সংযোগ হোলে heat (তাপ) জন্মায় ও প্রকাশ পায়। প্রকাশ অর্থে manifested (ব্যক্ত) হওয়া। Heat (তাপ) আবার জলকে steam-এ (বাষ্পে) পরিণত করে আর তাই দিয়ে ইঞ্জিন চলে। Steam-ই (বাষ্পই) সেখানে energy (শক্তি)। ইঞ্জিন জড় আর সেই জড়ের পিছনে energy (শক্তি বা চৈতন্য) থাকে বোলেই ইঞ্জিন চেতনের মতো কাজ করে।

শক্তিই সৃষ্টি বা জগৎ। জগৎ সৃষ্টির আগে বীজাকারে অব্যক্ত কিনা প্রকৃতিতে সুপ্ত ছিল। অব্যক্ত প্রকৃতিই আমাদের subconscious mind (মনের অচেতনস্তর)। সচরাচর যাকে আমরা mind (মন) বলি তা মনেরই conscious (চেতন) অবস্থা। ওটাই subconscious mind-এর (অবচেতন মনের) ব্যক্ত অবস্থা। Subconscious mind-এ (অবচেতন মনে) আমাদের জন্মজন্মান্তরের

অসংখ্য সংস্কার পুঞ্জীভূত থাকে। Conscious mind-এ (চেতন মনে) তাদের কতটুকুই বা ওঠে বলো; যতটুকু আমাদের দরকার ততটুকু আর ততটুকুই আমাদের conscious mind (চেতন মন), বাকি সবটাই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে।[৭৫] প্রকৃতিকে তাই বলা হয়েছে অনন্ত। Subconscious mind-ই cosmic mind কিনা অবচেতন বা বিরাট মন। সেখানে সব-কিছুই বীজাকারে সুপ্ত থাকে। অব্যক্ত আর ব্যক্ত। যেমন একটা বিশাল বৃক্ষ ডালপালা ফুল ফল প্রভৃতি নিয়ে প্রকাশ পাবার আগে ছোট একটি বীজের মধ্যে নিহিত ছিল তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিকাশের আগে প্রকৃতিতে লীন ছিল। বীজ বৃক্ষের অব্যক্ত অবস্থা, পরে উত্তাপ জল বাতাস প্রভৃতি পেয়ে বীজ অঙ্কুরিত ও বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। এটাই বৃক্ষের ব্যক্ত অবস্থা। আমাদের ভিতর যে অনন্ত শক্তি আছে তাকে ব্যক্ত কিনা জাগ্রত করতে হয়। এই ব্যক্ত বা জাগ্রত করার নামই 'সাধনা'। Practice (অভ্যাস) না করলে কোন জিনিস কি আর ব্যক্ত হতে চায়! Practice বা অভ্যাসের নামই 'সাধনা'। সাধনার ভিতর দিয়ে সিদ্ধি কিনা আত্মোপলব্ধি করতে হয়। তাই সর্বদা ভাববে,

(আমি) সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই
পিতার ধনে মোর পূর্ণ অধিকারে।

আমরা সকলেই রাজার ছেলে, কিন্তু ভ্রমে নিজেদের দরিদ্র বোলে মনে করি। এই ভ্রমই অজ্ঞান। বিচারবুদ্ধি দিয়ে অজ্ঞান দূর করতে হয়। অজ্ঞান গেলেই জ্ঞান কিনা শান্তি, যেমন মেঘের আবরণ সরে গেলে সূর্যের প্রকাশ। তখন নিরবচ্ছিন্ন শাশ্বত আনন্দ।

অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়া মানেই শক্তির বিকাশ। কারণ থেকে কার্যে পরিণত হওয়াই শক্তির প্রকাশ। এই শক্তিকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছে force (কার্যশক্তি)। এই force-ই তন্ত্রে কালী, আদ্যাশক্তি বা মহামায়া, বেদান্তে মায়া ও সাংখ্যে প্রকৃতি। শিবের

বুকে শক্তি সৃষ্টিরই প্রতিচ্ছবি। শিব শব কিনা নির্গুণ আর কালী তার উপর নৃত্য করছেন কিনা কালী ত্রিগুণাত্মিকা নিত্যচঞ্চলা। তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও পালন করছেন। একটা কারণ আর অপরটা কার্য। কপিলের মতে শক্তিই প্রকৃতি ও সত্ত্বরজস্তমোময়ী। তিন গুণের সাম্যবস্থার নাম 'প্রকৃতি'। বিশ্বের অতিক্ষুদ্র থেকে অতিমহৎ পর্যন্ত সকল বস্তুই বিরাট প্রকৃতির অন্তর্গত। সাংখ্যের পুরুষ কিন্তু প্রকৃতির সম্পূর্ণ বাইরে। পুরুষ জড় নন বা কোন রকম মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট নন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ। তিনি জন্মমৃত্যুরহিত ও শাশ্বত। এই পুরুষই অনেকটা বেদান্তের আত্মা বা ব্রহ্ম।[৮৬] পুরুষের যেমন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বেদান্তের আত্মারও তাই।

সাংখ্যমতে পুরুষে সৃষ্টি বা বিকৃতি নেই, সৃষ্টির বীজ থাকে প্রকৃতিতে। প্রকৃতি জড়া ও অব্যক্ত। পুরুষের নিকটে এলে তবে প্রকৃতিতে ক্রিয়া হয়। প্রকৃতিতে যে সৃষ্টির বীজ থাকে তা চেতন পুরুষের সহযোগে জাগ্রত কিনা ব্যক্ত হয়। সুতরাং সাংখ্যের মতে প্রকৃতির বিকৃতিই সৃষ্টি—যেমন জলের বিকৃতি তরঙ্গ। চাঞ্চল্য আছে বোলেই জল তরঙ্গ। চাঞ্চল্য জলের একটা গুণ। এ'রকম গুণযুক্ত হোলে জল হয় তরঙ্গ আর নির্গুণ হোলে যে জল সে জলই থাকে। বেদান্তে গুণকে মায়া বলা হয়েছে। গুণের স্বভাবই একটা বস্তু থেকে অপরটাকে আলাদা বা পৃথক করা।[৭৭] মায়ার স্বভাবও তাই। ব্রহ্মে মায়া কল্পিত বোলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত শব্দ-দুটি আমরা ব্যবহার করি। নাম-রূপ নিয়েই ব্যক্ত, নাম-রূপ ছেড়ে দিলে অব্যক্তই থাকে। নাম-রূপই মায়া। কিন্তু যেখানে মায়া নেই সেখানে ব্যক্ত কি আর অব্যক্তই বা কি। কার্যকে স্বীকার করি বোলেই কারণ, নইলে কারণ বা মহাকারণ এ'সব কথার সার্থকতাই বা কি। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সৃষ্টি, মায়া, ব্যক্ত, অব্যক্ত এসব আমরাই

কল্পনা করি এবং কল্পনা করি বোলে এরা আরোপিত কিনা মিথ্যা। বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের পার্থক্যই এখানে। বেদান্তের মতে ব্রহ্ম মায়ার জন্য (যেন) বহু রূপ ধারণ করেন, কিন্তু সাংখ্যের পুরুষে বিকৃতি কল্পনা হয় না, বিকৃতি হয় প্রকৃতির।[৭৮] এই বিকৃতি বা সৃষ্টিও একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু ব্রহ্মে মায়া কল্পিত, তাই ব্রহ্মে বিকৃতি বা সৃষ্টি নিছক কল্পিত ও মিথ্যা। আসলে ব্রহ্মে কোনদিনই সৃষ্টি অর্থাৎ মায়া নেই। সৃষ্টি আমরা কল্পনা করি বোলেই সৃষ্টিকে দেখি ও সত্য বোলে গ্রহণ করি। সৃষ্টির ধারণা বা কল্পনা তাই মিথ্যা।[৭৯]

উপনিষদে ঈশ্বরকে 'কবি' বলা হয়েছে।[৮০] সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাব্য বা কবিতা। চিত্রকর যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁর চিত্তপটে কল্পিত মূর্তিকেই তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেন। সে'রকম সৃষ্টির আগে ঈশ্বর চিন্তা করেছিলেন: 'একোহম্ বহু স্যাম্'। সৃষ্টি বা জগৎ তাই তাঁর mental picture বা মনের কল্পিত ছবিরই পরিণতি। He designed the world (তিনি জগৎ তৈরী করলেন) মানে he projected his own image outside from within himself (তিনি আপনার ভিতর থেকে নিজের মানস প্রতিকৃতি বাইরে সৃষ্টির আকারে অভিব্যক্ত করলেন)। এ' থেকে বোঝা যায় জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়, কেননা ব্রহ্ম নিজেই বিশ্বচরাচর হয়েছেন। তিনি 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব', —তিনি বিচিত্র রূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন; 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ',—বিশ্ব সৃষ্টি কোরে তিনি বিশ্বভূত হলেন। ঈশ-উপনিষদে এজন্য বলা হয়েছে: "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্",—বিশ্বের সমগ্রই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত। এখানে বিশ্বচরাচর হওয়া মানে জগৎ ব্রহ্মের উপর কল্পিত এবং মায়াই সে কল্পনার কারণ।

মনই সৃষ্টিকর্তা। একটা ছবি আঁকার আগে সমস্ত ছবিটা চিত্রকরের মনে আইডিয়া বা কল্পনার আকারে সূক্ষ্মভাবে থাকে, তারপর বাইরে সেই কল্পনার projection-টাই (বিক্ষেপই) হোল ideal

(ভাবময় বা আদর্শ) ছবি। Idea (ভাব বা চিন্তা) আগে তারপর real বা material (বাস্তব) বস্তু। প্লেটা তাই বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলেছেন *Ideas*-কে (ভাবসমষ্টিকে)। সৃষ্টির আগে সমস্তই ঈশ্বররের মনে *Ideas*-এর (চিন্তা বা ভাবের) আকারে থাকে, ঈশ্বর সেগুলো project (বিক্ষেপ) করেন মাত্র, অর্থাৎ ideal-টা (ভাবটা)। real বা material-এ পরিণত হয়। বাস্তব সৃষ্টির রহস্যই তাই। মন সৃষ্টি করে কিন্তু আমরা বলি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। আমাদের মন আর ঈশ্বরের মনের ভিতর পার্থক্য পরিমাণগত। আমাদের individual mind (ব্যষ্টি মন) আর ঈশ্বরের cosmic mind (সমষ্টি মন)। Cosmic mind is no other then the sum total of individual minds (বিরাট ঈশ্বরীর মন আমাদেরি ব্যষ্টি মনের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়)। আমরাও individul life-এ (ব্যক্তিগত জীবনে) প্রথমে কল্পনা করি মনে ও তারপর সেই কল্পনাকে বাইরের জগতে project (প্রক্ষেপ বা প্রকাশ) করি। Miniature form-এ (ছোট আকারে) তাই আমরাও এক একজন ঈশ্বর। আমরাও নূতন কত-কিছু সৃষ্টি করি: স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসার, টাকা-কড়ি, সমাজ-সংসার আমাদের তৈরী। আমরা পাবার আশা করি তাই পাই অথবা আমরা চাই. বলেই পাই। সেদিক থেকে আমরাও এক একজন সৃষ্টিকর্তা বৈকি। তবে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা আর আমরা সৃষ্টিকর্তা এ'দুটোর মধ্যে প্রভেদ হোল ঈশ্বর বৃক্ষ-লতা, গ্রহ-উপগ্রহ, জীব-জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু আমরা তা পারি না, আমরা ঘর-সংসার, জমীজমা পুত্র-কলত্র মাত্র সৃষ্টি করি।

Where there is demand, there is supply (যেখানে চাওয়া সেখানেই পাওয়া)। ভগবান মনরূপে সকলের অন্তরে বাস করেন। আবার মনকে তিনি জানেন বলে তাঁর নাম অন্তর্যামী। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার চতুর্বিংশতি তত্ত্ব দেহ প্রাণ সবই আসলে ঈশ্বর বা আত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন তিনিই (ঈশ্বরই) জীব-জগৎ সব হয়েছেন। এই ভাব অনুভব করা কঠিন। যার তার এই অনুভূতি হয় না। এক একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিজ্ঞানী যিনি তিনি অনুভব করেন যে ঈশ্বরই জীব-জগৎ সব হয়েছেন। একটি গাছের পাতাও ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নড়ে না—এ'জ্ঞান ঠিক তখনি হয় যখন ব্রহ্মানুভূতি হয়। অনুভূতির আগে পর্যন্ত অজ্ঞান ও অহঙ্কার থাকে। উপনিষদে আছে প্রাণশক্তি বা প্রাণই ব্রহ্ম।[৮১] প্রাণকে প্রজ্ঞাও বলা হয়েছে। প্রজ্ঞাই ঈশ্বর। প্রাণশক্তি অব্যক্ত আকারে থাকলে তাকে আমরা বলি ঈশ্বর আর ব্যক্ত হোলে বলি হিরণ্যগর্ভ। সৃষ্টি আছে বলেই ব্যক্ত আর অব্যক্ত। আসলে ব্রহ্ম ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার পারে, জীব ও ঈশ্বরের পারে। প্রাণশক্তি ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এদিক থেকে ব্রহ্ম অব্যক্ত আর প্রাণশক্তি, প্রকৃতি বা ঈশ্বর ব্যক্ত। ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ। সৃষ্টি ও স্রষ্টা relative (আপেক্ষিক) সুতরাং মিথ্যা।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥[৮২]

আত্মাকে কেউ আশ্চর্যরূপে দেখেন, কেউ তাঁকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, কেউ বা তাঁর কথা আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, আবার কেউ কেউ আত্মার সম্বন্ধে শুনেও ঠিকঠিকভাবে জানতে পারেন না।[৮৩] কোন কোন মহাত্মা আত্মাকে আশ্চর্যের মতো দ্যাখেন। তাঁরা দ্যাখেন আত্মা সাকার বটে আবার নিরাকারও বটে, immanent (বিশ্বগত) বটে আবার transcendent-ও (বিশ্বোত্তীর্ণও) বটে, সূক্ষ্ম থেকে অতি-সূক্ষ্ম আবার স্থূল থেকে স্থূলতম, দূরেও বটে আবার নিকটেও বটে, কাজেই আত্মা আশ্চর্যজনক। Contradiction (বিরোধ) ও uncontradiction (অবিরোধ) এ'দুটির সমন্বয়কারী যেন আত্মা,

সুতরাং আশ্চর্য হবারই কথা। ঈশোপনিষদে পরমাশ্চর্য আত্মাসম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ "অনেজদেকং মনসো জবীয়ো,"—আত্মা এক ও নিশ্চল আবার মনের চেয়েও তিনি বেশী বেগবান ও গতিশীল; "তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্দূরে তদ্বন্তিকে,"—আত্মা সচল বটে আবার নিশ্চলও বটে, অতি দূরে আবার অতি নিকটে; "তদন্তরস্য সর্ব তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ,"—তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আবার বাইরে, সুতরাং আশ্চর্যজনক। আবার বলা হয়েছে।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাৎ শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮৭

'আত্মা সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরশূন্য, শুদ্ধ নিষ্পাপ জ্যোতির্ময় সর্বদর্শী মনীষী সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্প্রকাশরূপে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তিনিই সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতির কর্তব্যগুলিকে আবার যথাযথরূপে ভাগ করেন'। আত্মা স্থূল-সূক্ষ্মশরীরশূন্য কারণরূপী অথচ সকলের ওপর কর্তৃত্ব ও সমস্ত প্রজাপতিদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই অকর্তা ও কর্তারূপ দুটি opposite (বিরুদ্ধ) উপাধি বা গুণ আত্মায় থাকার জন্য আমরা তাঁকে অলৌকিক ও আশ্চর্য জিনিস বোলে মনে করি। এক জিনিষ একই সময়ে সাকার আবার নিরাকার ক্যামন ক'রে হয় এও এক জিজ্ঞাসা। একটা টেবিলকে দেখছি যে তার রূপ আছে, আকৃতি ও ওজন সবই আছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তাকে রূপহীন নিরাকার ক্যামন ক'রে ভাবি! যাকে এইক্ষণে আমরা অণুর চাইতেও সূক্ষ্ম বোলে চিন্তা করছি তাকে পরক্ষণেই আবার হিমালয় পর্বতের চাইতেও বড় বোলে চিন্তা করা কি অসম্ভব নয়! সাধারণ লোক তাই আত্মাকে অদ্ভুত এক জিনিস বোলে সকলের কাছে বর্ণনা করে। কেউ আত্মার কথা আশ্চর্য হোয়ে শোনে, কেউ জগতের সমস্ত ভোগসুখের জিনিস ত্যাগ ক'রে আত্মতত্ত্ব যাঁরা আলোচনা করেন

তাঁদের আশ্চর্যের মতো দেখে, কেউ বা আবার আত্মার কথা শাস্ত্রে ও গুরুমুখে শুনেও ধারণা করতে পারে না—অনুসরণ করাতো দূরের কথা!

অবতারকল্প মহাপুরুষেরা দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য মাঝে মাঝে জগতে আসেন—"লোকসংগ্রহার্থম্"। দেশে যখন ধর্মবিপ্লব আসে তখন এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষদের ভিতর কেউ কেউ আধিকারিক পুরুষ এবং অবতারও আসেন। সাধারণ লোকে তাঁদের ঠিক বুঝতে পারে না, ভাবে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ। শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন কিন্তু তাঁকেই বা ক'জন ভগবানের অংশসম্ভূত অবতার বোলে জানতে পেরেছিল। চারজন ঋষি ছাড়া কেউই তাঁকে বুঝতে পারেনি। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এলেন তাঁকেই বা ক'জন ভগবান বোলে বুঝেছিল। একমাত্র গোপীরা, বিদুর, যুধিষ্ঠির ও আর জনকয়েক মাত্র তাঁকে অবতার বোলে ধরতে পেরেছিল। অর্জুনও চিনেছিল, কিন্তু গোড়ার দিকে নয়। অর্জুন প্রথমে সখা ও বন্ধু বোলে চিনেছিল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাকে বিশ্বরূপ দেখালেন তখনই সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারলো যে যিনি তার রথের সারথি তিনি সামান্য মানুষ নন—স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনের মোহ ও ভ্রম দূর করেছিলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সর্বত্রপ্রসারিত বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট বিরাট মূর্তি দেখে[৮৮] ভয়ে বিহ্বল হোয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রে বলেছিল:

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো, নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং, ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥[৮৭]

'হে উগ্ররূপ, আপনি কে আমায় বলুন। আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন। আমি আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি, আপনার কোন উদ্দেশ্যই আমি বুঝতে পারছি না। "সখেতি মত্বা

প্রসভং যদুক্তম্, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি, অজানতা মহিমানং তবেদম্",—আপনার মাহাত্ম্য না জেনে ভুলবশত বা ভালবেসে ও বন্ধুভাবে কখনও কৃষ্ণ, কখনও যাদব ইত্যাদি বোলে সম্বোধন করেছি অথবা হাস্য-পরিহাসছলে অসম্মানও করেছি ("যচ্চাবহাসার্থ-মসৎকৃতোঽসি"), তাই আপনি আমায় ক্ষমা করুন ("তৎক্ষাময়ে")। হে জগন্নাথ, আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন ("প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস")। অর্জুনের এই কথার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে নিজের বিরাটরূপ প্রকাশ করেছিলেন।

বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের বেলায়ও তাই। শ্রীচৈতন্যকে অদ্বৈতাচার্য মাত্র আভাসে ও কার্যকলাপে কিছুটা বুঝেছিলেন। এই সেদিন বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এলেন তাঁকেই বা ক'জন ঠিক ঠিক চিনেছে বলো। দাশরথি রায়ের গানে আছে,

ওরে কুশী লব করিস কি গৌরব
(আমি) ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে ?

অবতারপুরুষ ও জ্ঞানী মহাত্মাদের কজনই বা ঠিকঠিকভাবে চেনে। সাধারণ লোক তাঁদের অদ্ভুত বোলে মনে করে এবং তাঁদের কথা শোনেও আশ্চর্য হোয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অবতার-চেনার বেশ একটা গল্প বলেছেন। রাস্তার ধারে এক সাধু মহাপুরুষ সমাধিস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। শেষরাত্রে কতকগুলো চোর সে রাস্তা দিয়ে' যাচ্ছিল। তারা দেখতে পেলে একটা লোক অচৈতন্য হোয়ে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। তারা তখন ভাবলে যে ও ব্যাটা চোর, নিশ্চয়ই সমস্ত রাত্রি চুরি ক'রে ক্লান্ত হয়েছে, তাই রাস্তার ধারে পড়ে ঘুমুচ্ছে। চল্, আমরা সব সরে পড়ি। চোরগুলো পালালো। তারপর একটা মাতাল সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সাধুকে দেখে ভাবলে—এত দেখছি মাতাল। মাতাল বল্লেঃ 'বাবা, আমি তো আর তোমার মতো মদ খাইনি যে

রাস্তার ধারে পড়ে বেসামাল থাকব'। মাতাল চলে যাবার পরই একজন পরমজ্ঞানী সাধু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখে মহাপুরুষকে একজন সমাধিমগ্ন মহাত্মা বোলে চিনতে পারলেন ও তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন।

সাধু মহাপুরুষদের চিনতে গেলে তাই নিজেকেও সাধুভাবাপন্ন হোতে হয়। ভগবানের কথা ও মহিমা ভক্ত ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না, অপরে কেবল আশ্চর্য ও অলৌকিক বোলে মনে করে। মোটকথা ভগবানের কৃপা ও অনুগ্রহ পেতে গেলে তাঁর শরণাগত হোতে হয়। শরণাগতি কিনা self-resignation (আত্মনিবেদন বা বকল্‌মা)। Self অর্থাৎ *ego*—যাকে আমরা 'অহং' বা 'আমি' বলি। 'অমি অমুকের ছেলে,' 'আমি এম. এ, পাশ', 'আমি একজন বস্তবড় বিদ্বান লোক' এই যে 'আমি' ভাব বা আত্মাভিমান এর নামই *ego*। শ্রীশ্রীঠাকুর একে বলতেন 'কাঁচা আমি'। 'পাকা আমি' হোল 'দাস আমি', 'সেবক আমি' বা 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী' এই ভাব। 'পাকা আমি'-তে নিজের কতৃত্ববোধ ও অহংকার থাকে না। ছোট বা কাঁচা আমি থেকে অহংকার ও দেহাভিমান সৃষ্টি হয়। 'কাঁচা আমি' মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে—ভগবানে মতি তো পরের কথা। তাই ভগবানকে পেতে গেলে 'কাঁচা আমি' নষ্ট করতে হয়। 'আমি দেহ', 'আমার সংসার' এই ভাব বা বুদ্ধিই বন্ধনের কারণ। এতটুকু 'আমি'-র অভিমান অর্থাৎ আত্মাভিমান থাকতে ভগবান কাউকে কৃপা করেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেনঃ "মুক্ত হবে কবে, 'আমি' যাবে যবে"। 'আমি'-ই- যত অনিষ্টের মূল। এই পাজি 'আমি'-টাকে মারতে গেলে ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করা বৈ উপায় নাই। ভগবান তো কৃপার সাগর, কিন্তু তাঁর কৃপা ক'জন আর চায় বলো। চাইতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, তবেই তিনি দেন। না চাইলে তিনি দেবেন কেন? তিনি তো এগিয়ে আছেন, কিন্তু

তোমাকেও এগিয়ে যেতে হবে। হা পিত্যেস ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। তুমি এক পা এগিয়ে গেলে ভগবান তোমার দিকে একশো পা এগিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন: 'কৃপাবাতাস তো বইছে, তুই পাল তুলে দেনা'। পাল তোমাকেই তুলতে হবে, তার জন্য অধ্যবসায়, পুরুষকার ও আত্মনিবেদন চাই। নইলে চুপ ক'রে বসে থাকবে আর ভগবান ঘাড়ে ক'রে তোমায় স্বর্গে নিয়ে যাবেন এ'রকম হয় না। লোকদেখানো ভক্তি ও আড়ম্বরে ভগবান কখনো ভোলেন না। তিনি চান পুরুষকার, তোমার ভক্তি, তোমার simplicity (সরলতা) ও সত্যকারের sincerity (ঐকান্তিকতা)। মন ও মুখ এক করতে হয়, ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না। ভাবের ঘরে চুরি করলে তুমিই শেষে ফাঁকিতে পড়বে। তাই চাই full resignation of your individual will to the Will of the Lord (ভগবানের বিরাট ইচ্ছার ওপর তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বলিদান দিতে হবে)। Let yourself be the divine playground of the Almighty (তোমার নিজের দেহ, বুদ্ধি ও মনকে সর্বশক্তিমান ভগবানের দিব্যলীলাভূমিতে পরিণত করো)। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন: "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু"। এই তুঁহুঁর ভাবই self-resignation (আত্মনিবেদন)। ভক্তের পক্ষে এ'রকম শরণাগতির ভাব ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত গিরিশচন্দ্রকে তাই বকল্‌মা দিতে বল্লেন অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশবাবুর ভার নেবেন এটাই বোঝালেন। জ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র।

দেহাত্মবোধই 'অজ্ঞান'। দেহাত্মবোধকে শঙ্করাচার্য বলেছেন 'অধ্যাস'। অধ্যাস কিনা 'অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধি,'—যেটা যা নয় তাকে তাই বোলে ভাবা। শরীরের অসুখ হয়েছে মনে করলে তোমার আত্মার অসুখ করেছে। একটা হাত কেটে গেলে তো মনে করলে তোমার আত্মার হাত কেটে গ্যাছে। জড়শরীর বা 'আমি'-র সঙ্গে

ক্রমাগত আত্মাকে এক ক'রে ফ্যালার নাম 'ভ্রম'। এটাই অধ্যাস। শঙ্করাচার্য অধ্যাসকে নৈসর্গিক মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ অনর্থ বলেছেন। এই অনর্থ দূর করার উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মা ও দেহ—শরীরী ও শরীর এ' দুটোকে পৃথক ক'রে আত্মা বা শরীরীকেই একমাত্র নিত্য আর দেহ বা শরীরকে ধ্বংসশীল অনিত্য বোলে জ্ঞান করার নাম বিবেক। মোটকথা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের নাম বিবেক। বিবেক থেকে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য কিনা বিষয়বিতৃষ্ণা। বেদান্ত একথাই বলেছে।[২০] কঠোপনিষদে আত্মাকে অনাত্মা থেকে বিভক্ত করার কথা আছে। আত্মা অন্তর্যামী কিনা তিনি সকলের অন্তরে থেকে নিয়মন করেন। তিনি যন্ত্রী ও দেহ যন্ত্র। তিনি যন্ত্রীরূপে মন ও বুদ্ধির রূপ ধরে দেহযন্ত্রকে চালান। তবে আত্মা অন্তরে থাকলেও পঞ্চভূতের শরীর কিন্তু আত্মা নয়। শরীর অনাত্মাই। এই অনাত্মারূপ শরীর থেকে চিরশাশ্বত অন্তর্যামী আত্মাকে 'প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ', —ধৈর্যের সঙ্গে মুঞ্জাতৃণ থেকে ইষীকা (ঘাসের মধ্যের ডগাটি) বার করার মতো মুমুক্ষু ব্যক্তি পৃথক করেন।[২১] এরূপ পৃথক করার নাম বিবেক।

দেহাত্মভাবই selfishness (স্বার্থপরতা) এবং selfishness (স্বার্থপরতা) অজ্ঞান।[২২] Selfish (স্বার্থ) ভাবকে কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্রমাগত বিচার করা। 'আমি দেহ নই—শাশ্বত জন্মমৃত্যুহীন আত্মা, দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর ও জ্ঞানস্বরূপ'—এ'রকম আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে কেবল বিচার করতে হয়। এই বিচারের নাম 'বিবেক'। বিবেক এলেই বিষয়বিতৃষ্ণা আসে ও দেহের ওপর থেকে মায়া মমতা দূর হয় আর তখনই ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য এলেই হলো। তখন আত্মানুসন্ধান ছাড়া আর সবই আলুনি লাগে। আত্মা ছাড়া তখন অন্য কোন জিনিসে মন আর বসে না। এরই নাম আত্মচেতনা। এ'রকম

করে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। লাভ কিনা বিস্মৃত জিনিসের স্মরণ ও উপলব্ধি। আত্মনিষ্ঠ না হোলে আত্মোপলব্ধি হয় না।

আত্মার উপলব্ধিই আত্মজ্ঞান। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই কিন্তু সাক্ষীস্বরূপ আত্মা এই সত্যোপলব্ধির নাম আত্মজ্ঞান। গীতায় আছে সাধারণ মানুষ একে আশ্চর্য ব'লে মনে করে। আত্মা নিকট থেকেও নিকটতম—'তদ্বন্তিকে' ও অন্তর্যামী—'তদন্তরস্য সর্বস্য'। দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এ' সকল জিনিসকে আত্মাই পরিচালনা করেন অথচ তাঁর কোন কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। কিন্তু আমরা আত্মাকে অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ব'লে চিরদিন ভাবি আর মনে করি তিনি অনেক দূরে ঐ আকাশের এক নির্বাচিত স্থানে স্বর্গে থাকেন। আশ্চর্য ও অবাক হোয়ে আমরা আত্মার কথা শুনি, বলি বা মনে করি। কিন্তু ইচ্ছা ও তীব্র আকুলতা থাকলে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়, কারণ আত্মা আমাদের অত্যন্ত আপন হোতেও আপন। তিনি আশ্চর্যের জিনিস মোটেই নন, বরং তাঁকে না জানাই পরমাশ্চর্য!

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

১৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

(রবিবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা)

অর্জুন প্রশ্ন করলেন,

> অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
> অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

'হে কৃষ্ণ, মানুষ কেন ও কিসের দ্বারা পরিচালিত হোয়ে অনিচ্ছা-সত্বেও বলপূর্বক পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয় তাই আমায় বলো'। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন,

> কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

'হে অর্জুন, দুষ্পূরণীয় কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হোয়ে লোকে পাপকার্যে নিযুক্ত হয়। কাম ও ক্রোধ উভয়ই রজোগুণ থেকে সৃষ্ট। এরা মানুষের বৈরী অর্থাৎ শত্রু। এদের দ্বারা পরিচালিত হোয়ে মানুষ ভুলপথে যায় ও সংসারে অসৎকর্ম করে'। 'কাম' অর্থে কামনা। কাম প্রতিহত হোলে 'ক্রোধ' হয়। কাম বা কামনার উদর কোনদিন পূর্ণ হয় না। যতই ভোগ করবে ভোগের আর শেষ হয় না—কেবলই দেহি দেহি রব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন ছোট ছোট কামনাগুলোকে ভোগ ক'রে ত্যাগ করতে হয় আর বড়-বড়গুলোকে চাবুক মেরে সরিয়ে দিতে হয়। ছোট ছোট কামনা যেমন মিষ্টি খাব, কি তীর্থে যাব—এ'গুলো একবার ভোগ ক'রে তারপর বিচারের সঙ্গে দূর করতে হয়। কিন্তু জমি-জায়গা কিনে বড়লোক হবো, লক্ষপতি হবো এ'সব অকাঙ্ক্ষা নিয়ে আর পরীক্ষা করতে নেই, এগুলো নিয়ে একবার পরীক্ষা করতে

গেলে মাকড়সার জালের মতো আটেপীঠে জড়িয়ে পড়বে, নিজেকে উদ্ধার করাই তখন মুশকিল হবে। বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় করো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলেই হোল। এ'হোল অক্টোপাশের বাঁধন, একবার বাঁধা পড়লে আর রক্ষে নেই। বিবাহ করবে এ' ইচ্ছা হওয়া ভাল, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তার পরিণামসম্বন্ধেও ভাবা দরকার। ধর্মের সংসার আর ক'জন করতে পারে। স্ত্রী সহধর্মিণী, তাঁর সঙ্গে ধর্ম আচরণ ক'রে মুক্তি লাভ করবে এ' হাজারের মধ্যে একটা হয়। তাই বিচার করতে হয়। বিচার ক'রে যদি বোঝ যে জনকরাজার মতো এদিক ওদিক ছু'দিক রেখে দুধের বাটি খেতে পারবে তবে নেমে পড়ো—কুছ পরোয়া নেই, কিন্তু যদি বোঝ বিয়ে ক'রে নিজেকে সামলাতে পারবে না তখন বিচার ক'রে বিয়ে না করাই ভাল। কিন্তু তার মানে একথা বলছি না যে বিয়ে করলেই ভগবান লাভ হয় না। নাগ মশাইকে ছাখনা। বলরাম বাবুও তাদের মধ্যে একজন। ওরকম আদর্শ গৃহস্থ সত্যই মেলা ভার। তবে নাগমশাই বা বলরামবাবু আর ক'জন হোতে পারে! 'জনক রাজা মহাতেজা',—এ'রকম লক্ষের মধ্যে ছু'একজন হয়, আর বেশীর ভাগ লোক সংসারে হাবুডুবু খায়? বিয়ে করার আগে লোকে ভাবে সামলাতে পারবে, কিন্তু বিয়ে ক'রে সব বেসামাল হোয়ে যায়, তখন না পারে আদর্শ গৃহস্থ হোতে, না পারে ভগবান লাভ করতে। সংসারে কাজের ভিতর নিজেকে জড়িয়ে ফেলে লোকে মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অনেক সময় বলে: 'একটু সময় নেই যে ভগবানকে ডাকি'। এ'সব হোল মনকে আঁখি ঠারা বা ভাবের ঘরে চুরি করা। এ'সবে কিছু হবে না, তাই মন ও মুখ এক করতে হয়। রামপ্রসাদ বলেছেন: 'এ' ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবি'! ভগবান লাভ করা কি চারটিখানি কথা! সকালে আর সন্ধ্যায় পাঁচমিনিট কি দশ মিনিট

বসলে ও একটু জপ করলে, ব্যস হোয়ে গ্যালো। জেনো—ভগবান অতো বোকা নন। তিনি সারাদুনিয়ার বুদ্ধিমান লোকদের নাকে দড়ি দিয়ে চালাচ্ছেন, ক্ষুরধার তাঁর বুদ্ধি, সুতরাং তাঁর কাছে চালাকি চলবে না। ভগবান সকলের মন দেখেন,—ঐশ্বর্য দেখেন না। তারপর ঐশ্বর্য আর তাঁকে কি ছাখাবে বলো! মা লক্ষ্মী যাঁর দাসী তার কি আর কিছুর অভাব আছে! ভগবান তোমার মন চান, তাই মনটা তাকে দিলেই তিনি খুসী। মন দিলেই সব দেওয়া হোল! কামনা বাসনা সবই তো মনে। মন যদি একবার ভগবানকে অর্পণ করতে পারো তো যে বাসনাই মনে উঠুক না কেন ভাববে তা ভগবানের জন্য বা বিশ্বের কল্যাণের জন্য, তাহলেই বাসনা আর তোমায় বাঁধতে পারে না। তবে বিচার চাই। মনকে ভগবানের পায়ে বিকিয়ে দিতে গেলেও সর্বদা বিচার করা দরকার। মনকে জিজ্ঞাসা করবে 'মন, তুমি কি চাও? টাকা চাও, নাম-যশ চাও, সুন্দরী স্ত্রী চাও—না রাজ্য চাও? কি চাও?' মন যদি বলে আমি টাকা চাই তবে মনকে বোঝাবে এই ব'লে যে 'টাকা রোজগার ক'রে তুমি কি মৃত্যুকে জয় করতে পারবে? দেহের জরা-ব্যাধি কি তুমি দূর করতে পারবে? তুমি তো জড়। জড়বস্তুর সাধ্য কি যে জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং তুমি পারবে না'। এ'রকমভাবে বিচার ক'রে মনকে বোঝালে মন আর টাকা চাইবে না, কারণ মন তো স্বরূপে চৈতন্য। বিবেক মনেরই একটা প্রকাশ মাত্র। এ'রকম বিচারের জাগপ্রদীপ হৃদয়ে জ্বেলে রাখতে হয় আর তাহলেই কোন কাম বা কামনা তোমায় বাঁধতে পারে না। কামনা নিজে তখন হার মানবে। ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখতে গেলে জ্ঞানের প্রদীপ হৃদয়ে সর্বদা জ্বেলে রাখতে হয়।

কাম বা কামনাকে বলা হয়েছে 'মহাশনঃ',—অর্থাৎ যা সহজে পরিপূরণ করা যায় না। মন সর্বদাই dissatisfied (অতৃপ্ত)। কাম

যত বাড়বে আগুনে ঘি ঢালার মতো অতৃপ্তিও বেড়ে চলবে—এতটুকুও কমবে না। শাস্ত্রকারের কথাও তাই—

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

কামনা দিয়ে কামনার নাশ হয় না, কামনাকে নাশ করতে গেলে তাই নিষ্কাম হোতে হয়। ত্যাগ চাই। আগুনকে নেবাতে গেলে ঘি ঢাললে হয় না, জল ঢালতে হয়। সে'রকম ত্যাগ না এলে কামনা যায় না: "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানশুঃ",[১৬]—কর্ম, পুত্রোৎপাদন বা ধনের বিনিময়ে অমৃতত্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, একমাত্র ত্যাগ চাই। ত্যাগ কিনা কামনা বাসনার ত্যাগ। রামপ্রসাদ বলেছেন: 'বাস্‌নাতে দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটি'। বাস্‌না কিনা বাসনা। বাসনাতে আগুন ধরানো মানেই নিষ্কাম হওয়া। তবে কোন-না-কোন বাসনা তো থাকবেই, তাই 'আমি ভগবান লাভ করবো', 'আমি জগতের কল্যাণ করবো' এ'সব বাসনাতে কোন দোষ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন 'হিংচে শাকের মধ্যে নয়' বা 'মিছ্‌রী মিষ্টির মধ্যে নয়'। যাতে নিজের ও জগতের কল্যাণ হয় সে'রকম বাসনায় অনিষ্ট হয় না। সে বাসনা সংসারে মানুষকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু যেসব বাসনা মানুষকে আসক্তির ভিতর জড়িয়ে ফ্যালে, যে'সব কামনা দুঃখ, কষ্ট ও জন্ম-মৃত্যুচক্রের কারণ হয় সেগুলোকে বিচার ক'রে ত্যাগ করতে হয়। কামনা কি আর সহজে যায়! কামনাকে প্রশ্রয় দিলে সে বাড়ে বই কমে না, 'ভূয় এবাভিবর্ধতে'—বাসনা ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে॥

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥[২৭]

'বিষয়ধ্যানকারী পুরুষ বিষয়ের চিন্তা করতে করতে ক্রমশ আসক্ত হয়। আসক্তি থেকে কামনা বা তৃষ্ণার উদ্ভব, সে কামনা প্রতিহত হোলে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, ক্রোধ থেকে আসে কর্তব্যাকর্তব্যে অবিবেক আর অবিবেকের ফলে হয় স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হোলে মানুষের সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, বুদ্ধি বিনষ্ট হোলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা আর না-থাকা দুই সমান'। ক্রোধ মনেরই একটা unfulfilled (অপূর্ণ) বা dissatisfied attitude (অতৃপ্ত অবস্থা)। ক্রোধ হোলে মানুষের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মানুষ তখন পশুর মতো হয়। একজন একটা কটু কথা বল্লে তো সহ্য করতে পারলে না, অম্‌নি তার মাথায় লাঠি বসিয়ে দিলে আর লোকটা মরে গেল—এই ক্রোধের ফল। ক্রোধ হোলে সর্বশরীরে একটা বিষের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। আমেরিকায় একজন ডাক্তার বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন ক্রোধ হোলে মানুষের শরীরে যে এক রকম মারাত্মক poison-এর (বিষের) সৃষ্টি হয় তার এক ফোঁটা নিয়ে কোন খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে অন্তত কুড়িটা লোক মারা যেতে পারে। এই বিষ যদিও নিজেকে মেরে ফেলতে পারে না কিন্তু ক্রোধ যার হয় তার শরীরকে দুর্বল করে এবং সমস্ত শরীর, থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। ক্রোধ তাই মানুষের শত্রু, সুতরাং ক্রোধকে দমন করা দরকার। তবে কামনা জয় করলে ক্রোধ আপনা থেকে জয় হয়, ক্রোধকে জয় করার জন্য আর পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না।

সংস্কার সকল জিনিসের মূল। সংস্কার কিনা কামনার সূক্ষ্ম আকার বা বীজ। কামনার বীজ বহুজন্ম থেকে subconscious mind-এ (মনের অবচেতন স্তরে) জমা থাকে। Subconscious mind-এর (মনের

অবচেতন স্তরের) অপর নাম প্রকৃতি, অব্যক্ত বা undifferentiated consciousness। অবচেতন মনই মানুষের চরিত্র গঠন করে। চরিত্র impressions (সংস্কাররাশি) ছাড়া অন্য কিছু নয়। স্বভাব বা চরিত্র bundle of impression-এর (সংস্কারের পুটুলির) মতো। একে সাধারণ ভাষায় বলে habit (অভ্যাস)। Habit is the second nature (অভ্যাস স্বভাবের নামান্তর)। Nature কিনা unmanifested causal energy (অব্যক্ত কারণশক্তি)।

সকল কাজের impressions (সংস্কারগুলো) মানুষের subconscious mind-এ (মনের অবচেন স্তরে) জমা থাকে, কোনট কখনো নষ্ট হয় না। একে বিজ্ঞান বলছে *conservation of energy* (শক্তিসংরক্ষণ)। আসলে সবই energy বা শক্তির বিকাশ। এই যে জগৎ দেখছ এটাও energy বা শক্তির খেলা। শক্তি যে আকারেই থাক না কেন তার কখনো ক্ষয়-ব্যয় নেই। The sum-total of energy neither increases nor decreases (শক্তিসমষ্টি কখনো বাড়েও না কমেও না), বরং তার amount (সমষ্টিগত পরিমাণ) সমান থাকে। যেকোন কাজই করো না কেন তার impression (সংস্কার) তোমার মনে থাকে, একটুও নষ্ট হয় না। যেমন তুমি একটা আম খেলে, আম খাওয়ার ক্ষণিক একটা আনন্দও অনুভব করলে। এখন আম খেলেই কি আম খাওয়ার ইচ্ছা বা কামনা তোমার মন থেকে একেবারে চলে যাবে? তা কেন, বরং তা সংস্কারের আকারে মনের মধ্যে থেকে যায়। ঐ সংস্কার যখন আবার জাগ্রত হয় তখন পুনরায় তোমার আম খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। সুতরাং কোন-কিছু কখনো নষ্ট হয় না, সবই সংস্কারের আকারে subconscious mind-এ (মনের অবচেতন স্তরে) সঞ্চিত থাকে।[১৮] এ'রকম ভোগ জীবনে যত করবে ততই তাদের ছাপ কিনা সংস্কার তোমার মনের ওপর পড়বে।

মন যেন একটা ব্লটিং-পেপারের মতো, যে কোন spot-ই (ছাপাই) পড়ুক না কেন ব্লটিং পেপার তাকে soke ক'রে (শুষে) নেয়। এ'রকম spot (ছাপ বা দাগ) পড়তে পড়তে ক্রমে মনটা একেবারে ভর্তি হোয়ে যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম (David Hume) তাই মনকে বলেছেন the bundle of sensations (সংবেদনরাশি)। কিন্তু হিউমের sensation বা impression-গুলো সব isolated (ভিন্ন ভিন্ন) বা loose (আল্‌গা), তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন connecting link (যোগসূত্র) নেই, যেন patches of cloud-এর (টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের) মতো আকাশে উড়ে ব্যাড়াচ্ছে। বেদান্তের মতে মনের পিছনে এক চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা থাকেন আর সে আত্মাই মনের অধিষ্ঠান ও চালক। হিউম মনের কোন ground বা অধিষ্ঠানও স্বীকার করেন নি, কাণ্ট হিউমের সে ভুল বা সুপ্তি ভেঙে দিয়েছেন। কাণ্ট বল্লেন মনের পিছনে *ego* (জীবাত্মা) ব'লে একটা চেতন বস্তু থাকে আর সেটাই isolated impression-গুলোকে (আল্‌গা সংস্কাগুলোকে) একত্র ক'রে ধরে রাখে। সে'জন্যই কোন জিনিসের sensation (সংবেদনজ্ঞান) বা percepion (প্রত্যক্ষজ্ঞান) লাভ করা আমাদের সম্ভব হয়।[১১] ফিক্টে (Fichte) কাণ্টের কথায়ই সায় দিয়েছেন।

মানুষ যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করে তার কারণ কামনা। ফিক্টে বলেছেন মনের .পিছনে এক চেতন আত্মা (ego) থাকেন আর তিনিই মনের ground বা অধিষ্ঠান। মন তো জড়, সুতরাং চেতন আত্মা মনের পিছনে থাকেন বলে মন চেতনের মতো কাজ করে। কামনা বা কামই সকল জিনিসের মূল। কাম ও ক্রোধকে দূর করতে হলে তাই সকল জিনিসের ওপর থেকে আসক্তি সরিয়ে নিতে হয়। কামনা চরিতার্থ হলো না ব'লে অসন্তুষ্ট হোলে চলবে না। সকল জিনিসের cause কারণ একটা খুঁজে বার করতে হয়।

যেমন ক্রোধ কেন হোল তার কারণ খুঁজে বার করলে দেখবে কিছু-না-কিছুতে তোমার কামনার ব্যাঘাত ঘটেছে। তুমি যা চাও ঠিক তা পাওনি ব'লে মন সন্তুষ্ট নয় আর সেই অসন্তোষের জন্য ক্রোধ সৃষ্টি হয়। সন্তোষই ক্রোধদমনের প্রধান উপায়। কামনা ভোগ ক'রে কখনো কামনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তাই যেকোন কাজই করো না কেন তা থেকে রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করতে হয়। গীতায় আছে,

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥[১০০]

প্রসাদ বা আত্মপ্রসাদ লাভ করলে তবে শান্তি, তবেই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মানুষ অব্যাহতি লাভ করে। নইলে যতই টাকা-পয়সা রোজগার করোনা কেন, যতই শাস্ত্রপাঠ আর যুক্তি-বিচার করোনা কেন, সত্যকার শান্তি লাভ না করলে সব বৃথা।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশুঃ বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥[১০১]

চিত্তের প্রসন্নতা এলে মন ও বুদ্ধি স্বচ্ছ এবং নির্মল হয় আর সেই নির্মল মনে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিভাত হন। যোগীরা মনের বৃত্তিকে তাই নিরোধ ক'রে প্রসন্নতা আনতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানীরা বিচার করেন। জ্ঞানীরা বিচার করেন যে মনের নিস্তরঙ্গ অবস্থাই শান্তি। বৃত্তি মানে মনের চাঞ্চল্য আর চাঞ্চল্য অশান্তি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বৈচিত্র্যই 'নানা' ও দ্বৈত। বৈচিত্র্য তাই মর্ত্য বা বিনাশশীল। অমৃতত্ব তার বিপরীত। জ্ঞানীরা আত্মায় চিত্ত স্থির করেন। আত্মায় চিত্ত স্থির হোলে ব্রহ্মজ্ঞানও করতলগত হয়।

আত্মজ্ঞানে শান্তি, কামনায় শান্তি নাই। কামনাই জগৎ আর জগৎ অর্থে কেবল যাওয়া ও আসা। জ্ঞানীরা তাই স্বার্থসংকল্প ত্যাগ করেন। বিশ্বকল্যাণের জন্য কর্ম ও কামনা করলে সে কর্ম ও

কামনা মানুষকে আবদ্ধ করে না। জ্ঞানীরা স্বার্থপূরণের জন্য কখনো আকাঙ্ক্ষা করেন না। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম বা কামনা মানুষের মধ্যে ক্রমশ নিস্পৃহভাব এনে দেয় এবং তা থেকে আত্মপ্রসন্নতা লাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ॥
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥[১০২]

'যিনি নিঃশেষে কামনা বাসনা ত্যাগ করেন, কোন কাজে বা কামনায় যার 'আমি' 'আমার' এই স্বার্থভাব না জাগে এবং যিনি নিরহঙ্কার তিনিই যথার্থ শান্তি লাভ করেন'। এই শান্তির অবস্থাকে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলা হয়েছে। তবে সৎ কাম অর্থাৎ ভাল কামনাও আছে। সৎ কামনা বলতে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কামনা। সৎ কামনার দ্বারা সৎ কাজ হয়। যে পরের উপকার করে সে পরকে আপনার ব'লে না ভাবলে কখনো নিঃস্বার্থভাবে কারুর উপকার করতে পারে না। এভাবে আপনার বোলে ভাবা ও ভালবাসার নাম 'প্রেম'। এখন ভালবাসা কাকে বলে? The feeling of *oneness*-ই (একাত্মভাবের অনুভবই) ভালবাসা। কেউ কারুর জন্য যখন ভাবে বা কাকেও দয়া করে তখন তার মনে এই feeling of *oneness* (একাত্মবোধ) না এলে কখনই ভাবতে বা দয়া করতে পারে না। He places himself in equal state of the man whom he loves, to whom he shows sympathy (সে যখন তাকে ভালবাসে বা তার প্রতি সহানুভূতি দেখায় তখন সে তার সমান অবস্থার ভিতর নিজেকে স্থাপন করে)। Sympathy (সহানুভূতি) মানেই তাই যে, যার ওপর তুমি সমান অনুভূতি দেখাচ্ছ তার দুঃখে নিজেকে সমদুঃখী ও তার সুখে নিজেকে সমসুখী জ্ঞান করছ। এটাই যথার্থ ভালবাসা ও প্রেমের লক্ষণ। ভগবদ্সাধকেরা বলেন 'প্রেমে এক হোয়ে যায় গলে'। তখন আর আত্ম-পর জ্ঞান

থাকে না, সব একাকার হয়। যোগীদের বা ঠিক ঠিক ভক্ত-সাধকদেরও এ'রকম ভালবাসার ভাব হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন,

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥[১০৩]

'হে অর্জুন, যিনি সকল প্রাণীর সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ ব'লে অনুভব করেন আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু এ'ভাব কি আর সকলের আসে! ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কামনা তাই কামনার মধ্যে গণ্য নয়। যোগযুক্ত ও সমদর্শীরাই একমাত্র ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কামনা নিয়ে সংসারে অহেতুকী ভালবাসা ছাখাতে পারেন। সাধারণ মানুষের ভালবাসায় স্বার্থ মেশানো থাকে, এতটুকু ভালবাসা তারা স্বার্থ ছাড়া দিতে পারে না। স্বার্থগন্ধযুক্ত ভালবাসার নাম 'কাম'। প্রেম তার বিপরীত। আগেই বলেছি প্রেমে আত্ম-পর ভাব থাকে না। তখন সবাই আপন। প্রেমিক লোক সকলকে আপনার ব'লে ভালবাসে আর ভালবাসার জন্য এতটুকু বিনিময় আশা করে না। বাউলদের গানে আছে,

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
(ও তার) থাকে না ভাই আত্মপর ॥
প্রেমিক এম্নি রত্ন ধন, কিছু নাইকো তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন,
(ও সে) হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর ॥
প্রেমিক চায় নাকো জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুন্ন রটলে অখ্যাতি।
(ও তার) হস্তগত সুখের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর ॥
প্রেমিক চাল্‌টা বেয়াড়া, কিছু বেদ-বিধি ছাড়া,
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নেই সাড়া,
(আবার) চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর ॥

এটাই প্রেমিকের ঠিক ঠিক স্বভাব। তাঁরা দেহতত্ত্বের গান ক'রে সাধনা করেন। তাঁদের ভাব উচ্চ। আজকাল বাউলদের ভিতর আবার অনাচারও ঢুকেছে—যেমন তন্ত্রে বামাচার। আগে moral life (নৈতিক জীবন) তারপর religious life (ধর্মজীবন)। সদ্‌গুণ, সচ্চরিত্র, পরোপকার, দয়া, ভালবাসা, স্নেহ, সমপ্রাণতা এসব moral life-এর (নৈতিক জীবনের) লক্ষণ। moral life-এর (নৈতিক জীবনের) পর religious life (ধর্মজীবন) আরম্ভ হয়। Religion (ধর্ম) কিনা তোমার স্বরূপ বা তোমার প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করা। Religion (ধর্ম) কেবল কতকগুলো set of doctrines, dogmas ও ceremonies (উপদেশ, মতবাদ ও অনুষ্ঠান) ইত্যাদি নয়। Doctrines ও dogmas (উপদেশ ও মতবাদগুলি) ধর্মের বাইরের জিনিস। এরা অধ্যাত্মপথের সহায়ক মাত্র। আসল ধর্ম অন্তরের জিনিস। ভগবানকে পাবার জন্য অন্তরের কতখানি ব্যাকুলতা এটাই তোমার religious life-এর (ধর্মজীনের) লক্ষণ। Religious life fulfil (ধর্মজীবন পরিপূর্ণ) হোলে তবেই spiritual life (আধ্যাত্মিক জীবন) আরম্ভ হয়। Spirit কিনা আত্মা। আত্মাকে জানার আকুলতার নাম spiritual life (অধ্যাত্ম জীবন)। আত্মাকে যিনি জেনেছেন তিনিই ঠিক ঠিক spiritual man (অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন মানুষ)। নইলে একটা অলৌকিক দর্শন হোল আর তুমি অভিভূত হোলে এটা spiritual life-এর (অধ্যাত্ম জীবনের) চিহ্ন নয়। দর্শন-টর্শনেরও পারে যেতে হয়, তবেই realization কিনা অনুভূতি। Realization-ই (অনুভূতিই) ঠিক ঠিক religion (ধর্ম)। spiritual life-এর (অধ্যাত্ম জীবনের) ভিত্তিই অনুভূতি।

দেশের ভিতর যখন কোন privileged class (স্বার্থান্বেষীর দল) ওঠে তখন তাদের কাজ হয় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে অপর

সকল জাতিকে দাবিয়ে রাখা। বৌদ্ধেরা যখন সমাজে প্রবল হোল তখন ব্রাহ্মণদের উপর কি-না অত্যাচার! তারপর ব্রাহ্মণেরা যখন আবার প্রবল হোল তখন বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করতে কসুর করেনি। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের তখন 'শূদ্র' আখ্যা দিয়েছিল। পুষ্যমিত্র রাজা হোলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি আবার ফিরে এসেছিল। বৌদ্ধেরা তখন সমাজে একেবারে একঘরে। পুষ্যমিত্রই ব্রাহ্মণদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য মনুসংহিতা নতুন করে আবার লেখালেন। মনুসংহিতায় তাই দু'রকম ভাবের সমাবেশ। মনু কখনো সমাজবিধিসম্বন্ধে বেশ উদার, আবার কখনো বেদপাঠ করলে কাণে গরম সীসে ঢেলে দেবার ব্যবস্থাও করেছেন। মোটকথা ব্রাহ্মণদের স্বার্থ পুরোদস্তুর বজায় রাখাটাই যেন নতুন কোরে মনুসংহিতা লেখানোর উদ্দেশ্য। তখন ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণদের যদি কোন অসম্মানসূচক কথা বলতো বা আচরণ করতো তো তখুনি তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হোত, আর ব্রাহ্মণেরা যদি অপর জাতিদের ওপর কোন অসদাচরণ বা অত্যাচার করতো তাদের বেলায় ছিল সাতখুন মাপ। গরম তেলের কড়ায় ফেলে শাস্তি দেওয়ার মতো cruel custom-এরও (নির্মমপ্রথাও) তখন প্রচলন ছিল। সমাজব্যবস্থা সবই সমাজস্বার্থের জন্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের যখন প্রবল প্রতাপ তখন ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য জাতিদের ততো আমল দিত না।

এখন Autocracy-র (স্বৈরতন্ত্রের') যুগ কিন্তু চলে গ্যাছে। এখন মানুষ চায় equal status, equal power, equal privilege (সমান অধিকার, সমান ক্ষমতা, সমান সুবিধা)। একটা জাতিকে নীচু ব'লে দাবিয়ে রাখবো আর আমি তার ওপর নির্বিবাদে প্রভুত্ব করবো এসব আর চলবে না। এখনই চাই brotherly feeling (ভ্রাতৃভাব) ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি sympathy-এর (সহানুভূতির) ভাব। আমাদের দেশে autocracy-র (স্বৈরচারিতার) ভাবটা এখনো

পুরোদস্তুর আছে। ইংল্যাণ্ডের তো কথাই নেই। আমেরিকায় democracy-র (গণতন্ত্রের) ভাব প্রবল। আমেরিকায় রেলওয়ে ট্রেনে, অফিসে, রাস্তাঘাটে সর্বত্রই মেয়ে-পুরুষদের সমান অধিকার। আজকাল মেয়েরা আবার সেখানে পুরুষদের সঙ্গে রীতিমত compitition (প্রতিদ্বন্দ্বীতা) করছে। এখন মেয়েদের ভিতর সত্যই একটা জাগরণ এসেছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা মেয়েদের সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে দাসীরও অধম ক'রে রেখেছিল। তারাও যে মানুষ, তাদের যে বিবেক বুদ্ধি আছে—বরং পুরুষের চাইতে বেশী একথা তারা স্বীকার করত না। অথচ তারা আবার সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতিও চাইত। এখন আর সে'যুগ নাই। বৈদিক সমাজ মেয়েদের কী ধরণের উচ্চ সম্মান দিয়েছিল তা একবার বেদ, ব্রাহ্মণ ও সংহিতার পাতাগুলো উল্টে দেখনা। পুরাণের যুগেও তাই। কিন্তু তোমাদের দেশের স্মার্ত পণ্ডিতেরা সে'সব বিধান একেবারে উল্টে দিয়েছেন। মেয়েদের বেদ পড়াও নিষেধ হয়েছিল। ধর্মে, শিক্ষায় ও সমাজে সকল দিক থেকে মেয়েদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড ও শক্তি-সামর্থ্য তো মেয়েরাই! এখন তাই মেয়েদের অধিকারকে আবার স্বীকার ক'রে নিতে হবে, মেয়েদের দাসী ক'রে রাখলে চলবে না। Equal status ও equal right (সমান অধিকার ও সমান দাবী) মেয়েদের সকল যুগে ছিল। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করলেন তখন তিনি প্রথমে অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী হয়েছিলেন ও তা থেকে অর্ধনারীশ্বরের সৃষ্টি হোল। বেদের ভাষ্যে আচার্য সায়ণও নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শঙ্করাচার্য অর্ধনারীশ্বরের স্তবে শিব ও গৌরীকে সমান অধিকার দিয়েছেন।

উপনিষদের যুগে গার্গী মৈত্রেয়ী এদের উদাহরণ দ্যাখনা! ব্রহ্ম-তত্ত্ববিচারে বিদুষী গার্গী সগর্বে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সভায় আহ্বান করেছিলেন। বিদুষী ক্ষণা[১০৪] রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায়

জ্যোতির্বিদ্যায় অদ্ভুত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য-যুগের শেষের দিকে তা নষ্ট হোয়ে গিছলো। আবার সেই অধিকারের দাবি আস্তে আস্তে সমাজে ফিরে আসছে। আজকাল মেয়েরা লেখা-পড়া শিখছে, ভিন্ন ভিন্ন সভা-সমিতিতে ও আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। এটাই দেশের শুভলক্ষণের সূচনা ও নবজাগরণের পূর্বাভাস জানবে। এটা সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের দেশ। এদেশ সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সাধ্বী নারীদের দেশ। ত্যাগই এ'দেশের মন্ত্র, ধর্ম এ'দেশের প্রাণ সুতরাং এ'দেশের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী! কিন্তু আমাদের মনের সংকীর্ণতা আগে দূর করা দরকার। দেশের সকল শ্রেণীর লোককে ভালবাসতে হবে। মূর্খ, হীন, পতিত এই বোলে বোলে দেশের যারা প্রাণ ও সত্যকার আশা-ভরসা তাদের আমরা সমাজে এখনো পতিত ক'রে রেখেছি। তাদের এখন তুলতে হবে। তারা সমাজে এখনো নির্যাতিত ও পদদলিত, অথচ দয়া, ক্ষমা, সরলতা, হৃদয়, অধ্যবসায়, মহাপ্রাণতা যত কিছু সদ্‌গুণ বলো সবই তাদের ভিতর আছে। তারাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাদের মুখের অন্ন জোগাচ্ছে, অথচ তোমরা সব সভ্য কেরানীর দল right and left (উঠতে ও বসতে) তাদের criticism (সমালোচনা) করছ। তাদের সঙ্গে তোমরা খাবে না, তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করবে না, তাদের ছোঁয়া জল ও অন্ন খেলে তোমাদের জাত যাবে—এই তো তোমাদের ধর্ম আর সমাজ। এখন শূদ্র-জাগরণের যুগ। জাতি ও বর্ণের ধূয়া তুল্লে এখন চলবে কেন! জাতি ও বর্ণ কথা বাস্তবিক ঋগ্বেদে কোথাও পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই মনে হয় জোর ক'রে আমাদের মাথায় ঢুকিয়েছে যে, ঋগ্বেদের যুগেও আজকালকার মতো জাতিবিভাগ ছিল। ব্রাহ্মণের যুগে ক্ষত্রিয় রাজারা একদিকে যেমন যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী, অন্যদিকে তেমনি ব্রহ্মজ্ঞও ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছেই তো

ব্রহ্মবিদ্যা শিখতেন। মহাভারতের যুগে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা শিখতো আবার পুরোহিতেরও কাজ করতো। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়দের থেকেই পুরোহিতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও এ' ধরনের প্রথার প্রচলন ছিল।

তবে বেদে যে 'বর্ণ'-শব্দের একেবারে উল্লেখ নেই তা নয়। গায়ের রঙ বা colour অনুসারে তখন সমাজে জাতিবিভাগ করা হোত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-শব্দেরও উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। পরে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতিবিভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের কোনটাই নেই। এখন যদি colour (গায়ের রঙ) হিসাবে জাতিবিভাগ করতে যাও তো সবাইকে তাহলে শূদ্রজাতির মধ্যে গণ্য করতে হয়। কাজেই জাতের বড়াই ক'রে এখন আর লাভ কি। চট্টগ্রামে এক সভায় আমি সমাজ ও জাতিবিভাগ নিয়ে যখন এ'রকমের ব্যাখ্যা করেছিলাম তখন সেখানকার এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ আমার ওপর রেগে একেবারে খাপ্পা হয়েছিল। কিন্তু কি করবো বলো। শাস্ত্রে বর্ণ অর্থাৎ রঙের কথাও আছে। এখন ব্রাহ্মণ সাদা ধপধপে না হোয়ে যদি কালো কুচকুচে হয় তবে তোমাদেরই বিধান অনুসারে আমি তাকে কি বলবো বলো। বংশপরম্পরা একচেটে ব্যবসা কি আর সব সময় খাটে ?

পূর্বেই বলেছি এখন শূদ্র-জাগরণের যুগ। এতদিন যারা পতিত ও অবহেলিত ছিল এখন তাদের উত্থান। এখন আমি 'ব্রাহ্মণ আর 'ও শূদ্র' এই বোলে পৈতে ত্থাখালে আর চলবে না। এখন দরকার liberal view (উদার মত ও দৃষ্টি) নিয়ে চলা। Rational ভাবে (যুক্তিপূর্ণভাবে) এখন বিচার ক'রে সব দেখতে হবে। এতদিন যাদেরকে তোমরা 'ছোট ছোট' ব'লে সমাজে ঘৃণা ক'রে এসেছ তারাই এখন উচ্চাসন পাচ্ছে। এখন ভালবাসা দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করতে হবে। ভালবাসা, সহৃদয়তা ও সমপ্রাণতাই হবে এ'যুগের মন্ত্র ও আদর্শ। 'ছুঁস্নি ছুঁস্নি' এ'সব আর নয়। এখন সকলকেই

বলো 'তোমরা আমাদের ভাই বোন, এস—একসঙ্গে মিলেমিশে দেশের ও দশের কাজ এবং জগতের কল্যাণ করি'। তবেই দেশের উন্নতি, নইলে সমস্ত দেশ ও জাতির কল্যাণ নাই!

কাজে ও চিন্তায় সেবার ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ভগবান সবার ভিতর আছেন—কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল। নারায়ণজ্ঞানে সকলকে ভালবাসতে হয়, সকলের সেবা করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তাই বলেছিলেন: "জীবে দয়া? দূর শালা, কীটানুকীট, তুই জীবকে দয়া কর্‌বি কি করে? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা"! স্বামিজী (বিবেকানন্দ) তাই দেশেসেবার ভাব প্রবর্তন কোরে গেলেন। নারায়ণজ্ঞানে জীবের সেবা। জীবই শিব এই জ্ঞানে সেবা করতে হয়। রামকৃষ্ণ-মিশনের এখন আদর্শ তাই—নারায়ণজ্ঞানে সেবা। এতে ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, সব নারায়ণ—ব্রাহ্মণনারায়ণ আবার চণ্ডালনারায়ণ। এই যে রিলিফ, ডিস্‌পেন্সারী, হস্‌পিটাল এসব লোককল্যাণের জন্য। এ'যুগে এ'রকম না হোলে চলবে না। শুধু নিজের ধ্যান জপ নিয়ে বসে থাকলে এ'যুগে হবে না। নারায়ণবুদ্ধিতে লোকসেবা করতে হবে, তবেই নিজের ও দশের কল্যাণ হবে। নিজে খাবো, নিজে পরবো ও সুখে থাকবো, নিজে ভগবান লাভ কোরে সমাধিতে ডুবে মস্‌গুল্ থাকব—এসব এ' যুগের ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্বদের আদর্শ পড়েছ? যতক্ষণ পর্যন্ত একটা লোকও বোধি লাভ করতে বাকি থাকবে ততক্ষণ তাঁরা নিজেদের মুক্তি চাইবেন না। এরই নাম মৈত্রীভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এ' যুগে এক নতুন আদর্শ দিতে এসেছিলেন। 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'—স্বামিজীর (বিবেকানন্দের) এই আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আদর্শ। দেশের লোকে অনাহারে ও দুঃখ-কষ্টে মরবে আর তুমি নিজের মুক্তির জন্য চোখ বুঝে বসে থাকবে—এটা এ' যুগের ধর্ম নয়। নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি লোকের মুক্তি

চাইতে হবে, সকলের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সকলকে 'অভীঃ' মন্ত্র শুনিয়ে বলবে 'তোমরাও অমৃতের সন্তান, তোমরাও শক্তিমান—বীর্যবান, তোমরাও বীতশোক হবার জন্য জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হও'! নিজেরা মুক্তি লাভ করো ও জগতকে সেই মুক্তির প্রেরণা দাও। এটাই এ' যুগের আদর্শ ও ধর্ম।

কামনা দু'রকম—সৎ ও অসৎ তা আগেই বলেছি। স্বার্থযুক্ত কামনা হোলে কামনা অসৎ আর কামনা যখন নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ তখন তা সৎ। কাম, ক্রোধ ও লোভ এ'তিনটে অসৎ কামনা থেকে সৃষ্টি হয়। এরা মানুষের অনিষ্ট করে। জ্ঞানীরা কামনার পারে যান। কামনার পারে যাওয়া মানে নিষ্কাম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-হীন হওয়া। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কামনায় চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হোলে আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির কথা আছে। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, সর্বদা স্বচ্ছ ও নির্মল। প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্বাংশ যখন পুরুষের অধীন হয় তখন বেদান্তে তাকে ঈশ্বর, আর পুরুষ যখন প্রকৃতির সত্ত্বাংশের অধীন হয় তখন তাকে জীব বলে। সাংখ্যে ঈশ্বর নেই, কিন্তু বেদান্তে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে। এই ঈশ্বর পাপ-পুণ্যের স্রষ্টা নন, পাপ-পুণ্য মানুষই তার ভাল-মন্দ কর্ম অনুসারে সৃষ্টি করে। খৃষ্টানদের মতে Satan is the king of the world (শয়তানই জগতের রাজা)। মার্টিন লুথার বলেছেন: 'Man is the beast of burden, and he carries always burden with him.' (মানুষ ভারবাহী পশু, সে সর্বদা ভার বহন কোরে চলে)। এই burden-ই (ভারই) তাদের মতে 'পাপ'। পাপের idea (ধারণা) Christian Theology-তে (ক্রিশ্চান-ধর্মগ্রন্থে) বেশী। হিন্দুদের পুরাণেও পাপের কথা যে সেই তা নয়।

পাপ ও পুণ্য একমাত্র মনে, আত্মায় পাপ নেই—পুণ্যও নেই। আসলে আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, পাপ আছে—কি পুণ্য আছে এ'সব বিচার করার জন্য জীবন নয়। পাপ-পুণ্যের কারণ বাসনা। কামনার দাস হোলে জীবনে শান্তি নেই। শান্তি পাওয়া যায় ত্যাগে—'ত্যাগাচ্ছান্তিনিরন্তরম্'। কামনাকে জয় করার নামই শান্তি। কামনাকে জয় করার উপায় পরোপকার করা, লোককল্যাণ করা—এই সব। নিজের জন্য না ভেবে পরের উপকার চিন্তা করতে হয়, তাতে মনের সংকীর্ণতা ক্রমশ দূর হয়। চিত্তশুদ্ধি মানেই annihilation of the *ego-centric* idea and removal of *selflshness* from the mind (স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধি নষ্ট করা ও স্বার্থপরতার ভাবকে মন থেকে দূর করা)। মন যত উদার হয় egoistic idea (স্বার্থভাব) ততো নষ্ট হয়। স্বার্থপরতার ভাব নষ্ট হো'তে হোতে শেষে মনে আর স্বার্থের ভাব কোনদিন জাগে না। একেই বলে মনের আমিত্ব নষ্ট করা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। আমি বা ক্ষুদ্র অহং-ই স্বার্থ বা মায়া। মনের সংকীর্ণ ভাব নষ্ট হোলে মন নির্মল হয় ও সেই নির্মল মনে ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : "ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর'। শুদ্ধমন আর ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মা একই। সমুদ্রের তরঙ্গহীন জল সমুদ্রই।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মানঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতদ্ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥১০৫

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার। এরা মানুষের অধোগতির কারণ, সুতরাং এ'তিনটিকে বিচার ক'রে ত্যাগ করতে হয়।

ক্রোধের কথা আগেই বলছি। এখন কাম কি ও কাম আমাদের শত্রু কেন সে' কথাই বলি। আমাদের শরীরে অসংখ্য

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কামবীজানু আছে। তারা মানুষের ইচ্ছায় বা ইচ্ছাশক্তিতে জাগ্রত ও ক্রমে শক্তিমান হয়। তারা সাধারণত সুপ্ত থাকে,—সজাগ অর্থাৎ ক্রিয়াশীল নয়। ইচ্ছাশক্তির বলে কামবীজাণুগুলি মাঝে মাঝে এমনই শক্তিমান হয় যে মানুষের ইন্দ্রিয়কে একেবারে নিস্তেজ ও বশীভূত করে। এমন কি শরীরের রক্ত চলাচল পর্যন্ত অনিয়মিত হয় ও তা থেকে নানারকম রোগের সৃষ্টি হোতে পারে। কামের দুর্দণ্ড প্রতাপে মানুষের reasoning power (বিচারশক্তি) পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়। মানুষের স্বভাব তখন পশুর চেয়েও নীচু স্তরে নেমে যায়।

কিন্তু কামশক্তির origin (উৎপত্তি) কোথা থেকে। Will-power-ই (ইচ্ছাশক্তিই) তার origin (উৎপত্তিস্থল)। মানুষের will-power-এর (ইচ্ছাশক্তির) প্ররোচনায় শরীরে কামবীজাণুগুলি শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল হয়, সুতরাং will-power-ই (ইচ্ছাশক্তিই) এর মূল। Will-power-কে (ইচ্ছাশক্তিকে) তাই control করলে (আয়ত্তে আনলে) কামকে সহজে control (দমন) করা যায়।

কামই আবার কামকলা কুণ্ডলিনী। বেদান্তে এই শক্তিকে primordial energy (আদ্যাশক্তি) বলা হয়েছে। ইচ্ছাশক্তির মূল-আধারই কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলী অর্থাৎ এঁকেবেঁকে শক্তির গতি ব'লে কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনীই vital force বা energy (প্রাণশক্তি)। কুণ্ডলিনীর স্থান মূলাধারপদ্মে। মূলাধার কিনা basic level। একে lotus (পদ্ম) ব'লে যোগীরা কল্পনা করেন। মূলাধারে কাম will-power (ইচ্ছাশক্তি)-রূপে stored up (সঞ্চিত) থাকে। এর মোড় ফেরাতে পারলে সাধারণ মানুষ দেবতায় রূপান্তরিত হয়। কামকে পার্থিব ইন্দ্রিয়সুখভোগের দিকে চালিত করলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়।

Will-power-ই (ইচ্ছাশক্তি) আবার মানুষের personality (ব্যক্তিত্ব) ও character (চরিত্র) তৈরী করে, কাজেই

ভাল বা মন্দ হবার সব-কিছু সম্ভাবনা মানুষের will-power-এর (ইচ্ছাশক্তি) উপর নির্ভর করে। সাধারণত মানুষ এ'রহস্য জানে না এবং জানে না ব'লেই সে কোন অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করে, ভাবে ভাল মন্দ সব-কিছু নির্ভর করে ঈশ্বর বা অদৃষ্টের হাতে। কিন্তু ঈশ্বর কারু জন্য কিছু করেন না। অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করা তাঁর ধর্ম বা স্বভাব নয়। তিনি ভালতে নাই এবং মন্দতেও নাই। মানুষ ভাল বা মন্দ ফল ভোগ করে নিজেরই ভাল বা মন্দ কর্মের জন্য। কর্মফল তাকে সংসারে নিয়ন্ত্রিত করে। 'কপালে লেখা আছে সুতরাং করার কিছু নেই' এ' ধারণা বা মনোবৃত্তি মানুষকে দুর্বল করে। অদৃষ্টবাদী হোলে মানুষ বিশ্বাস ও আত্মদৃষ্টি হারিয়ে ফেলে। তাই ভগবানকে যারা চায় তাদের পক্ষে পুরুষাকার ভাল। অধ্যাত্মপথের সাধকদের পক্ষে অদৃষ্ট বা অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করা ভাল নয়। আর অলৌকিকই বা কাকে বলবে! তোমার অজ্ঞাত ব'লেই অদৃষ্ট বা অলৌকিক। কিন্তু অলৌকিকও তো একটা law-এর (আইনের) দ্বারা governed (পরিচালিত) হয় and that is a higher law (এবং সেটা একটা উচ্চতর আইন)। কাজেই supernatural বা unnatural-ও একদিক দিয়ে natural (অলৌকিকও লৌকিক)। কোন শক্তি তাই বাইরে থেকে আসে না, আত্মশক্তিই সকল শক্তির মূল।

অজ্ঞানই যত অনিষ্টের কারণ। আত্মাসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাই অজ্ঞান। আবার মিথ্যাপ্রত্যয়ও 'অজ্ঞান' বা 'মায়া'। তাই মায়া ও অজ্ঞান একই। মায়াকে 'মরীচিকা' না ব'লে 'স্বপ্ন' বল্লে বোধহয় বোঝার সুবিধে হয়, কারণ স্বপ্নে যেমন অসত্য বা মিথ্যা এমন কত জিনিসকে মানুষ সত্য ব'লে দ্যাখে ও অনুভব করে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে আবার যাকে তাই, মায়াও তেমনি। স্বপ্নের সময় যা সত্য ব'লে অনুভব হয়, জাগ্রত হোলে সে' সব মিথ্যা ব'লে মনে হয়। জাগ্রত হোলে স্বপ্ন

যেমন মিথ্যা ব'লে মনে হয় তেমনি আত্মজ্ঞান হোলে সমস্ত দুনিয়া মিথ্যা কিনা পরিবর্তনশীল ব'লে প্রতীত হয়।[১০৬] অথচ কি আশ্চর্য, সকল মানুষ এই মায়ায় আচ্ছন্ন হোয়েই নিজের ভ্রম বুঝতে পারে না, বরং জগতের ক্ষণভঙ্গুর খ্যালাধূলো আর হাড়-মাসের রূপ নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা মেতে থাকে। এটাই অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার বাহাদুরী। যেটা যা নয় তাকে তাই ব'লে দ্যাখানো বা ভুল বোঝানো মায়ার কাজ।[১০৭] কিন্তু মায়ার হাত থেকে একবার সরতে পারলেই সব হোয়ে গ্যালো। জ্ঞান লাভ হোলে মায়া জ্ঞানীকে আর বাঁধতে পারে না, জ্ঞানী তখন জীবন্মুক্ত। মায়ার জগতে দেহ ধারণ ক'রে থেকেও জীবন্মুক্ত মায়ার প্রলোভনকে তখন সম্পূর্ণ জয় করতে পারেন। সে'সব মানুষই ধন্য! মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে এ' অবস্থা লাভ করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মায়ার পারে যেতে গেলে তীব্র বিবেক ও বৈরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য না এলে মায়ার হাত থেকে দেবতাদেরও নিস্তার নেই। এ' সম্বন্ধে একটা গল্প শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় বলতেন। এক সময়ে বিষ্ণু মর্তে এসে শূকরদেহ ধারণ করলেন ও কর্দমাক্ত একটা পুষ্করিণীতে এক শূকরীর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। ক্রমশ শূকরীর গর্ভে অনেক কাচ্চাবাচ্চা হোল আর তাদের নিয়ে বিষ্ণু বেশ আনন্দে ও সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটতে লাগলেন। এদিকে স্বর্গে দেবতারা প্রমাদ গণলেন। বিষ্ণুর অভাবে স্বর্গ তো যায়। অবশেষে অনেক যুক্তি ও চিন্তার পর দেবতারা একত্র হোয়ে পুষ্করিণীর কাছে গিয়ে ছলে ও কৌশলে বিষ্ণুকে ফিরিয়ে আনা সাব্যস্ত করলেন। তাঁরা গিয়ে দ্যাখেন বিষ্ণু শূকরী আর কাচ্চাবাচ্ছাদের নিয়ে মহা-আনন্দে খ্যালা করছেন। দেবতারা বিষ্ণুকে ডেকে বললেনঃ 'হে বিষ্ণু, আপনি একি করছেন! আপনি যে বিষ্ণু,—বৈকুণ্ঠের অধিপতি, আপনি বৈকুণ্ঠে ফিরে চলুন!' বিষ্ণু শুনে বল্লেনঃ 'না, না, আমি বেশ আনন্দে

আছি ! তোমরা ফিরে যাও, আমি যাব না'। শুনে দেবতারা তো অবাক্। তাঁরা নিরুপায় হোয়ে অবশেষে মহাদেবের কাছে ছুটে গ্যালেন। মহাদেব শুনে বল্লেন : 'মা ভৈঃ, আমি যাচ্ছি। আমি ভূতগুলোকে দিয়ে ছানাগুলোকে খাওয়াব, তাহলেই বিষ্ণুর মায়া কেটে যাবে'। হোল তাই। মহাদেব তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ভূতদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে হাজির হলেন। ভূতগুলো মহাদেবের আদেশে শূকর ছানাগুলোকে এক একটা ক'রে সব খেয়ে ফেল্লে আর মহাদেব নিজেও শূকরদেহী বিষ্ণুর পেটে ত্রিশূল বসিয়ে দিলেন। বিষ্ণু তখন নিজ মূর্তি ধারণ ক'রে হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন আর বল্লেন : 'এতক্ষণ কি আমি স্বপ্ন দেখছিলুম ?' মায়া এই রকম। মায়া কত অঘটনঘটন ঘটাতে পারে। মায়া স্বপ্নের মতো। যতক্ষণ স্বপ্ন ততক্ষণ মায়া এবং ততক্ষণই ভ্রম। স্বপ্ন ভেঙে গেলে জাগরণ কিনা জ্ঞান হয়। মায়া তখন দূরে চলে যায়।

শরীরের মধ্যে জাগ্রত আত্মচৈতন্যের পূজা করতে হয়। একে 'আত্মপূজা' বলে। আত্মপূজা বলতে আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অভেদ ভেবে পূজা করা। কিন্তু সবাই তা করতে পারে না। বেশীর ভাগ মানুষ রক্ত-মাংসের দেহকে আত্মা মনে করে, কাজেই দেহ ছাড়া আর কোন জিনিস তারা চিন্তা বা কল্পনা করতে পারে না। শাস্ত্রে তাই দেবদেবীর মূর্তিপূজার ব্যবস্থা আছে। দেবদেবীরা different symbols of the same Divinity or *Atman* : অর্থাৎ দেবদেবীরা একই ব্রহ্ম বা আত্মার বিভিন্ন প্রতীকমাত্র। পাতঞ্জলদর্শনে 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' ব'লে নির্গুণব্রহ্মের প্রতীকরূপ ওঙ্কার-উপাসনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যেমন অসংখ্য, তার প্রবৃত্তিও তেমনি বিচিত্র। সুতরাং যার যে symbol-এ (প্রতীকে) প্রবৃত্তি বা নিষ্ঠা সে সেই symbol (প্রতীক) বা মূর্তির পূজা ও উপাসনা করে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যার পেটে যা সয়, সবাই কি আর একরকম জিনিস খায়।

একজন মানুষের মুখের সঙ্গে যেমন অপর মানুষের মুখের মিল নেই, সকল মানুষের মুখ ভিন্ন ভিন্ন, মানুষের মনও তেমনি। Cosmic mind (বিরাট মন) এক হোলেও তার বিকাশ এক রকম নয়। সকল লোকের ভিন্ন ভিন্ন মুখগুলোকে যেমন ভেঙে একরকম করা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনকেও তেমনি ভেঙে এক ভাবে তৈরী করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনের রুচি বা প্রবৃত্তিও একরকম নয়। সকল মনের প্রকৃতি তাই এক রকম হয় না, বিচিত্র হয়। বিচিত্র রুচি বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী পূজা, ধ্যান এবং উপাসনায় উপায়ও তাই ভিন্ন ভিন্ন। শাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পূজার প্রবর্তন করেছেন। আসলে এক আত্মারই সকলে প্রতীক। তারপর পূজার নিয়ম হোল পূজার আগে নিজেকে দেবতা বা দেবীর সঙ্গে অভিন্ন ভাবতে হয়। পূজার বিধিতে তাই আছেঃ 'দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ' বা 'দেবীং ভূত্বা দেবীং যজেৎ'। দেবতা বা দেবীর দেহে তাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও নিজের দেহে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। আসলে এ'সব উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদ নেই এটাই বোঝানোর জন্য। প্রথমে অভেদ চিন্তা ক'রে তারপর ভেদ বা দ্বৈতভাবে পূজা করার নিয়ম। সুতরাং মূর্তিপূজার অর্থ যা সাধারণভাবে আমরা বুঝি তা নয়, মূর্তি-পূজার উদ্দেশ্য প্রতীকের পূজা বা উপাসনা। প্রতীক মানেই বাচক—যা অন্য একটি সত্যবস্তুকে নির্দেশ করে। বাচ্য ও বাচক, শব্দ ও অর্থ অথবা নাম ও নামী এক এবং অভেদ। ছায়া যেমন কায়ার প্রতীক তেমনি দেবদেবীর মূর্তি আত্মা বা ব্রহ্মের প্রতীক। শাস্ত্রে আত্মপূজাকে তাই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে,

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥

এক নির্বিশেষ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রুচি তার কারণ। আসলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য আর নানাত্ব কল্পনামাত্র সুতরাং মিথ্যা। তবে যতক্ষণ পূজা বা উপাসনা ততক্ষণ নানাত্ব মিথ্যা নয়। পূজা উপচার হোলেও সাময়িকভাবে সত্য। বিচারের সময় সাময়িক সত্যকে ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক ব'লে ধারণা করতে হয়, কারণ পারমার্থিক সত্য একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দিক থেকে নানা বা বৈচিত্র্য মিথ্যা, নইলে তত্ত্বজ্ঞান যাদের হয় নি তাদের কাছে জগৎ বা বৈচিত্র্য একেবারে মিথ্যা নয়। জগৎ বা বৈচিত্র্যকে তথন ব্যবহারিক সত্য ব'লে ধরে নিতে হয়। ব্যবহারিক সত্য কিনা যতক্ষণ জগৎকে দেখছ ও তার ব্যবহার করছ ততক্ষণ সত্য। শঙ্করাচার্য একথাই বলেছেন : "সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাং সত্যত্বোপপত্তেঃ",[১০৮]—ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্বপর্যন্ত জগৎ সত্য ব'লে মনে হয়, কিন্তু উপলব্ধির পর একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য মনে হয়। তবে উপাসকেরা কথনো উপাসনা, প্রতীক, দেবতা, মন্ত্র ও মূর্তিকে গোড়ার দিকে মিথ্যা ব'লে জ্ঞান করে না, করলে তাদের নিষ্ঠার ব্যাঘাত হয়। পূজা কিংবা উপাসনার সময় দেবতা মিথ্যা, ইষ্ট মিথ্যা, মন্ত্র মিথ্যা ও দেবমূর্তি মিথ্যা এসব জ্ঞান করতে নেই। তারপর বিচার পাকা না হওয়া পর্যন্ত কোনটাতেই মিথ্যাবুদ্ধিও আসে না। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর সব অনিত্য—এ'রকম মনোবৃত্তির নামই 'বিচার'। জ্ঞানীদের জন্য বিচার-পথ, ভক্ত ও কর্মীর পথ আলাদা! ভক্ত কথনো ভগবানকে মিথ্যা ব'লে মনে করে না, করলে তার উপাসনাই ব্যর্থ হয়। তাই বিচারবুদ্ধি যাদের দৃঢ় নয় তাদের পক্ষে ভক্তি বা কর্মের পথ ভাল। সেব্য-সেবকভাবে ভগবানের ধ্যান, জপ, আরাধনা করার নাম ভক্তিপথ। কর্মের ফলে কোন আসক্তি না রেখে জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করার নাম কর্মপথ বা কর্মযোগ। কর্ম ও ভক্তির পথ

দ্বৈতবাদীদের জন্য। অদ্বৈতবাদীদের কথা স্বতন্ত্র। অদ্বৈতবাদীরা গোড়া থেকে 'নেতি নেতি' বিচার ক'রে জগতকে মিথ্যা অর্থাৎ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ব'লে জ্ঞান করে। ভক্ত ও কর্মীরা গোড়ার দিকে তা করতে পারে না, তাই তাদের পক্ষে দেবদেবীদের মূর্তির পূজা ও ধ্যান শ্রেয়। কালে তা থেকেই তাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় ও তারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। এই পারমার্থিক জ্ঞান একদিন না একদিন সকলে লাভ করবে—কেউ আগে আর পরে।

পূজার সময় চিন্তা করতে হয় মৃন্ময়ী চিন্ময়ী। মাটি, পাথর এই জড়বুদ্ধি ক'রে দেবদেবীর পূজা করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, বরং তাতে অনিষ্ট হয় এবং আত্মপ্রত্যয়, ভক্তি ও নিষ্ঠায় ব্যাঘাত হয়। শাস্ত্রে আছে,

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাম্।
প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্ ॥

জ্ঞানী গুরু শিষ্যকে জ্ঞানপথের নির্দেশ দেন। মন্ত্রের জপে ও স্মরণে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। মন্ত্রে বা অক্ষরে সামান্য জ্ঞান ক'রে আর প্রতিমা অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তিতে শিলা বা মাটি জ্ঞান ক'রে উপাসনা করলে সাধকের অকল্যাণ হয়, তাই পূজা বা উপাসনার সময় কল্পনা বা আরোপ করা ভাল। আরোপ কিনা মৃত্তিকা বা পাথরের দেবদেবী হোলেও চিন্তা করতে হয় দেবতা বা দেবী চিন্ময় বা চিন্ময়ী। শ্রীশ্রী-ঠাকুর যখন মা ভবতারিণীর পূজা বা ধ্যান করতেন তখন মার মূর্তি তো বটেই—এমন কি কোশাকুশী, পূজার বাসন ও মন্দিরের চৌকাট পর্যন্তকে চিন্ময় ব'লে দেখতেন। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলাদা। তিনি সমস্ত জিনিসকে চিন্ময় ব'লে জ্ঞান করতেন। সাধারণ সাধকের পক্ষে ধ্যান, পূজা ও উপাসনার সময় কল্পনার আরোপ করা ভাল। পূজায় মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী ব'লে জ্ঞান করতে হয়। গোড়ার দিকে এ'রকম আরোপ করতে করতে শেষে চিন্ময়বুদ্ধি সত্য সত্যই সকল জিনিসের

উপর আসে এবং তখনই পূজার ভাব spirti (প্রকৃতি) ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে। তখন আর জোর ক'রে দেবতায় বা প্রতীকে চিন্ময়বুদ্ধি আরোপ করতে হয় না, আপনা-আপনি সত্যবুদ্ধির উদয় হয়।

আসলে সাধন চাই। যন সাধন তন্ সিদ্ধি। একটা পথ, মত বা ভাবকে আশ্রয় করতে হয়, তারপর ভক্তির পথে বা যাও কর্মের পথে যাও, যোগসাধন করো বা জ্ঞানের পথেই যাও—সবটাতেই নিষ্ঠা আসে। তবে সাধন চাই, সাধন ভিন্ন কোনটাতে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। তুলসীদাস মন্দবুদ্ধি সাধকদের লক্ষ্য ক'রে তাই বলেছেন,

সোতে সোতে কেয়া করো ভাই উঠ ভজ মুরার।
এ্যায়সা দিন আতে হ্যায় যব্ লম্বা পসার॥

তিনি আরো বলেছেনঃ "কৈ কহে হরি দূর হ্যায়, কিন্তু হরি হ্যায় হৃদয়মে,"—'কেউ বলে হরি দূরে আছেন, কিন্তু হরি আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই আছেন, সুতরাং শুয়ে শুয়ে কি করছ? রামকে ভজনা করো, কারণ মৃত্যু তো পিছনে'। তুলসীদাসের কাছে রাম ও হরিতে কোন ভেদ ছিল না, কারণ তুলসীদাসের জ্ঞান হয়েছিল। জ্ঞান হোলে এ'রকম একত্ববুদ্ধি সকলের হয়।

তবে ভেদবুদ্ধি কি সহজে যায়! আমরা সকলে কোন-না-কোন বাসনার দাস। বাসনা থেকে ভোগ আসে আর ভোগ থেকে যত দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি। তাই বাসনাই সংসারের মূল। বাসনা আছে ব'লে মানুষ বারবার দুঃখ-কষ্টের সংসারে যাওয়া-আসা করে। সেজন্য বাসনা গেলে সব গ্যালো। তখন মুক্তি করামলকবৎ।

মানুষের বাসনা বিচিত্র রকমের! একটা বাসনার পিছনে আরো কতো সহস্র সহস্র বাসনা লুকিয়ে থাকে। যেমন হিংচের দল একটা ধরে টানলে সবগুলো একসঙ্গে আসে। এক বাসনা পরিপূরণ করলে আর এক বাসনা এসে হাজির হয়, সেটা পূর্ণ করলে তো আবার একটা এলো। এ'রকম ক'রে বাসনার আর শেষ হয় না, একটার

পর একটা চলতেই থাকে। জ্ঞানীরা তাই বাসনাকে দূর করতে বলেন। বাসনাকে প্রশ্রয় দিলে বাসনা বাড়ে বই কমে না। ভোগের দ্বারা কখনো ভোগ দূর হয় না, ভোগকে দূর করতে হোলে তাই ত্যাগ চাই। ত্যাগের দ্বারাই একমাত্র ভোগের পারে যাওয়া যায়। ত্যাগেই একমাত্র শান্তি। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ—ত্যাগ বা বৈরাগ্যের দ্বারাই একমাত্র অমৃতত্ব কিনা আত্মজ্ঞান লাভ হয়,—ভোগে নয়।

বাসনা দু'রকম—শুদ্ধা ও মলিনা। শুদ্ধা বাসনা মুক্তির কারণ আর মলিনা বাসনা বন্ধনের কারণ। শুদ্ধা বাসনাই শ্রেষ্ঠ, কারণ শুদ্ধা বাসনা থেকে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদয় হয়। তবে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে শুদ্ধাও বাসনা আবার মলিনাও বাসনা। তাই জ্ঞানীরা বিচার ক'রে দুটোকেই ত্যাগ করেন। জ্ঞানীদের মতে একমাত্র নির্বিশেষ চৈতন্যই নিত্য ও অনুভূতির বিষয়।

যীশুখৃষ্ট বলেছেন : "Return good for evil, and bless them who curse you" (কেউ তোমার অনিষ্ট চিন্তা করলেও তুমি তাঁর ইষ্ট করবে ; কেউ যদি তোমায় অভিসম্পাৎ দেয় তুমি তাকে আশীর্বাদ করবে)। এ' অত্যন্ত উচ্চ ভাব। 'এক গালে চড় মারলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও'—যীশুখৃষ্টের এ'নীতি কটা লোক আর পালন করে। মহাত্মা গান্ধীর principle-ও (নীতিও) তাই, তাঁর non-violence principle-ও (অহিংসনীতি) আর ক'জন অনুসরণ করে। কেউ হাজার অত্যাচার করুক, তুমি সহ্য করো, প্রতিবিধান করবে না—এ' নীতিই বা ক'জন লোক ঠিক ঠিক follow (অনুসরণ) করতে পারে। শুধু বাইরে দেখালে চলবে না, আন্তরিকভাবে অহিংস হোতে হবে,—both outwardly and inwardly (ভিতরে ও বাইরে)। আসল কথা practice (অভ্যাস বা কাজ) চাই, আন্তরিকভাবে চেষ্টা চাই, সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহ্য করার শক্তি দরকার, তবেই

freedom (স্বাধীনতা বা মুক্তি)। নইলে নামে মাত্র ত্যাগী হোলে আর কি হবে।

• সন্ন্যাসীদেরও তাই। সাধুদের গেরুয়া ত্যাগের symbol (চিহ্ন)। কিন্তু অন্তরেও ঠিক ঠিক ত্যাগ বা সন্ন্যাস হওয়া চাই। বাইরে কাপড় রঙালে হবে না, ভিতরটাও রঙাতে হবে। বাড়ী-ঘরদোর ও বাপ-মাকে ছেড়ে যদি সন্ন্যাসীদের জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্য না আসে, সন্ন্যাসী হোয়েও লোকের দ্বারে দ্বারে যদি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয় তাহোলে সন্ন্যাসী হোয়েই বা লাভ কি। ভগবান লাভ করার জন্যই তো বাড়ী-ঘর ছাড়া। সংসারে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে ভগবচ্চিন্তা হয় না ব'লেই তো সংসার ত্যাগ ক'রে আসা। সংসারে বাধাবিঘ্ন ও অন্তরায় অনেক, তার ওপর favourable environment (অনুকূল পরিবেশ) পাওয়া যায় না, তারি জন্য মঠে আশ্রমে আসা। কিন্তু মঠে আশ্রমে এসেও যদি তোমাদের মনের ভিতর বাসনা ও ভোগের স্পৃহা গজ্ গজ্ করে তাহোলে কি বা আর করলে! একুলও গেল, ওকুলও গেল। না হোলে সন্ন্যাসী, না হোলে একজন আদর্শ গৃহস্থ। সন্ন্যাসীদের সর্বদা তাই হুঁসিয়ার হোতে হয়। অন্তরে ঠিক ঠিক ত্যাগ করা হোল কিনা বিচার করতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এ'যুগে নতুন ধরনের সন্ন্যাসী ক'রে গ্যাছেন। আমাদের না আছে মাথায় জটা, না আছে গায়ে ছাইমাখা বা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দিব্যি বাবুটির 'মতো, বোঝার জো নেই সত্যিই সন্ন্যাসী কিনা। শ্রীশ্রীঠাকুর এ'যুগে এটাই দেখিয়ে গেলেন। তিনি নিজে নরুণপেড়ে কাপড় পড়তেন আর বার্ণিশকরা চটি জুতো পায়ে দিতেন। লোকে কত কি বলতো যে রামকৃষ্ণ আবার অবতার—হংস আর হংসী। কিন্তু তিনি সে সব কথায় কর্ণপাত করতেন না। এ'যুগে এ' রকমই। আমাদেরও তাই। দেখনা খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, ফিটফাট—যেন রাজা উজির আর কি। অন্তরের ত্যাগই

ত্যাগ, বাইরের ত্যাগ তো ভেক। আবার ত্যাগীরাই ঠিক ঠিক ভোগ করতে পারে। লোকে যে যাই বলুক না কেন, তোমরা (সন্ন্যাসীরা) এ'যুগের আদর্শই মানবে। মনে বল ও সাহস, শরীরে শক্তি, হৃদয়ে উৎসাহ, অন্তরে যথার্থ ত্যাগ ও বৈরাগ্য ও ভগবানের ব্যাকুলতা—এই হোল এ'যুগের আদর্শ। শ্রীশ্রীঠাকুর এ'যুগে এটাই তো দ্যাখাতে এসেছিলেন। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গ্যালেন যথার্থ ত্যাগ ও ব্যাকুলতা কাকে বলে। তোমাদের আদর্শও তাই হওয়া উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর ideal (আদর্শ) আর তোমরা সেই ideal-কে (আদর্শকে) অনুসরণ করবে। তোমাদের প্রত্যেকের জীবন ঠিক তাঁরই মতো হবে। ভগবানলাভ এ'জীবনেই করতে হবে। এ'জীবন নষ্ট হোলে আবার কতদিন হয়তো বৃথা চলে যাবে। তাই কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ, কি জ্ঞানী ও কি ভক্ত সকলেরই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ follow (অনুসরণ) করা উচিত। এ'যুগে এ'রকম (পূর্ণ আদর্শবান অবতার সত্য আর কখনো আসে নি। বাক্য, মন ও জীবন দিয়ে এটাই দেখিয়ে গ্যালেন যে ভগবানলাভই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, আর যা-কিছু সব গৌণ। ঈশ্বরলাভ করতে হবে—তা যে পথ দিয়েই হোক। তিনি নিজে তাই সকল রকম পথে সাধনা ক'রে দেখলেন এবং দ্যাখালেন যে সব পথের—সব সাধনার ভিতর দিয়ে সেই এক সচ্চিদানন্দসাগরে পৌঁছানো যায়। তাই উঠেপড়ে লাগো,, একমূহূর্তেও বৃথা কাজে ও বাজে কথায় আরনষ্ট করো না। সময়ের দাম অনেক। ভগবানলাভ এই জীবনেই করতে হবে এ'রকম প্রতিজ্ঞা করো। তবেই জীবন সার্থক হবে। তবেই তোমাদের 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা' হবে !

॥ উপনিষদ্ ॥

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৪

(বুধবার, বৈকাল সাড়ে পাঁচটা)

॥ উপনিষৎ ॥*

বৈদিক যুগে সমাজে প্রতিমাপূজার প্রচলন ছিল না, প্রকৃতির পূজা থেকেই দেবতাদের উপাসনা কল্পিত হোত। ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতা, বরুণদেবতা, মিত্রদেবতা, অগ্নিদেবতা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এ'দের কাছে মানুষ বৃষ্টি প্রার্থনা করছে, শস্য প্রার্থনা করছে, গৃহ-পালিত পশু প্রভৃতি প্রার্থনা করছে। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল, যজ্ঞে হবি আহুতি দেওয়া হোত, যজ্ঞাগ্নিতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি দেবতাদের আহ্বান করা হোত। দেবতারা অগ্নিমুখে হবি ও দ্রব্যাদি গ্রহণ করতেন। চারজন চারজন ক'রে ষোল জন ঋত্বিক্ থাকতেন। তাদের মধ্যে সামগ-ঋত্বিক্ সামগান করতেন। সামগানে দেবতারা, মনুষ্য, পশুপক্ষী সকলে পরিতুষ্ট হোত। আকাশে সূর্য মিত্রদেবতা। তিনি সকলের বন্ধু বলে মিত্র। সূর্যদেবতা থেকে মিতা—মিতু বা ইতুদেবতার পূজা মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হয়। তখন পশুযাগেরও প্রচলন ছিল। যূপে পশুদের হত্যা করা হোত। যূপকে সূর্যের অধিষ্ঠান বা আসন বলে পূজা করা হোত। যূপের স্থানে পরে স্তূপপূজার প্রবর্তন হয়। বৌদ্ধযুগে স্তূপের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বুদ্ধদেবের অনুকল্পরূপে স্তূপের পূজা হোত।

বৈদিক যুগে সূর্য ও অগ্নিপূজা প্রকৃতির পূজা বলে গণ্য ছিল। অথর্ববেদীয় মুণ্ডক-উপনিষদে (২।১।৪) আছে।

---

* কঠ-উপনিষদের আলোচনা।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা কল্পিত। যজ্ঞাগ্নির এরা সাতটি শিখা। মুণ্ডকে (১।২।২) আছে,

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়া হুতম্ ॥

'প্রজ্বলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয় তখন আজ্য ভাগদুটির মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত আহুতি দেবে'। এখানে অগ্নিহোত্র-যাগের কথা বলা হয়েছে। মুণ্ডকের তৃতীয় শ্লোকে (১।২।৩) দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, আগ্রয়ণযাগ, বৈশ্বদেবযাগ প্রভৃতির কথা আছে। মুণ্ডকে (২। ১।৮) সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অর্চি, সপ্ত হোম ও সমিধের কথার উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে সূর্যকে লোকে দেবতা, ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে উপাসনা করতো। পরে সূর্যের স্থান অধিকার করে অগ্নি। সূর্যের প্রতীকরূপে যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ আহুতি দেওয়া হোত। সূর্যকে তখন কল্পনা করা হোত আকাশস্থ বা দ্যুলোকের অগ্নি, অন্তরীক্ষের অগ্নি, পৃথিবীস্থ অগ্নি ইত্যাদি রূপে। অগ্নি যে সূর্যের প্রতীক তা উপনিষৎ বোঝা থেকে যায়। মুণ্ডক-উপনিষদে (১।২।৫) আছে: "এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু, যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো * *",—অর্থাৎ অগ্নিহোত্রযাগের সময় অগ্নির সাতটি শিখায় যজমান যে আহুতি দেবেন সে' আহুতিগুলি যথাসময়ে সূর্যরশ্মির পথে তাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করে। উপনিষদে আবার আছে (১।২।৬): "এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ, সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি,"—দীপ্তিমতী আহুতিগুলি 'এস এস' বলে

আহ্বান ক'রে ও যজমানকে সূর্যরশ্মি দিয়ে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। উপাসকেরা অগ্নিশিখা ও সূর্যরশ্মিকে অভিন্নরূপে কল্পনা করতো।

• ঈশোপনিষদে 'হিরণ্ময় পাত্র' বলে সূর্যকে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে : "হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্",—হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আবরণ দিয়ে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত করা আছে। তাই প্রার্থনা করা হয়েছে,

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্যপ্রাজাপত্য-
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ॥

'হে জগৎপরিপালক সূর্য, তোমার রশ্মিসমূহ অপসরণ করো। তীব্র তেজ সঙ্কুচিত করো, আমি তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করি। ঐ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আমার স্বরূপ'। এখানে সূর্যকে আর জড় ব'লে কল্পনা করা হচ্ছে না। সূর্যে চৈতন্য আরোপ করা হয়েছে, সূর্য তাই এখানে প্রাণবান ও চৈতন্যময় পুরুষ। সুতরাং জড় থেকে চৈতন্যের—স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বা কারণের ধারণা তখন সমাজে প্রচলিত হয়েছে। সূর্য ও অগ্নি যে এক এই ধারণাও তখন সমাজে দৃঢ়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে : "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ;"—'হে অগ্নি, তুমি আমাদের সুপথে নিয়ে চলো'। অগ্নি এখানে সূর্য, অর্থাৎ অগ্নিকেই সূর্য বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

বৈদিক যুগে হয় সূর্যের উপাসনা—নয় যজ্ঞাগ্নিতে হোম করার বিধি ছিল। সূর্যের উপাসনার সঙ্গে প্রকৃতির উপাসনাও প্রচলিত ছিল। প্রকৃতি অর্থে উষা, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা—সূর্যের তিন অবস্থা। সূর্যোপাসনার প্রতীক অগ্নি-উপাসনা। হিন্দুরা বৈদিক যুগে যা করতো এখন পারসীকেরা (Persians) জেন্দাবেস্তা নিয়ে প্রায় তাই করে। পারসীকদের দেবতা অগ্নি। এখনো মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে সাগ্নিক

ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন কালের মতো যজ্ঞের অগ্নি রক্ষা করে। প্রাতঃকালে অগ্নিতে আহুতি দান না ক'রে তারা জলগ্রহণ করে না। পারসিকদেরও Eternal Fire (অনন্তকালস্থায়ী অগ্নি) আছে। সাগ্নিক অগ্নিহোত্রীরা যেমন পুরুষানুক্রমে প্রাচীন কাল থেকে যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করে, পারসীকরাও তাই। বোম্বাইয়ে আমি পারসীকদের Fire Temple (অগ্নি-মন্দির) দেখেছি। সেখানে একটি Alter-এ (বেদীতে) অগ্নি রাখা আছে, সেটাই তাদের Eternal Fire (অনাদিকাল ধরে রক্ষিত অগ্নি)। Fire বা অগ্নি জ্ঞানের symbol প্রতীক। সূর্যপূজা থেকে অগ্নিপূজার প্রবর্তন হয়। Intellectual period-এ (বৌদ্ধিক বা উপনিষদের যুগে) philosophical interpretation (দার্শনিক অর্থ) হিসাবে অগ্নিকে লোকে জ্ঞানের সঙ্গে compare (তুলনা) করতো।

উপনিষদের যুগে বাহ্যপূজার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর পূজার প্রবর্তন হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষৎই তার প্রমাণ। ছান্দোগ্যের অষ্টম প্রপাঠকে প্রশ্ন করা হয়েছে : "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ, কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যম্"। তার উত্তরে বলা হয়েছে : "যাবান্ বা অয়মাকাশঃ, তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি"। বাইরের ভৌতিক আকাশ আর মানুষের দেহের মধ্যে দহরাকাশ (হৃদয়াকাশ) একই।

বাইরের স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমস্তই মানুষের শরীরের মধ্যে। তাছাড়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের যা-কিছু বাহ্য উপাদান সব মানুষের শরীরে। সুতরাং মানুষের দেহের মধ্যে আকাশকে উপাসনা করলে বাইরের বিরাট প্রকৃতির উপাসনা করা হয়। দিগন্তবিস্তারী আকাশকে পরে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা হয়েছে। উপনিষদে পাওয়া যায় : "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং

পুণ্ডরীকম্”।[২] উপনিষৎ ব্রহ্মপুররূপ দহর বা হৃদয়কে ‘গুহা’, ‘গহ্বর’ ইত্যাদি বলে নির্দেশ করেছে। মুণ্ডক্-উপনিষদে আছে: “পস্যৎস্বি-হৈব নিহিতং গুহায়াম্’।[৩] কঠোপনিষদে আছে। “* * তমেতন্নিহিতং গুহায়াম্”।[৪] তাছাড়া শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মাকে ‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ’ বলে কল্পনা করা হয়েছে: “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ”। এই পুরুষাত্মাই “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতে গুহায়াম্”। আত্মাকে সর্বব্যপী কল্পনা করেও ‘অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্’ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের ধারণা স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, এবং সূক্ষ্ম থেকে কারণে, অথবা জড় থেকে ক্রমশ চৈতন্যের দিকে বিকশিত।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে! অশ্ব বা প্রজাপতির শির উষা, চক্ষু সূর্য, বায়ু প্রাণ: “উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্যশ্চক্ষুঃ, বাতঃ প্রাণঃ”। অশ্বমেধকে সূর্যও বলা হয়েছে। যেমন: “এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, তস্য সংবৎসর আত্মা; অয়মগ্নিরর্কঃ”। সূর্যের উপাসনা থেকে কালে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের সৃষ্টি একথা বেশ বোঝা যায়।

‘প্রতিমা’* প্রতীক-উপাসনা থেকে এসেছে। প্রতিমাপূজা বৈদিক যুগের পরে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত বলে মনে হয়। ‘পূজ্’ ধাতু থেকে ‘পূজা’-র উৎপত্তি। উপনিষদের যুগে ওঙ্কার, গায়ত্রী প্রভৃতি প্রতীক-উপাসনার প্রচলন ছিল। ছান্দোগ্যের প্রথম মন্ত্র হোল: “ওমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত”,—অর্থাৎ ‘ওম্’ এই অক্ষরকে ব্রহ্মের নাম মনে ক’রে উপাসনা করবে। ওঙ্কারের ব্যাখ্যা বা মাহাত্ম্যও (‘তস্যোপব্যাখ্যানম্’) বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক উদ্গান অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে গানের পূর্বে ওঙ্কার উচ্চারণ করা হোত। তৈত্তিরীয়-উপনিষদে ওঙ্কারকে ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়েছে, যেমন

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। * * ওমিতি সামানি গায়ন্তি"।[৯] মাণ্ডুক্য-উপনিষদেও তাই। ছান্দোগ্য-উপনিষদে আকাশস্থ সূর্যকে উদ্গীথ বা ওঙ্কার বলে উপাসনা করার উপদেশ আছে।[১০] ওঙ্কার বৈদিক উপাসনায় ব্রহ্মের প্রতীক। তন্ত্রে ওঙ্কারের অনুকরণ ক'রে হ্রীং শ্রীং ক্রীং ইত্যাদি বীজমন্ত্রের সৃষ্টি। তন্ত্র বেদের পরিপূরক। পরের যুগে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রে বৈদিক ও তান্ত্রিক দু'রকমের ওঙ্কার ও বীজমন্ত্র ব্যবহার করেছেন। শক্তি-উপাসনার বীজ বেদেতে আছে। দেবীসূক্তে আছে,

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যা বেশয়ন্তীম্॥

ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে ক'রে ধ্যান করতে হয়। নির্গুণের কখনো ধ্যান হয় না, যার নাম-রূপ আছে তাই ধ্যানের বিষয়। নির্গুণের নাম-রূপ নেই, সুতরাং তাকে কি ক'রে ধ্যান করবে বলো। তবে ওঙ্কাররূপ বাচক বা প্রতীকের সাহায্যে নির্গুণের ধ্যান করার বিধি আছে: "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। বেদান্তে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে। শ্রবণ মানে শোনা নয়—বিচার করা। সর্বদা নেতি নেতি ক'রে বিচার করার নাম শ্রবণ। Negative way বা নেতিমার্গে বিচার করার উপদেশ একমাত্র বেদান্তই দিয়েছে।

সগুণব্রহ্মের ধ্যান সহজসাধ্য। পাতঞ্জলদর্শনে সূর্যাদিতে মনঃসংযোগ করার কথা আছে।[১১] মহাপুরুষদের শুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ে মন স্থির করার কথা বলা আছে।[১২] অন্তঃকরণের ভিতর একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে সেটা empty space (খালি স্থান)। সাধকেরা তাকে আত্মার স্থান বলেন। হৃদয়কে পদ্মের কুঁড়ির সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে: 'দহরং পুণ্ডরীকম্'—অর্থাৎ হৃৎপদ্ম। উপনিষদে হৃদয়-

পুণ্ডরীকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপী আত্মাকে চিন্তা করার উপদেশ আছে। হৃদয়পুণ্ডরীক আত্মার প্রতীক। বৌদ্ধেরা পদ্মাসনস্থিত বুদ্ধকে ধ্যান করেন। 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' কিনা পদ্মের মধ্যে যিনি মণি অর্থাৎ বুদ্ধদেব সে বুদ্ধদেবকে তাঁরা ধ্যান করেন। মহাপুরুষদের হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র, তাই তাঁদেরও হৃদয়ে মনঃসংযোগ করলে সহজে চিত্ত স্থির হয়। সিদ্ধ বা অবতারকল্প মহাপুরুষদের মূর্তিতে বা হৃদয়ে ধ্যান করার কথাও সাধকেরা বলেন।

হৃদয়ে যেমন ধ্যান করার কথা আছে, আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ ভ্রূর মাঝখানে তেমনি ধ্যান করার উপদেশ আছে। আজ্ঞাচক্র গুরুর স্থান। ওখানে যোগীরা দু'দলবিশিষ্ট পদ্মের পিছনে দ্বাদশ দলবিশিষ্ট একটি পদ্মের কল্পনা করেন। শুভ্র জ্যোতির্ময় গুরু বা ইষ্টমূর্তিকে সেখানে ধ্যান করতে হয়। গুরু ও ইষ্ট এক। গুরু মানে রক্তমাংস-বিশিষ্ট মানুষ নন, তিনি চৈতন্যময় পুরুষ। ইষ্টও তাই। গুরু আর ইষ্টে তাই ভেদ করতে নেই। শুভ্র জ্যোতির্ময় গুরু বা ইষ্টমূর্তি তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন এভাবে সর্বদা ধ্যান করবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে জপের অর্থ ভাবনা করা দরকার : "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"।[১৩] ভাবনার নামই মনন ও ধ্যান। নাম আর নামী এক ও অভিন্ন ভাবতে হয়। ধ্যানের সময়ও সর্বদা বিচার অর্থাৎ জ্ঞান থাকবে। ধ্যান তাই conscious (জ্ঞানসহ) হওয়া চাই। জ্ঞান মানে বিচার। বিচারহীন ধ্যান নিদ্রার সামিল। ধ্যানের সময় মাঝে মাঝে যে মন vacant (খালি) হয় তার মানে ধ্যানের বিষয়ে সাধকের মন স্থির হয়নি। অহরহঃ তাই বিচার আর অভ্যাস দরকার। বিচারযুক্ত ধ্যান না হোলে আত্মদর্শন হয় না। ধ্যান কখনো black (শূন্য) হয় না, তাই বিষয় তার একটা থাকেই আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়ে বিচারও থাকে।

হৃদয়ে আত্মা বা পুরুষের যেমন স্থান নির্দেশ করা হয়, তেমনি অনেকে মস্তকেও আত্মার স্থানের কথা বলেন। যোগীরা মস্তকে সহস্রার-

পদ্মের কল্পনা করেন। সহস্রার কিনা সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম। পদ্মও সাধকদের ভাবনা বা কল্পনা। সহস্রারপদ্মে যোগীরা পরমশিবের স্থান চিন্তা করেন। পরমশিব pure consciousness (শুদ্ধচৈতন্য।) যোগীরা পরমশিবকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ উপলব্ধি করেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারও দর্শন হয়। আসলে এ'সব ভাবজগতের খেলা।

মাথায় (brain) মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা consciousness বা knowledge-এর (সম্বিৎ অথবা জ্ঞানের) স্থান নির্দেশ করেন। মস্তিষ্কেও একটা empty space (শূন্যস্থান) আছে। ঐ space-এর (স্থানে) আকাশে তেজোদ্দীপ্ত আত্মা থাকেন বলে অনেকে চিন্তা করেন। ঐ space-এর (স্থানের) lacation (স্থান নির্দেশ) হোল ঠিক মাথার ব্রহ্মতালু (ব্রহ্মরন্ধ্র) থেকে যদি একটা 'আলপিন সোজাসুজি ভাবে চালিয়ে দাও এবং আর একটা আলপিন medulla oblongata (সুষুম্নাশীর্ষক বা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী যেখানে ঘাড়ে গিয়ে মিশেছে) ভেদ ক'রে চালাও তবে ছুটো আলপিন যেখানে meet করবে (মিশবে) সে স্থানটাই সাধারণত ঐ space-এর (স্থানটার) location (স্থিতি-ক্ষেত্র)। বেদান্তের মতে জ্ঞানবিচার ছাড়া কেবল কল্পনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। বেদান্তের মতে জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির কারণ। জ্ঞান কিনা আত্মজ্ঞান। 'আমি জীব নই—আত্মস্বরূপ' এই স্থিরবুদ্ধি বা clear determination-এর (পূর্ণনিশ্চয়তা বা নির্ধারণের) নাম আত্মজ্ঞান। এখানে determination মানে realisation (নিশ্চয়তা মানে উপলব্ধি)। আত্মজ্ঞান হোলে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ',—হৃদয়ের সকল গ্রন্থি খুলে যায় ও সকল সংশয় দূর হয়। নইলে কোন কিছুর দর্শন হোলে বা একটু আধটু শক্তি লাভ করলে এর দ্বারা যথার্থ মুক্তি লাভ হয় না।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪

(শুক্রবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা)

কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে আছে। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ জরাজীর্ণ কতকগুলি গাভী ব্রাহ্মণদের দান করতে উদ্যত তখন নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন: পিতা, আপনি কি আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক্‌দের উদ্দেশ্যে দান করবেন? নচিকেতা ভাবলেন আমাকেও দান করলে পিতার যদি কোন উপকার করা হয় তাহোলে তাই হোক। নচিকেতার পিতা প্রথমে পুত্রের কথার কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু নচিকেতা বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করতে পিতা ক্রুদ্ধ হোয়ে শেষে বল্লেন: 'আমি তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করলাম'।

একথা বলার জন্য পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, কিন্তু নচিকেতা পিতার কথা রক্ষা করার জন্য যমলোকের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। নচিকেতা যমলোকে উপস্থিত হোয়ে শুনলেন যমরাজ উপস্থিত নেই, কাজেই যমপুরীর বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনদিন উপবাস ক'রে থাকার পর যমরাজ ফিরে এলেন। যমরাজকে অমাত্যেরা বললো: 'অতিথি দ্বারে সমাগত, তাঁর অভ্যর্থনা করা উচিত'। যমরাজ অতিথিকে আহ্বান করার জন্য নচিকেতার সম্মুখে উপস্থিত হোয়ে বললেন: 'হে অতিথি, আপনি তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস আছেন, আমি তাই দুঃখিত। আপনি এর জন্য তিনটি বর আপনার ইচ্ছামত প্রার্থনা করুন'। নচিকেতা পরম-আনন্দিত হোয়ে যমরাজের কাছে প্রথম বর প্রার্থনা করলেন এই বলে: 'আমার পিতা গৌতম যেন আমার জন্য কোন শোক না করেন ও আমার উপর তিনি প্রসন্ন

হন। তারপর এই যমলোক থেকে ফিরে গেলে তিনি যেন আমায় পুত্র বলে আবার চিনতে পারেন'। যম 'তথাস্তু' বলে নচিকেতাকে প্রথম বর দান করলেন। নচিকেতা আবার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করলেন এই বলে : 'হে মৃত্যু ; শুনেছি স্বর্গলোকে জরা-ব্যাধি বা কোন রকম দুঃখ-কষ্টের লেশ নেই। যে অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ করলে স্বর্গলোক লাভ হয় তার যথার্থ স্বরূপ আপনি অবশ্যই জানেন, আপনি আমায় সেই অগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করুন'। যমরাজ আবার 'তথাস্তু' ব'লে বর দান করলেন। যমরাজ বল্লেন : 'হে নচিকেতা, সত্যই আমি স্বর্গের সাধনরূপ অগ্নিতত্ত্বের বিষয় জানি। সেই অগ্নি যেমন বাইরে তেমনি লোকের অন্তরেও অধিষ্ঠিত। অগ্নি সমগ্র জগতেরও কারণ'। যমরাজ যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নি-চয়নের প্রণালীবিষয়ে নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন। নচিকেতা তা শুনে যথাযথ আবৃত্তি করলেন। নচিকেতার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দর্শন ক'রে যমরাম নচিকেতাকে আরো একটি বর (চতুর্থ বর) দেবার জন্য প্রতিশ্রুত হলেন ও বল্লেন : 'হে নচিকেতা, যে অগ্নিবিদ্যা তোমাকে আজ উপদেশ করলাম সে অগ্নির নাম তোমার নামেই এখন থেকে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করুক। তুমি রত্নময়ী এই 'সৃঙ্কা' অর্থাৎ মালা গ্রহণ করো'।

নচিকেরা বর গ্রহণ করলে যমরাজ বল্লেন : "তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীস্ব",—হে নচিকেতা, তুমি এবার তৃতীয় বর প্রার্থনা করো। নচিকেতা যমরাজের আদেশ শিরোধার্য ক'রে তৃতীয় বর প্রার্থনা করলেন এই বলে :

যেয়ং প্রেতে বিচিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

'হে মৃত্যুরাজ, মানুষ মরে গেলে কেউ কেউ বলেন আত্মা পরলোকগামী হয়; কেউ কেউ আবার তা অস্বীকার করেন। আমি এ'তত্ত্ব এখন জানতে ইচ্ছা করি। আপনি এই তত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ দান ক'রে আমার সংশয় দূর করুন। এটাই আমার তৃতীয় বর'।

মানুষ মরে গেলে তার আত্মা থাকে কি-না এ'সন্দেহ সবার মধ্যে আসে। ভারতে এবং পৃথিবীর সকল দেশে জড়বাদী ও ইহসর্বস্ববাদী যারা তারা দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও ধ্বংস হয় একথা স্বীকার করে। উদাহরণ যেমন চার্বাক। চার্বাকদের মতে ইহলোকই সর্বস্ব, পরলোক বলে কিছু নেই। জড়দেহটাকে তারা আত্মা বলে, সুতরাং তাদের মতে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে না। নানান মতামত ও সংশয় থাকার জন্য নচিকেতা যমরাজকে তৃতীয় বর হিসাবে এ'প্রশ্ন করলেন যে দেহের নাশ হবার পরও আত্মা সত্য সত্য থাকেন কিনা। যমরাজ কিন্তু প্রথমে এ'তত্ত্ব উপদেশ দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বল্লেন,

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
ন হি সুবিজ্ঞেয়মনুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব,
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥[১৬]

'হে নচিকেতা, দেবতাগণ ইতঃপূর্বে এ'বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, এ'তত্ত্ব শুনে সাধারণ লোক কোন-কিছু বুঝতে পারে না, কারণ ধর্ম অর্থাৎ জগতের অধিষ্ঠানরূপ আত্মা স্বভাবতই অণু কিনা দুরধিগম্য, সুতরাং তুমি অন্য বর প্রার্থনা করো, এ'সম্বন্ধে আর অনুরোধ ক'রো না'।

নচিকেতা যমরাজের কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, কারণ "দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল",—দেবতারা পর্যন্ত আত্মা আছে কি নাই এ'বিষয়ে সন্দেহ করেন। যমরাজ মৃত্যুর অধীশ্বর ও নিয়ন্তা

হোয়েও বলছেন যে আত্মতত্ত্ব অনায়াসে বোঝা যায় না, অথচ "বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যঃ"। নচিকেতা তাই যমরাজের অনুরোধে সম্মত না হোয়ে বল্লেন: "নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ",—'হে যমরাজ, এর চাইতে ভাল বর প্রার্থনা করার আর কিছু নাই এবং তোমার চেয়ে এ'সম্বন্ধে আর কোন উপযুক্ত বক্তা নাই, সুতরাং এ' বরই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি'।

যমরাজ সত্যই এবার বিপদে পড়লেন। ভেবেছিলেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিষেধ করলে নচিকেতা এ'বর চাইবে না, কিন্তু দেখলেন নচিকেতা ছাড়বার পাত্র নয়। তাই প্রলোভন দেখিয়ে এবার পরীক্ষা করার জন্য যমরাজ বল্লেন,

শতায়ুঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব,
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥[১৭]

'হে নচিকেতা, তোমায় আমি অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বর দান করছি। তুমি শতবর্ষজীবী পুত্র-পৌত্র, গবাদি পশু, হস্তী, সুবর্ণ ও অশ্বসমূহ প্রার্থনা করো। তুমি বিরাট সাম্রাজ্য প্রার্থনা করো আর নিজেও যতকাল ইচ্ছা পৃথিবীতে বেঁচে থাকো। কিংবা—

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥[১৮]

'যদি এ' ধরনের অপর কোন বর প্রার্থনা করতে চাও তো তাও গ্রহণ করো। তাছাড়া দীর্ঘজীবন ও জীবনরক্ষার জন্য টাকা-কড়ি বা বিষয়-সম্পদও তুমি চাইতে পার। অথবা তুমি সম্রাট হোতে

ইচ্ছা করো তো আমি তোমায় স্বর্গের ও পৃথিবীর যাবতীয় কাম্যফলও দান করতে প্রস্তুত আছি'।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥[১৯]

যমরাজ পুনরায় নচিকেতার মনকে পরীক্ষা করার জন্য বল্লেন: 'হে নচিকেতা, পৃথিবীতে অথবা মনুষ্যদেহে যে যে কামনা অতি দুর্লভ, তুমি স্বেচ্ছায় সেগুলিও প্রার্থনা করো। ঐ রথে রূপযৌবন-শালিনী ও বাদ্যযন্ত্রধারিণী যে সব পরমাসুন্দরী অপ্সরা আছে তাদের লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তা সত্বেও আমার বরে তারা তোমার পরিচর্যা করবে। তুমি তাদের সকলকে নিয়ে পরমসুখে কালযাপন করো, কিন্তু মৃত্যুসম্বন্ধে বা মৃত্যুর পর আত্মার সত্বা থাকে কিনা এ'সব নিয়ে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না, কারণ এ'তত্ত্ব অতীব গোপনীয় ও রহস্যপূর্ণ'।

বালক নচিকেতা যমরাজের কথা এ'পর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি যমরাজকে বরং বিনীতভাবে বল্লেন,

শ্বোভাবা মর্তস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥[২০]

'হে মৃত্যুপতি, আপনি পুত্র, অপ্সরা, ঐশ্বর্য প্রভৃতি ভোগ্যদ্রব্য

আমায় দান করতে চাচ্ছেন, কিন্তু এসব আজ আছে কাল নেই—অনিত্য, সুতরাং এ'সকল ভোগ্যদ্রব্য নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতেও ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষয় হয়, কাজেই ওসবে আমার দরকার নাই। মানুষের জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কবে কার মৃত্যু হবে তার কোন স্থিরতা নেই, কাজেই রথ, হস্তী, অশ্ব, অপ্সরাকুল, ঐশ্বর্য ও নৃত্য-গীত এসব আপনারই থাকুক, আমার এ'সকলে প্রয়োজন নাই'।

আসলে বিষয়ভোগ মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ভোগ মানেই বাসনার চরিতার্থ করা। কিন্তু বাসনার চরিতার্থতা কখনো ভোগ দিয়ে হয় না, ত্যাগই বাসনাচরিতার্থের একমাত্র উপায়। ত্যাগেই শান্তি—ভোগে নয়। তারপর কামকাঞ্চনরূপ ভোগ তো মায়া এবং মায়া বন্ধনের কারণ। মায়া আত্মবিস্মৃতি আনে ও মানুষকে জন্মমৃত্যুর নাগপাশে চিরদিন বদ্ধ করে। কাজেই কাম-কাঞ্চনরূপ মায়াকে সাধকমাত্রের ত্যাগ করা উচিত। বিবেক-বৈরাগ্যবান নচিকেতা তাই সে'সব ভোগ বা প্রবৃত্তিদায়ক বস্তু গ্রহণ করিতে রাজী হলেন না। তিনি জ্ঞানবানের মতো যমরাজকে আবার বল্লেন,

> ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যা-
> লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা।
> জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
> বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥[২১]

'হে যমরাজ, প্রচুর ধন-সম্পত্তি পেয়েও মানুষের আশা কোনদিন পরিতৃপ্ত হয় না, 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব'—আগুনে ঘি ঢালার মতো ভোগের বাসনা ক্রমশ বেড়ে চলে। বিশেষত আমি যখন আপনার মতো একজন জ্ঞানী মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেছি তখন ধন-সম্পত্তি, দীর্ঘায়ু এ'সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমার কি হবে। আপনি আয়ু বা প্রাণের নিয়ন্তা, সুতরাং আপনার প্রসাদে আমার দীর্ঘায়ু লাভ তো

হবেই, সুতরাং আমি অন্য বর আর চাই না, আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিন'।

• ঐশ্বর্য বা টাকাকড়ি কখনো মানুষের প্রাণে যথার্থ শান্তি দিতে পারে না। যার হাজার টাকা আছে, সে দশ হাজার টাকা পেতে ইচ্ছা করে, লক্ষপতি চায় কোটীপতি হোতে, কুঁড়েঘরে শুয়ে গরীবও স্বপ্ন দেখে রাজা হবার জন্য। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার সসাগরা পৃথিবীর রাজ্য জয় করেও পরিতৃপ্ত ছিলেন না। বামন আকাশের চাঁদধরার আশাকে ত্যাগ করতে পারে না, সুতরাং বিত্তের দ্বারা তর্পণ করলে ভোগপিপাসার কোনদিন শান্তি হয় না। শান্তি একমাত্র ত্যাগেই। ত্যাগের অর্থ বাসনার ত্যাগ। ত্যাগই যথার্থ অমৃতত্ব বা অমরত্ব দিতে পারে। নচিকেতা যমরজের প্রলোভনে মোহিত না হোয়ে বললেন : 'ঐশ্বর্য বা ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আমার প্রয়োজন নাই। যদি বরই দিতে হয়, হে মৃত্যুপতি, আমায় আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন। আত্মতত্ত্বই একমাত্র নিত্য ও শাশ্বত'।

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্যঃ ক্বধস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥[২২]

'হে যমরাজ, জরা-মরণশীল মানুষ অমর দেবতাদের সংস্পর্শে এলে জরাদিকেও জয় ক'রে দীর্ঘকাল স্বর্গে বাস করতে পারে একথা সত্য, কিন্তু সেও তো দুঃখের কারণ ও ধ্বংসশীল। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণ এবং বিষয়ের ভোগজনিত সুখ ও স্বর্গের আমোদপ্রমোদ এ'সব অনিত্য, সুতরাং অনিত্য জিনিসকে প্রার্থনা ক'রে আমার কি ফল লাভ হবে। সুখের পর যেমন দুঃখ তেমনি যৌবনের পর জরা আসে। জরাবস্থায় ভোগবিষয়ে শক্তি-সামর্থ্যহীন হোলে তার জন্য অশান্তিও কম হয় না। কাজেই একথা আমি স্থির বুঝেছি যে, মৃত্যু সকল

জীবের শেষপরিণতি, মৃত্যুকে একেবারে কেউ কখনো জয় করতে পারে না। কাজেই,

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥[২৩]

'মৃত্যুর পর আত্মার কি অবস্থা হয় ও আত্মা প্রকৃত তখন থাকেন কিনা এ'সব বিষয়ে সন্দেহ শুধু মানুষের কেন—দেবতাদেরও হয়। সুতরাং পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আপনি আমায় আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ দিন। আত্মতত্ত্বের উপদেশ ছাড়া আমার আর কোন শ্রেষ্ঠ কাম্য নাই, অথচ এই বরটিই আপনি আমার কাছে গোপন করতে চাচ্ছেন। একমাত্র আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ ছাড়া আর অন্য কোন বিষয় আমি জানতে চাই না'।

বাস্তবিক দেবতারাও অমর বা অলৌকিক কিছু নন, তাঁরা আমাদের মতোই জীব, তবে সৎকর্মের জন্য উচ্চ অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু the seed of Divinity is within every individual (অমরত্বের বীজ প্রত্যেকের মধ্যেই আছে)। সাধারণ মানুষ তা জানতে পারে না, তাই নিজেকে বদ্ধ মনে করে, কিন্তু যখনই বোঝে যে সে অমৃত ও আত্মস্বরূপ তখনই তার মায়ার বন্ধন দূর হয়। মায়ার বন্ধন গেলেই তো সব হোল। মায়াই বাসনা, মায়াই সংসার। নাম ও রূপই মায়া। নাম-রূপ নষ্ট হোলে আত্মা 'স্বে মহিম্নি বিরাজতে'—আপনার মহিমায় আপনি প্রকাশিত থাকেন।

কর্মের ফলরূপে দেবতারা দেবত্বপদ লাভ করেছেন। স্বর্গ এই পৃথিবীর মতোই একটা লোক, তবে আমরা কল্পনা করি দুঃখ-যন্ত্রণা সেখানে নেই—কেবলই আনন্দ আর শান্তি। সকল জাতির মানুষের ভিতর স্বর্গসম্বন্ধে কোন-না-কোন ধারণা আছে। আসলে

স্বর্গ ও নরক মানুষের কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়; মানুষই তার চিন্তা, কল্পনা বা ভিতরের ভাব বাইরের জগতে ফুটিয়ে তোলে। পুরাণে এই ধারণা আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা আছে। খৃষ্টানদেরও স্বর্গ ও নরক আছে; তাঁরাও heaven and hell বিশ্বাস করে। তাঁরা বলেন, আদম ও ইভ গোড়ার দিকে স্বর্গে বাস করতো, Satan (শয়তান) ইভকে ভুলিয়ে নিয়ে এলো পৃথিবীর মাটিতে আর ইভের পাপে আদমকে তাই নেমে আসতে হোল। এটাই খৃষ্টানদের সৃষ্টিসম্বন্ধে ধারণা। Satan-ই (শয়তানই) পাপপুরুষ বা মায়া। বুদ্ধদেবকে মার (পাপপুরুষ) যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল আসলে সে মারও Satan বা মায়া। Satan বা মার মনেরই creation (সৃষ্টি), মনের সংস্কার পাপপুরুষ বা প্রলোভনের আকার ধারণ করে। চিন্তা subtle form-এ (সূক্ষ্ম-আকারে) প্রথমে মনের ভিতর প্রথমে ওঠে, তারপর materialized form-এ (স্থূল আকারে) বাইরে তা প্রকাশ পায়। বুদ্ধদেবের মনের evil thought-গুলো (অসৎ চিন্তাগুলো) materialized (স্থূল) হোয়ে বাইরে 'মার'-এর আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। সৎ ও অসৎ উভয় চিন্তা মানুষের মনের subconscious plane-এ (অবচেতন স্তরে) সুপ্ত থাকে, অবসর বা অনুকূল অবস্থা পেলে তারা আবার স্থূল-আকারে প্রকাশ পায়। মার সেই সংস্কার বা মায়া। দেবদেবীপূজার সময় যে ভূতশুদ্ধির বিধি আছে তাতে পাপপুরুষের ধ্যান আছে। পাপপুরুষ আসলে কল্পিত। ভূতশুদ্ধি করার সময় পাপপুরুষকে দগ্ধ করতে হয়। পাপপুরুষ মানুষের মনেরই সঞ্চিত সংস্কার। তাই সংস্কার দগ্ধ বা দূর হোলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও সেই শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিফলিত হন।

সবই আসলে conception (ধারণা) বা ideas (চিন্তা)। স্বর্গ ও নরক এ'সব মনের projection বা construction (সৃষ্টি)। বস্তুত স্বর্গ নেই —নরকও নেই, তারা কেবল সংস্কার বা মায়া। সংস্কার আছে বলেই

নিত্য-নূতন কত-কিছু চিন্তা বা ধারণা আমরা সৃষ্টি করি। সংস্কার বা মায়াকে দূর করার জন্যই তো সাধনা। আত্মা সর্বদাই প্রকাশিত, অজ্ঞান ঢেকে আছে ব'লে আমরা তাকে জানতে বা বুঝতে পারছি না। অজ্ঞান সরে গেলে জ্ঞানসূর্যকে দেখা যায়। সাধন-ভজন কেবল ঐ অজ্ঞানকে সরিয়ে দেবার জন্য,—only to remove the veil of ignorance (কেবল অজ্ঞানের আবরণকে দূর করার জন্য)। যেমন অন্ধকার-ঘরে একটা চেয়ার আছে—তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই প্রদীপ নিয়ে এলে অমনি অন্ধকার সরে গেল, চেয়ারটাকে দেখতে পেলে। চেয়ার তখুনি সৃষ্টি করোনি বা চেয়ারটা আকাশ থেকে পড়ে নি, চেয়ার সেখানে ছিলই, কেবল অন্ধকারের জন্য তাকে দেখতে পাচ্ছিলে না, তাই অন্ধকার সরে গেল আর চেয়ারটা দেখতে পেলে। আত্মজ্ঞান-সম্বন্ধেও তাই। অজ্ঞান-অন্ধকারে আত্মার জ্যোতির্ময় রূপ সর্বদা আবৃত, বিচারের প্রদীপ জ্বেলে যখনই অজ্ঞান-অন্ধকার সরিয়ে দেবে তখনি আত্মা স্বপ্রকাশ হোয়ে উঠবেন। আত্মাকে জানার নামই অপরোক্ষনুভূতি বা দিব্যজ্ঞান।

স্বর্গের সুখ অনিত্য, কেননা তার ক্ষয় আছে। যাগযজ্ঞের যুগে স্বর্গ ছিল মানুষের কাম্য, তাই মীমাংসাশাস্ত্রে 'স্বর্ণকামো যজ্ঞেত' কথার উল্লেখ আছে। সকামভাবে তখন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হোত। সকাম যেমন পুত্র, ঐশ্বর্য, পশু, বৃষ্টি, স্বর্গ এ' সবের জন্য লোকে যজ্ঞ করতো। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাম্য ছিল স্বর্গ। যাগযজ্ঞ থেকে এক রকম অদৃষ্টশক্তি সৃষ্টি হোত, মীমাংসকেরা তাকে বলেছেন 'অপূর্ব' অর্থাৎ আগে ছিল না, যাগকর্ম থেকে সৃষ্টি হোল। অপূর্বই স্বর্গ ইত্যাদি ফল দান করে। স্বর্গে অনন্তকাল সুখ ভোগ করবে এটাই ছিল তখনকার (মীমাংসাযুগের) লোকের ধারণা। শঙ্করাচার্য এসে সে সব একেবারে পাল্টে দিলেন। মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে আহ্বান করা মানেই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী

উভয়ের বিচারে মধ্যস্থ করেছিলেন। উভয়ভারতী বিদুষী ছিলেন। শংকরাচার্যের সঙ্গে তর্কে মণ্ডনমিশ্র পরাস্ত হন। কর্মকাণ্ডের বহু পণ্ডিত তখন পরাস্ত হবার ভয়ে তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও তখন প্রায় শিথিল। শংকরাচার্য জ্ঞানবিচার দিয়ে কর্মকাণ্ডের প্রভাব অনেকটা খর্ব করেন। লোকে বুঝলো সকামকর্ম যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গাদি লোক লাভ করলেও প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না, শান্তি একমাত্র ত্যাগে ও জ্ঞানে। স্বর্গ ইত্যাদি লোক কামনার ফল, তাই মানুষ আস্তে আস্তে কর্মাদি যাগযজ্ঞ ত্যাগ করতে লাগলো।

সংস্কার কি আর সহজে যায়! স্বর্গলোকের আশা ছাড়তে পারে বা ক'জন। বেশির ভাগ লোক সকাম কর্ম ভালবাসে। সকাম কর্ম মানে ফলযুক্ত কর্ম। কর্মের ফল সকলেই চায়। ভোগবাসনারও শেষ নাই। একটা ভোগ চরিতার্থ করলে তো আর একটা এসে হাজির, সেটা ভোগ করলে তো আর একটা, এইরকম ক'রে ভোগের বাসনা চলতে থাকে, শেষ আর হয় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে নিষ্কামকর্মের কথা বল্লেন: "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,"—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়, কেননা "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ,"—ফল যারা চায় তারা কৃপণ। ফলাকাঙ্খীরা ভোগকে চায়, ত্যাগ চায় না আর সেজন্য কৃপণ। তাই জন্মমৃত্যুরূপ চক্র তারা অতিক্রম করতে পারে না। স্বর্গসুখও ভোগ। আত্মজ্ঞান যারা চায় তাদের কাছে তাই স্বর্গ কেন—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান হয়: 'তুচ্ছং হি ব্রহ্মপদম্'।

জ্ঞান দেবার আগে যমরাজ নচিকেতাকে তাই ভালভাবে পরীক্ষা করলেন এবং দেখলেন নচিকেতা হট্‌বার ছেলে নয়, প্রকৃত বৈরাগ্যবান। যমরাজ নচিকেতাকে সকল রকম প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু নচিকেতার সেই এক কথা: "নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে"

অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া আমি অন্য কিছুই চাই না'। আমাদেরও নচিকেতার মতো বিবেক-বৈরাগ্যবান হোতে হবে। কাম-কাঞ্চনে কাকবিষ্ঠার মতো বিতৃষ্ণা না এলে এবং অনাসক্তির ভাব ও জ্ঞানলাভের অনুকুলতা হৃদয়ে না জাগলে সবই মিথ্যা—সব বিফল। প্রেয়কে ত্যাগ ক'রে শ্রেয়রূপ আত্মজ্ঞানই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আত্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু আর কাম্য নয় এই হবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য। হাজার বছর mechanically (কলের মতো) ধ্যান জপ করো আর পাহাড়-পর্বতপ্রমাণ শাস্ত্রই পড় ভোগের উপর বিতৃষ্ণা না এলে সমস্তই পণ্ডশ্রম। তাই বাক্‌চাতুর্যে কিছু হবে না। জীবন চাই, কথা ও কাজে মিল চাই। Consistency between words and deeds (কথায় ও কাজে মিল বা সামঞ্জস্য) না থাকলে পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য সমস্তই বৃথা। 'এ'জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করব'—এ'রকম মনের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা চাই, তবেই কল্যাণ, তবেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা!

বৈরাগ্যবান নচিকেতা যখন যমরাজের কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু বর আর প্রার্থনা করলেন না তখন যমরাজ সন্তুষ্ট হোয়ে তাকে বল্লেন,

> অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু,
> ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥[২৫]

'হে নচিকেতা, পরমকল্যাণময় আত্মজ্ঞান বা শ্রেয় নিশ্চয়ই প্রেয় থেকে ভিন্ন, আর প্রেয় অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-ঐশ্বর্যও একে অন্য থেকে পৃথক। আত্মজ্ঞানরূপ শ্রেয় আর ভোগ বা কাম্যবস্তুরূপ প্রেয় এই উভয়ের প্রয়োজনও আলাদা, কারণ শ্রেয়ে মুক্তি আর প্রেয়ে পার্থিব সুখশান্তি লাভ। দুটিই মানুষকে বাসনায় আবদ্ধ করে বটে, কিন্তু

যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ ক'রে মায়াবন্ধন অতিক্রম করেন ও প্রেয়কে পরিত্যাগ করেন তিনিই জীবনে যথার্থ শান্তি লাভ করেন।

• জগতে দুটি পথ, একটি শ্রেয় আর অপরটি প্রেয়। শ্রেয় অর্থে নিঃশ্রেয়সরূপ মুক্তিলাভ। মুক্তি বলতে অবিদ্যা বা মায়াকে দূর করা। আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে বিস্মৃতির নাম অজ্ঞান। এই বিস্মৃতি দূর হোলে হয় 'জ্ঞান'। আবরণ ও আবরণহীনতার নামই অজ্ঞান ও জ্ঞান। প্রেয় হোল পার্থিব বিষয়ভোগে ক্ষণিক সুখ ও আনন্দ। বেশীর ভাগ লোক এই প্রেয়কে পরমপুরুষার্থ বলে মনে করে। শ্রেয় কম লোকই চায়। অতুল ঐশ্বর্য হবে, সবার উপর কর্তৃত্ব থাকবে, নাম-যশে দেশ ভরে যাবে—এটাই বেশীর ভাগ লোক আশা করে। কিন্তু যে ভাগ্যবান শ্রেয়ের পথকে বেছে নেয় তার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।

য়ুরোপের whole Continant (সমস্ত প্রধান ভূভাগ বা প্রদেশ), চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের এ'ধার থেকে ও'ধার পর্যন্ত ঘুরে দেখলাম প্রেয়কে সকল মানুষ চায়, আর শ্রেয় চায় হাজারের ভিতর দুটি একটি। মহামায়া ঐশ্বর্য দিয়ে সবাইকে যেন ভুলিয়ে রেখেছেন। মোহনিদ্রায় সকলে আচ্ছন্ন। রামপ্রসাদের গানে আছেঃ 'কত মণি পড়ে আছে ঐ চিন্তামণির নাচদুয়ারে'। চিন্তামণিকে আর ক'জন চায়, নাচদুয়ারেই ভিড় বেশী। এটাই মহামায়ার খেলা। সবাই যদি চিন্তামণিকে চায় তাহোলে মহামায়ার খেলা আর হয় কি ক'রে। এই খেলার ভিতর রেখেও মহামায়া আবার তাদেরই অব্যাহতি দেন যারা তাঁর শরণাপন্ন হয়। মহামায়ার শরণাপন্ন হোলে তিনি তাদের মুক্তির পথ দেখিয়ে ছান। তবে মহামায়ার নিজের মুক্তি দেবার কোন শক্তি নাই, তিনি মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন মাত্র এবং দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পেতে গেলে শ্রীমার (সারদাদেবীর) কাছে প্রার্থনা করতে হয়। মা

করুণাময়ী সাক্ষাৎ জগজ্জননী, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে (রামকৃষ্ণদেবকে) ব'লে দ্যান, শ্রীশ্রীঠাকুরও কৃপা করেন।

শ্রেয় বিদ্যা আর প্রেয় অবিদ্যা। অজ্ঞানী চায় প্রেয় আর জ্ঞানী চায় শ্রেয়। যার যেমন বুদ্ধি সে তেমনি চায়। বিবেক-বৈরাগ্য না এলে শ্রেয়কে কেউ চায় না।

অবিদ্যা বিদ্যার বিপরীত, জ্ঞানও অজ্ঞানের বিপরীত। একটা সত্য আর অপরটা মিথ্যা, একটা আলো আর অপরটা অন্ধকার। এই সত্য ও মিথ্যা বা আলো-অন্ধকার মিথুনীকৃত হোলে ভ্রম কিনা 'অধ্যাস'। যেটা যা নয় সেটাকে তাই ব'লে দ্যাখা বা অনুভব করার নাম 'অধ্যাস'। আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস হয়। অধ্যাসই মায়া অর্থাৎ প্রেয়। আবার প্রেয়কে মানুষ গ্রহণ করে শ্রেয় মনে করেই। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাকে শান্তি দেবে এই মনে ক'রে মানুষ প্রেয়কে কিনা সংসারে সুখকে চায়। কিন্তু প্রেয়কে গ্রহণ ক'রে শেষে মানুষ দ্যাখে সুখ তো পরের কথা—দুঃখই জীবনে পর্বতপ্রমাণ। অনিত্য সুখকে নিত্য বলে জ্ঞান করাটাই ভ্রম। যথার্থ শ্রেয়কে সাধারণত মানুর ধর্‌তে-ছুঁতে পারে না, তাই প্রেয়কে শ্রেয় বলে সে গ্রহণ করে। বিচারবুদ্ধি না থাকলে মানুষ এ'রকমই করে। পাহাড়প্রমাণ দুঃখ গ্রহণ করবে তবু এতটুকু সুখকে সে চাইবে না। কঠোপনিষদে তাই আছে,

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥[২৫]

'শ্রেয় ও প্রেয় এ'দুটোকেই মানুষ চায়। কিন্তু জ্ঞানী বিশেষভাবে বিচার ক'রে এদের একটিকে বিদ্যা আর অপরটিকে অবিদ্যা ব'লে নিশ্চয় করেন, পরে অবিদ্যাকে ত্যাগ ক'রে বিদ্যাকে গ্রহণ

করেন। অজ্ঞানীরা তার বিপরীত। তারা দেহরক্ষার জন্য আপাতরম্য প্রেয় অর্থাৎ পার্থিব ভোগকে গ্রহণ করে'।

• সদসদ্‌বিচার যাঁদের মধ্যে আছে তাঁরা হাঁসের মতো। হাঁস যেমন দুধ ও জল একসঙ্গে মেশানো থাকলেও দুধকে গ্রহণ ক'রে জলকে পরিত্যাগ করে, বিচারীরাও তেমনি। শ্রেয় ও প্রেয় একসঙ্গে মেশানো থাকলেও জ্ঞানীরা প্রেয়কে ত্যাগ ক'রে শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। সুখ-দুঃখের ভিতর বাস ক'রে তারা সুখ বা আনন্দমাত্র গ্রহণ এবং দুঃখ বা নিরানন্দকে পরিত্যাগ করেন। অজ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়ীরা তার উল্টো, তারা উটের মতো। উট কাঁটাগাছ খায়, তার মুখ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে যন্ত্রণা ভোগ করলেও সে কাঁটাগাছ খেতে ছাড়ে না। সংসারীরাও তেমনি। সংসারীরা দুঃখে কষ্টে জর্জরিত হয়, জানে সংসারের সুখ-অনিত্য, তবুও সংসারের মায়া ও মমতাকে তারা কাটাতে পারে না, বিষয়-বাসনা ও দুঃখ-কষ্টের ভিতর চিরদিন ডুবে থাকে। এটাই মায়া বা মোহ। সংস্কার তাদের ভুল পথে নিয়ে যায়, পিছু হাঁটবার চেষ্টা করলেও তারা আর পারে না। এটাই দুর্বলতা। দুর্বলতা কিনা ভ্রম। তারা যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপ, দুঃখ-কষ্টের অতীত, অবিনশ্বর ও শাশ্বত এটা কিছুতেই বুঝতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও তারা করে না। সমস্ত শরীর ও মন যেন তাদের paralysed (অবশ) হোয়ে যায়। অবশ্য এ'সব তারা কল্পনা করে। তারা নিজেদের মনে করে বদ্ধ, তাই বদ্ধ, আবার মনে করে নিজেদের মুক্ত, সুতরাং মুক্ত। কিন্তু মুক্ত মানুষ চিরদিনই, অথচ সে নিজেকে হীন ও দুর্বল মনে করে। মানুষের আসল রূপ হোল আত্মা। এই *recognition* (প্রত্যভিজ্ঞা) থাকলে অজ্ঞান দূর হয়। নিজেকে শাশ্বত আত্মা ব'লে জানাই জ্ঞান। জ্ঞান লাভ করেও সংসারে থাকা যায়, তখন সংসার হয় 'মজার কুটি'। জ্ঞানীরাও সংসারে থাকেন এবং সংসার

তাঁদের আবদ্ধ করতে পারে না। তা অনেকটা লুকোচুরি খেলাতে বুড়ি-ছোঁওয়ার মতো। যিনি জ্ঞান লাভ করেন তিনি বুড়ি ছুঁয়ে খেলা দ্যাখেন মাত্র, তখন কেউ আর তাঁকে চোর করতে পারে না। সাক্ষীর মতো খেলা দ্যাখাতেই তখন আনন্দ, কিন্তু খেলায় ডুবে থাকলে আর আনন্দ লাভ হয় না। তাই যো সো ক'রে সকলকেই বুড়ি ছুঁতে হয়। বুড়ি ছোঁয়াটা শ্রেয় আর শ্রেয় লাভ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

॥ বিবিধপ্রসঙ্গ ॥

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

॥ বিবিধপ্রসঙ্গ ॥

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: মহারাজ, তীর্থে যে লোকে যায় তাতে তাদের উপকার হয় কি ?

স্বামিজী মহারাজ বললেন ভগবান আর কোথা নাই বলো। তিনি তো সর্বত্র, তিনি সর্বব্যাপী, তবে সাধারণ স্থানের চেয়ে তীর্থে তাঁর প্রকাশ বেশী। যেমন সূর্য সর্বত্র কিরণ দেয়, কিন্তু আরশি বা জলে তার বেশী প্রকাশ। সাধারণ স্থানের চেয়ে তীর্থে গেলে লোকের মনে ধর্মভাবের উদ্দীপনা হয়, কারণ দেবতাদের স্থানে বা তীর্থে কেউ কখনো খারাপ ভাব নিয়ে যায় না, প্রত্যেকের ভিতর একটা পবিত্র ভাব থাকে, কাজেই সেখানকার atmosphere (পরিবেশ) পবিত্র থাকে। সেই পবিত্র atmosphere-এর (পরিবেশের) ভিতর গেলে মানুষের মনে ধর্মভাবের উদ্দীপনা হয় ও মন শান্ত হয়, কাজেই উপকার হয়।

তবে মানুষ পয়সার লোভে কি না করে। আমি আমেরিকার লোকদের slave of dollar (অর্থের দাস) বলতাম। কিন্তু এখানকার (ভারতের) লোকদের দেখছি আমেরিকানদেরও ছাড়িয়ে গ্যাছে। অবশ্য সব দেশে প্রায় সমান। টাকার লোভে চুরি বাট্‌পাড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে গলায় ছুরি দিতেও মানুষ পশ্চাৎপদ হয় না। এর দ্বারা প্রমাণ হয় মানুষ প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তি কিনা কামনা। কামনা সর্বদা স্বার্থজড়িত হয়। আমি খাবো, আমি পরবো, আর আমার ছেলে মেয়ে পরিবার এরাই শুধু খাবে, পরবে ও সুখে থাকবে, দেশের সবাই বাঁচুক বা মরুক সে'দিকে কোন লক্ষ্য নেই— এই মনোবৃত্তির নাম স্বার্থ বা স্বার্থপরতা। অন্যকে নিজের ব'লে

দেখার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে জাগে না। ঐ স্বার্থপরতাই অজ্ঞান।[১] স্বার্থভাবযুক্ত প্রবৃত্তি বা মনোভাব তাই সঙ্কীর্ণ হয়। তাতে নিজের শরীর বা ক্ষুদ্র আমিতে মানুষ আবদ্ধ থাকে, মনের কোন প্রসারতা হয় না। নিজের অনুকূলে যা সেটাই তার ভাল আর প্রতিকূল সব মন্দ। এই সব লোক সংসারে কোনদিন শান্তি পায় না, তাদের মনে অশান্তির আগুনই চিরদিন জ্বলতেই থাকে।

প্রশ্ন। দেবদেবীর মন্দির আজকাল একরকম পয়সা-রোজগারের একটা স্থান হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বামিজী মহারাজ। হ্যাঁ, ট্যাক্সের ব্যবস্থা আর কি! একবার কামাখ্যায় গিয়েছিলাম, দেখলাম পাণ্ডাগুলো যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের জন্য জবরদস্তি করছে। একজন যাত্রীকে এক পাণ্ডা বলছে যদি ৫৲ টাকা দাও তবে পূজো করতে দেবো, নইলে যাও। মন্দিরের মধ্যে কি অন্ধকার! মন্দিরে ঢুকবো, কিন্তু সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার যোগাড় আর কি। আলো নেই। পাণ্ডারা এত পয়সা রোজগার করে, কিন্তু সামান্য খরচ ক'রে একটা প্রদীপের আলো বা বাতি দেবে তাও পারে না। এ'রকম সব জায়গায় দেখেছি সমান।

আজকাল ঠাকুরপূজোও একটা ব্যবসা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি পুরোহিত তিনি পুরের অর্থাৎ যজমানের হিত প্রার্থনা করবেন, তা নয় নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।[২] সর্বত্র স্বার্থ আর স্বার্থ। বেশীর ভাগ লোক পূজোকে পয়সা-রোজগারের উপায় ব'লে মনে করে। পূজার আসল উদ্দেশ্যও তারা জানে না। সমাজেরই বা এতে ভাল হবে কি ক'রে বলো। যজমান পুরোহিতের উপর ঠাকুরসেবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আর পুরোহিত তাঁর রোজগার নিয়ে ব্যস্ত, সুতরাং বুঝতেই পারছ সমাজের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ স্বার্থ স্বার্থ রব চতুর্দিকে। ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মের নামগন্ধ কোথাও নেই বল্লে চলে।

প্রশ্ন। প্রাণ আর মনের মধ্যে পার্থক্য কি মহারাজ?

স্বামিজী মহারাজ। প্রাণ ও মনের নিকট সম্বন্ধ। প্রাণ ছাড়া মন থাকতে পারে না, আবার মন ছাড়া প্রাণ থাকতে পারে না। প্রাণ যেন একটা গাড়ী আর মন তার চালক। মন ছাড়া প্রাণশক্তিও কাজ করতে পারে না। কিন্তু প্রাণ বা প্রাণশক্তিই মনকে চালাচ্ছে। প্রাণ সর্বশক্তিমান। প্রাণশক্তি থাকার জন্যই জগতে সকল কাজ সম্ভব হচ্ছে। তাই প্রাণশক্তিকে বলে আধার কিনা basic ground (মূলাধার)। মন বা ইচ্ছাশক্তি প্রাণেরই একটা বিকাশ। মানুষের ভিতর এই প্রাণশক্তি আছে ব'লে সে বেঁচে আছে।

আবার ইচ্ছাশক্তি থাকার জন্য মানুষ কাজ করে। তার সকল কাজের পিছনে প্রেরণা জোগায় ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি তাই জগতে প্রধান। ইচ্ছা করলে মানুষ দেবতার চেয়েও বড় হোতে পারে আবার পশু অপেক্ষা অধম হোতে পারে। তাই will-power-এর (ইচ্ছাশক্তির) উপর নির্ভর করে মানুষের ভাল বা মন্দ। Will-power-কে (ইচ্ছাশক্তিকে) আশ্রয় ক'রে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির মূলে থাকে তাঁর ইচ্ছা কিনা divine will (দিব্য ইচ্ছা)। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি হোক, অমনি নিমেষে সৃষ্টি হোয়ে গ্যালো। সবই মনের বিলাস—'চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্'। যোগবাশিষ্ঠে মনকে তাই বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে: 'মনো হি জগতাং কর্তৃ'।

এখন কথা এই যে ইচ্ছা করলেই কি মানুষ যা তা করতে পারে? তা কেন, তবে মানুষের ভিতর infinite possibility-র (অনন্ত সম্ভবনার) বীজ নিহিত আছে। Whatever power exists in the macrocosm, exists also in the microcosm; অর্থাৎ যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে তাই প্রতিটি মানুষের ভিতরও আছে। মানুষ

miniature form-এ (ছোট আকারে) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো। সুতরাং মানুষের শক্তিও অসীম। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না, সে নিজেকে ভাবে দুর্বল ও শক্তিহীন। বেদান্তের মতে মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ, অনন্ত শক্তি তার ভিতর সুপ্ত আছে, তাই ইচ্ছা করলে সে অনেক কিছু পেতে পারে। জ্ঞানলাভ হোলে কথাই নাই, সকল বাসনা তখন পূর্ণ হয়, কিছুই পেতে আর বাকি থাকে না।[৩] তখন আত্মজ্ঞানী পূর্ণশান্তি লাভ করেন।

এখন জিজ্ঞসা করতে পারি মানুষে ও ঈশ্বরে ভেদ কোথা। ভেদ আসলে মনে। ভেদই ভ্রম। ভেদও আমরা মনে কল্পনা করি। মনেই আমরা ভাবি 'আমি ক্ষুদ্র ও ঈশ্বর আমা থেকে ভিন্ন',[৪] অথচ মানুষ আত্মস্বরূপ। সে নিজেকে বুঝতে পারে না ব'লে অজ্ঞানী। মোটকথা আত্মস্বরূপকে না বোঝার নাম অজ্ঞান আর 'আমি বদ্ধ নই—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, আমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমি অজয় অমর অবিনাশী আত্মা'—এ'রকম অনুভব করার নাম 'জ্ঞান'।[৫]

প্রশ্ন। গীতার আসল ভাব কি ?

স্বামিজী মহারাজ। মানুষের জীবনে সকল বিষয়ে গীতা apply (প্রয়োগ) করা যায়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবার আগে অর্জুন যখন পাণ্ডব ও কৌরব সেনাদলের মাঝখানে রথ স্থাপন করলেন তখন তাঁর মনে মোহ উপস্থিত হোল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন মহাবিভ্রাট, শত্রুসেনা সম্মুখে, সকলেই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু অর্জুন তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের দেখে "অহং ন যোৎস্যে" ব'লে গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অবসাদ দূর করার জন্য যে উপদেশ দিলেন ব্যাসদেব, সেটাই মহাভারতে উল্লেখ করেছেন। এই উপদেশই 'গীতা'। তবে গীতার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর

দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন কিনা এ'নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই, আমরা দেখব whether the *Gita* is applicable to our practical life or not (গীতাকে আমাদের বাস্তব জীবনের উপযোগী করা যায় কিনা)। গীতায় জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি সকল রকম সাধনার উপদেশ আছে।[৭] তাই যার যা অভিরুচি সে সেই পথ ধরে সাধনা করতে পারে। 'এটাই একমাত্র পথ, আর সব ভুল' এ'কথা গীতা উপদেশ দেয় না। শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই আছেঃ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্,"—যে যেভাবে আমাকে ডাকবে বা উপাসনা করবে আমি সেভাবেই তাকে তার কাম্যফল দান করবো'। কোন রকম গোঁড়ামী, secterianism (সাম্প্রদায়িকতার ভাব) বা superstition (কুসংস্কার) গীতার ভিতর নাই। গীতার উপদেশ উদার ও সর্বজনপ্রিয়। যেকোন মত বা সম্প্রদায়ের সাধক তাই গীতার উপদেশ অনুসরণ ক'রে চলতে পারেন, সকলের তাতে কল্যাণ হয়।

গীতার আসল কথা হোল কর্মফলত্যাগে, সন্ন্যাসে বা যথার্থ ভক্তির অথবা যোগের পথে ভগবানকে লাভ করতে হবে—তা তুমি, এদের যেটাকে ধরেই যাও না কেন। নিষ্কামভাবে নিজের লক্ষ্যে অগ্রসর হোতে হয়। Progress বা অগ্রগতি হয় নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে। শরণাগতির দিকও আছে। গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও যোগের মতো ভক্তিরও স্থান আছে! তাতে কি সংসারী, কি ত্যাগী, যোগী বা জ্ঞানী সকলকে একটা আশ্বাসের বাণী শোনানো হয়েছে। সকলেই যে সাধনার অধিকারী ও ঈশ্বর লাভ করবে এ'কথা গীতা জোর করেই বলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন গীতা কিনা ত্যাগী। গীতাকে বারবার উচ্চারণ করলে ঐ ত্যাগী কথাই বলা হবে। ত্যাগই গীতার উদ্দেশ্য। ত্যাগ কিনা বাসনার ত্যাগ। বাসনাই মায়া, বাসনাই সংসারের মূল। যে বাসনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে

সে মুক্ত। গীতা পাঠ করার সময় তাই মনে রাখবে যে ত্যাগ কিনা বাসনাত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য, আর একথাই গীতা বারবার শিক্ষা দিয়েছে।

গীতার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ শুধু অর্জুনকে লক্ষ্য করেই দেন নি, অর্জুন আমরা সকলে। সাধকমাত্রেই অর্জুন। কুরুক্ষেত্র হোল কর্মময় সংসার। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ প্রভৃতি আমাদের সামনে শত্রুসৈন্য। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধের প্রারম্ভে মোহ ও আসক্তি আসা স্বাভাবিক, কিন্তু যুদ্ধ করতে হবে, বীরের মতো সকল আসক্তির উচ্ছেদ করতে হবে, তবেই জয়, তবেই মুক্তি ও শান্তি। নচেৎ বন্ধন অনন্তকাল। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনদের সম্মুখে সমবেত দেখে অবসন্ন এবং মোহে ও মমতায় আচ্ছন্ন। সকলেই তাঁর আপনার লোক অথচ নিজের হাতে সকলকে বধ করতে হবে এই ভেবে তার মধ্যে চাঞ্চল্য, মোহ ও বিহ্বলতা। সংসার-সমরে সাধকের কথাও তাই। সাধক সাধনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হোলে সংসারের মায়া-মমতা তাকে আচ্ছন্ন করে, বাসনা কামনা লোভ প্রভৃতি মনের বৃত্তি তাকে প্রলুব্ধ করে। তখন সে ভাবে এরা আমার পরম-আত্মীয়। তাদের ত্যাগ করতেও তখন তার মমতা হয়। দুর্বলতা এর কারণ। দুর্বলতাই পাপ। তখন একমাত্র উপায় বিবেক ও বিচারের আশ্রয় নেওয়া। যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের মায়া অর্জুনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বারবার বলেছেন 'যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না'। অর্জুন প্রতিবাদও করেছেন অনেক, কিন্তু পরিশেষে ভালমন্দ কিছু বিচার করতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হোয়ে বলেছেন: "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,"—'হে কৃষ্ণ, আমার' ভাল-মন্দ বিচারশক্তি এখন আর নাই, আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, এখন শিক্ষা দাও কি

করা উচিত'। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দ্যাখালেন এবং তার সকল মোহ দূর করলেন। সাধকদের পক্ষেও তাই। তাদেরও মধ্যে শরণাগতির ভাব থাকা চাই। জ্ঞানীদের কথা স্বতন্ত্র। জ্ঞানীরা সদ্‌সদ্‌-বিচার ক'রে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই তাঁদের সাধন। ভক্ত বা কর্মীরা জ্ঞানবিচারের ধার ধারে না। ভগবানে অটল বিশ্বাস, একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠাই তাদের সম্বল। তাদের পথ শরণাগতির, তাই তারা ভগবানের কাছে ধীরে ধীরে আত্মনিবেদন করে। গিরিশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বকলমা দিয়েছিলেন। বকলমা দেওয়ার নামই শরণাগতি। 'আমার কিছু নয়—সব তোমার' এর নাম বকলমা বা শরণাগতি। শরণাগত হোলে ভগবান ভক্তকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। আবার সাধনার অবস্থায় শুদ্ধবিবেকের কাছে আত্মসমর্পণ করলে বিবেকবুদ্ধিই সাধককে বোঝায় কোন্‌টা শ্রেয় ও কোন্‌টা প্রেয়। অবশ্য শ্রেয়কেই সে তখন গ্রহণ করে। কঠোপনিষদে যমও নচিকেতাকে এই শ্রেয় ও প্রেয়ের কথা বলেছিলেন। নচিকেতা বৈরাগ্যবান, সুতরাং প্রেয়কে সে চাইলে না, পরমপ্রেয়স্বরূপ আত্মজ্ঞানই সে যমরাজের কাছে প্রার্থনা করলে। যমরাজ সন্তুষ্ট হোয়ে নচিকেতাকে বলেছিলেন,

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
> তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
> শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
> প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে॥

শ্রেয় ও প্রেয় দুটিই মানুষের সামনে থাকে, কিন্তু জ্ঞানী প্রেয়কে ত্যাগ ক'রে একমাত্র শ্রেয়কেই চায়, আর অজ্ঞানী প্রেয়কে শ্রেয় ব'লে গ্রহণ করে।

জগতের মধ্যে দুটো জিনিস আছে: একটা ভোগ আর একটা ত্যাগ। এ' দুটো কখনো একসঙ্গে থাকে না। যেমন আলো আর অন্ধকার, হয় আলো থাকবে, নয় অন্ধকার। তবে যাঁরা সংসারের

লুকোচুরি খেলায় বুড়ি ছুঁয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হন তাঁদের কথা আলাদা; তাঁরা সংসারে সহস্র ভোগের প্রলোভনের মধ্যে থেকেও সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানীদের সত্যের উপর ষোলআনা আঁট থাকে, তাই সংসারে থাকলেও মায়া তাঁদের আর বাঁধতে পারে না। তাঁরা অচল, অটল, সাক্ষীর মতো সর্বদা নির্লিপ্ত থেকে জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করেন, অথচ কাজের এতটুকু অভিমান তাঁদের জীবনে থাকে না।

তবে কামনাশূন্য হোয়ে কাজ করা বড় কঠিন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন ঈশ্বর লাভ না হওয়া পর্যন্ত নিষ্কামভাবে কাজ করা যায় না।[১০] ঈশ্বর লাভ হোলে ক্ষুদ্র অহং নষ্ট হয়। এটাই 'কাঁচা আমি'। স্বার্থপরতা থেকে এই আমির সৃষ্টি। স্বার্থপরতা অজ্ঞান থেকে আসে।[১১] নিষ্কাম হোতে গেলে 'আমি' ও 'আমার' ভাব দূর করা উচিত। 'আমার'-ও ষোল আনা থাকবে অথচ 'তোমার'-ও ষোলআনা করব—এ' কখনো হয় না। হয় 'আমার' করো—নয় 'আমার' বা 'আমি'-টাকে মেরে ফেলে কেবল 'তোমার'-ই করো। দু'নায়ে পা দিলে ডুবে মরতে হয়, তাতে একুল যায়, ওকুলও যায়। তাই একটা ভাব, একটা পথ বা মতকে নিয়ে সাধনার পথে অগ্রসর হোতে হয়, তবেই কল্যাণ বা শ্রেয়।

গীতার ভাব হোল নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে ঈশ্বরকে জানো। শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট বলেছেন: "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং জ্ঞেয়ঃ"।[১২] 'ব্রহ্ম' বলতে এখানে বেদকে বুঝতে হবে। বেদ আমাদের (হিন্দুদের) মতে অপৌরুষেয়। কোন মানুষ এই বেদ কালী-কলম ও বুদ্ধি দিয়ে তৈরী করে নি বা বেদ কোন পুরুষের সৃষ্টি নয়, সেজন্য বেদ অপৌরুষেয়। বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে: "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ।"[১৩] শঙ্করাচার্য বলেছেন 'পুরুষনিঃশ্বাসবৎ'—প্রযত্নহীন হোয়ে নিঃশ্বাসের মতো ঋগাদি

বেদ প্রকাশিত হয়েছে।[১৪] অথবা বেদ বলতে জ্ঞান ('বিদ্'—জ্ঞানে) এবং জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ।

বেদ বলতে সাধারণতঃ ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার বেদকে বোঝায়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি 'বেদ' বল্‌তে 'জ্ঞান'। 'বিদ্'—জ্ঞানে, তাই বেদে জ্ঞান ও কর্ম এই দুয়ের উল্লেখ আছে। সমগ্র বেদকে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞের কথা। যাগযজ্ঞ কামনাযুক্ত হোয়ে করতে হয়, যেমন কেউ স্বর্গলোকে যাবার জন্য যজ্ঞ করে, কেউ রাজ্য পাবার জন্য রাজসূয়াদি যজ্ঞ করে, কেউ বা পুত্র পাবার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে, আবার কেউ বৃষ্টি হবার জন্য কারিরীযাগ করে, কেউ বা উপাংশুযাগ, অগ্নীষোমীয়যাগ, দর্শ-পৌর্ণমাসীযাগ, সোমযাগ এবং অভিচারের উদ্দেশ্যে শ্যেনযাগ ইত্যাদি করে। যাগযজ্ঞ থেকে এক রকম 'অপূর্ব' অর্থাৎ অদৃষ্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই অপূর্ব বা অদৃষ্টই সকলকে অভীষ্ট ফল দান করে। তবে কর্মের ফল কখনো নিত্য হয় না। যাগযজ্ঞ ক'রে স্বর্গ লাভ করলেও সে ফল চিরস্থায়ী নয়। পুরাণে রাজা নহুষ তার দৃষ্টান্ত। যাগযজ্ঞ তাই সকাম কর্ম। কর্ম বা কর্মের ফল সর্বদা পরিবর্তনশীল, সুতরাং অনিত্য। এক আত্মজ্ঞানই নিত্য, তাছাড়া আর সব অনিত্য। জ্ঞান ও কর্ম তাই এক জিনিস নয়। তাদের ফলের মধ্যেও অনেক পার্থক্য।[১৬] শঙ্কর গীতাভাষ্যে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন করেছেন। কর্মের ফল জ্ঞান নয়, জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, তাতে কর্মের কোন স্থান নেই।

জ্ঞানকাণ্ড হোল উপনিষৎ। উপনিষদকে তাই বেদের শেষভাগ বা 'অন্ত' বলে। উপনিষদই বেদান্ত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে বোঝানোর জন্য ব্যাসদেব 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করেছেন। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ এঁরা সূত্রের উপর নানান ভাষ্য রচনা করেছেন। ভাষ্যের উপরও ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা, টিপ্পনী কত কি সৃষ্টি হয়েছে। আসলে উপনিষদকে বোঝানোর জন্যই সকলের সার্থকতা। ভাষ্য প্রভৃতি

উপনিষৎ বা বেদান্তের সহকারী। উপনিষৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উপলব্ধ তত্ত্ব, ঈশ্বর বা ব্রহ্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছে। প্রাচীনকালে ঋষিরা শিষ্য বা ছাত্রদের ঔপনিষদিক তত্ত্বসকল মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, ছাত্রেরাও শুনে শুনে তা আবৃত্তি করত. আর পুরুষপরম্পরভোবে শুনে শুনে ছাত্রেরা শিক্ষা করতো ব'লে উপনিষদের আর এক নাম শ্রুতি। পরে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হোলে গাছের ছালে বা ভূর্জিপত্রে ঐসব মন্ত্র লেখা হোত। উপনিষদের আর এক নাম 'রহস্যবিদ্যা'।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডই নিত্য। জ্ঞান বা সত্যের কোনদিন ক্ষয় বা নাশ নেই। সত্য আজও যেমন, কালও তেমন, আবার একশো বা হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি। সত্য যা—চিরকালই সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না—Truth is always truth। 'বেদ' বা জ্ঞান তাই নিত্য। বেদের কর্মকাণ্ডের কিন্তু অদল-বদল আছে। যাগযজ্ঞ মানুষের তৈরী ব'লে অপৌরুষের নয়। এদের পরিবর্তন আছে। যাগযজ্ঞ পৌরুষেয় ব'লে 'কর্ম'। মানুষ ইচ্ছা করলে এদের অনুষ্ঠান করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। কর্ম তাই মানুষের অধীন, মানুষের করা বা না করারূপ ইচ্ছার উপর তা নির্ভর করে। কিন্তু জ্ঞান কোন মানুষের তৈরী নয়। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, অনুভূতিরূপ প্রমাণ দিয়ে জ্ঞান বা ব্রহ্মকে জানতে হয়। অনুভূতি বা অপরোক্ষতাই জ্ঞানের প্রমাণ। জ্ঞান কোন লোকের ইচ্ছা বা কর্তৃত্বের অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। ব্রহ্মজ্ঞানও তাই।[১৮] কিন্তু যাগযজ্ঞ কর্তার ইচ্ছার অধীন এবং তার ফলও তাই আপেক্ষিক। কর্মে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি বা প্রত্যবায় থাকে, সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে কর্ম পার্থক্য অনেক।[১৯]

কর্মমাত্রের যেমন ভাল ফল আছে তেমনি মন্দ ফলও আছে। তবে কর্মের ফল কেবলই ভাল বা মন্দ হোতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন,

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥[২০]

ধূম যেমন অগ্নি ছাড়া থাকে না, কর্মও তেমনি দোষকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কর্মের ভাল ফল আছে আবার মন্দ ফলও আছে। কর্মের মধ্যে তাই ভাল ও মন্দ এই উভয় ফল মেশানো। Time, space and causation-এর (দেশ, কাল ও নিমিত্তের) ভিতর কর্ম, কারণ কামনা ছাড়া কর্ম হয় না। ইচ্ছা বা বাসনা প্রাণীমাত্রের অন্তরে বা মনে থাকে। মনের active (সক্রিয়) বা manifested (ব্যক্ত) অবস্থাই 'বাসনা',[২১] সুতরাং মন থাকলেই বাসনা থাকবে। বাসনাই change কিনা পরিবর্তন। Change-এর (পরিবর্তনের) পারে যাওয়া মানেই শান্তি। যোগী ও সাধকেরা এই change-এর পারে গিয়ে শান্ত ও সমাহিত হন।[২২] change-বিহীন অবিকারী মন মনই নয়। পাতঞ্জলদর্শনে মনের নিরুদ্ধ অবস্থাকে তাই আত্মার স্বরূপ বলা হয়েছে। নিরুদ্ধ বা নিরোধের অবস্থাই 'যোগ'—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। নিরোধ অবস্থায় দ্রষ্টা বা আত্মা স্বরূপে থাকেন—'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'। মন বা চিত্তের চঞ্চল অবস্থাই 'বৃত্তি'। এই বৃত্তিকে দূর বা শান্ত করার নাম 'যোগ'। পতঞ্জলি বলেছেন নিরুদ্ধ ও -বৃত্তিহীন স্থির মনের অবস্থা আত্মার স্বরূপ।[২৩] মন বা চিত্ত অন্তঃকরণেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একই অন্তঃকরণ কখনো মন, কখনো চিত্ত, কখনো বুদ্ধি, আবার কখনো অহংকার রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আসলে সেই একই অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণই মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা সব-কিছু। Time, space and causation-এর (দেশ, কাল ও নিমিত্তের) ভিতরই অন্তঃকরণ বা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের স্থিতি ও বিকাশ। সুতরাং মন বা চিত্তের বৃত্তি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। মায়ার এলাকার মধ্যে কোন জিনিসই দোষশূন্য হোতে পারে না, একটু আধটু দোষ সবের

মধ্যে থাকে। মুমুক্ষু পুরুষেরা তাই আগে ঈশ্বর লাভ করেন, কারণ ঈশ্বরলাভের সঙ্গে সঙ্গে মায়ার অন্ধকার দূর হয়। মায়া দূর হোলে মুক্তি, জ্ঞান বা শান্তি।

কর্ম না করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করতে হয়। চিত্তশুদ্ধি পরম্পরাসম্বন্ধে তাই মুক্তির গৌণ কারণ। চিত্তশুদ্ধি না হোলে বিবেক-বৈরাগ্যও আসে না, বিবেক-বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা না এলে আবার নৈষ্কর্ম্য বা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। গীতায় তাই বলা হয়েছে,

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥[২৪]

কর্মের অনুষ্ঠান না ক'রে কেউ কখনো আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না।[২৫] কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হোলে অনাত্মাসম্বন্ধে বিবেক উৎপন্ন হয়। কেবল কর্মসংন্যাস থেকে জ্ঞান লাভ হয় না, তাই কর্ম দিয়ে কর্ম নাশ করতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা। পায়ে কাঁটা ফুটলে অন্য একটা কাঁটা দিয়ে পায়ের কাঁটা তুলে তারপর দুটো কাঁটাকেই ফেলে দিতে হয়।[২৬] কর্মের ভিতর থেকেই কামনাশূন্য হোতে অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাস কিনা যত্ন।[২৭] পুনঃপুনঃ যত্ন বা অভ্যাস করলে কর্মের সংসারে থেকেও কামনাশূন্য হওয়া যায়।[২৮] জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা তার দৃষ্টান্ত।

কামনাশূন্য হওয়া মানে স্বার্থপরতার ভাব মনে না রাখা এবং স্বার্থশূন্য হোয়ে কাজ করার নাম কর্মযোগ।[২৯] নিষ্কাম কর্মই কর্মযোগ, কিন্তু নিষ্কাম বা কামনাশূন্য হোয়ে কাজ করা বড় কঠিন। কামনার সংসারে একটু আধটু নাম-যশের আকাজ্ক্ষা থাকেই। প্রথম প্রথম তাই সাধন-ভজন দরকার। ভগবানে ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা এগুলি সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়। যখন যেকাজ করবে তখন তাকেই ভগবানলাভের উপায় ব'লে মনে করবে। একনিষ্ঠার ভাব না থাকলে

ঠিক ঠিকভাবে কর্ম করা যায় না। কাজ করার সময় মনে করবে কর্ম দিয়েই তোমার ভগবান লাভ হবে এবং তাহ'লে কর্ম হবে তখন 'যোগ' বা সাধনা।

কর্ম করারও কৌশল আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই কৌশলকে 'যোগ' বলেছেন।[৩০] নিরাসক্ত হোয়ে কর্ম করার নাম যোগ বা কৌশল। তবে কর্মের সময় কোন-কিছুর কামনা থাকা চাই। তাই ঈশ্বরের পূজা করছি, পরের বা জগতের কল্যাণের জন্য কর্ম করছি—এ'রকম কামনা থাকলে কোন ক্ষতি হয় না। এ'রকম কামনা কামনার মধ্যে নয়, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন হিংচে শাকের মধ্যে নয় বা মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। সংসারে কর্ম করব কিন্তু ফল চাইব না এভাবে কর্ম করার নাম 'কর্মযোগ'।

'ধর্ম' কথা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকে পূজা, ব্রত, উপবাস, দান এ'সবকে ধর্ম বলে, কেউ আবার জপ, ধ্যান, শাস্ত্রপাঠ এগুলিকে ধর্ম বলে। কাজেই ধর্ম হোয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল একটা অনুষ্ঠানমাত্র। তার ভিতর কতকাংশ সার আর কতকাংশ অসার। ধর্মের প্রকৃত অর্থ আমাদের প্রকৃত সত্তা—যা না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না। ধর্মই উপলব্ধির স্বরূপ। আত্মা আমাদের অধিষ্ঠান ও প্রাণের প্রাণ। আত্মাকে লাভ করাই ধর্ম। আত্মার উপলব্ধি ধর্মের আসল রূপ।[৩১]

আত্মাকে লাভ করা মানে এ' নয় যে আত্মা আমাদের থেকে অনেক দূরে বা ভিন্ন তাই তাঁকে নিজের আয়ত্বে আনতে হয়। আসলে আত্মাই আমাদের সব—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, জ্ঞান, বিচার, চৈতন্য। এ'ভাবটি জানা বা উপলব্ধির নাম জ্ঞান। আত্মার কেউ জ্ঞাতা নেই,—there is no other knower of the Self, আত্মা নিজেই জ্ঞান ও জ্ঞাতা দুই। আত্মা বা জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশ—সর্বদাই প্রকাশশীল, নিজের প্রকাশের জন্য তা অন্য কারু

অপেক্ষা রাখে না। যেমন সূর্য সর্বদাই প্রকাশশীল, সূর্য নিজেকে প্রকাশ করে আবার বিশ্বের সকল বস্তুকেও প্রকাশ করে। তাই সূর্য না থাকলে জগতের সকল জিনিষ অন্ধকারে ঢাকা থাকত। স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের প্রকাশের জন্য যেমন বাতি বা প্রদীপের কোন প্রয়োজন নেই, আত্মারও তেমনি। আত্মা নিজে প্রকাশস্বভাব আবার তাঁরই আলোকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলে আলোকিত হয়। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; আত্মা অজর, অমর ও অবিনশ্বর। আত্মার এই স্বরূপকে জানার নাম 'জ্ঞান'। আত্মস্বরূপের উপলব্ধি তাই আসলে ধর্ম। বেদান্ত আমাদের একথাই শিক্ষা দেয়।

অনেকে মনে করে কর্মত্যাগ না হোলে ঠিক ঠিক ধর্ম হয় না, কিন্তু কর্মত্যাগ হওয়া কি সোজা কথা! জ্ঞানলাভ না হোলে ঠিক ঠিক কর্মত্যাগ হয় না। কর্ম মানে এখানে সকাম বা আসক্তিযুক্ত কর্ম। নিষ্কাম কর্ম কর্মের মধ্যে গণ্য নয়। জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও কর্ম করেন, তবে তাঁদের কর্ম পরহিতার্থে বা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'। পরহিতায় কর্ম নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্তশুদ্ধিই মুক্তির কারণ।[২২] কামনার সংসারে থাকলেও নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস করা যায়। জ্ঞানী পুরুষদের নিজেদের কোন কামনা বাসনা থাকে না, তাঁদের কর্ম তাই অকর্মের সমান। তাঁরাই আসলে কর্মত্যাগী। যথার্থ কর্মত্যাগী হলেন তাঁরা যাঁরা সিদ্ধ বা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন।[৩৪] জীবন্মুক্তেরাই ঠিক ঠিক নিষ্কাম ও কর্মত্যাগী হোতে পারেন। সাধারণ সাধককে জ্ঞানবিচার অভ্যাস করতে হয়। কর্মত্যাগ হওয়া মানেই নিজের 'অহং' বা অভিমানবর্জিত হওয়া। নিষ্কামভাবে কর্ম করলে 'আমি' 'আমার' অভিমান সাধককে আর স্পর্শ করতে পারে না। নিষ্কাম কর্মের নাম 'কর্মযোগ'। মায়ার সংসারে থেকেও নিষ্কাম কর্ম করা যায় তা আগেই বলেছি, তবে বিচার চাই। বিচার কিনা জ্ঞানবিচার।

অনেকের বিশ্বাস জপ, ধ্যান, পূজা, প্রাণায়াম এ'সবই একমাত্র কর্ম, তাছাড়া আর সব কর্ম অকর্ম অর্থাৎ বাজে কাজ। কিন্তু এ'বিশ্বাস ঠিক নয়। কর্ম মানে জগতে যত-কিছু কাজ—সব। জপ-ধ্যানও কর্ম, খাওয়া-পরাও কর্ম, বাসনমাজা এবং ঘর ঝাঁট দেওয়াও কর্ম, আবার শাস্ত্রপাঠও কর্ম। সুতরাং কর্ম আর কোনটা নয় বলো। ইংরাজীতে একটা কথা আছে: work is worship, অর্থাৎ যে কাজ করবে ভাববে তুমি তাই দিয়ে ঈশ্বরের পূজা করছ। রামপ্রসাদের গানে আছে: "আহার কর মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা-মারে"। শ্যামা-মাকে আহুতি দেবার ভাব নিয়ে কম করলে কর্ম অকর্মের সামিল। সে'ধরনের কর্মে বন্ধন হয় না। কোন কাজ তাই জগতে তুচ্ছ বা বাজে নয়। যে ঠাকুরপূজো করছে আর যে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে দু'জনের কাজই সমান, দু'জনের কাজই ভগবানের পূজার সামিল। কাউকে তাই অবজ্ঞা করতে নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের রাজত্ব। তিনি সর্বত্রই আছেন। এক একটি ধূলিকণাতেও তিনি বিরাজ করছেন। অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের ভিতর ঈশ্বর ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। সবতে—সকল স্থানেই তিনি আছেন। সুতরাং ছোট হোক আর বড় হোক যে কাজই কর সব ভগবানের উদ্দেশ্য করা হচ্ছে ও হয় জানবে। এই ভাব নিয়েই সংসারে কর্ম করতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলেছেন: "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,"—কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥[৩৫]

আসক্তিহীন হোয়ে কর্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম আচরণ করলে মানুষ পরমপুরুষার্থরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে।

ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতরাও আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। তবে বলতে পার যে তাঁরা কিছু higher plane-এর (উচ্চ-স্তরের) মানুষ। ইচ্ছা করলে আমরাও তাঁদের মতো দেবতা হোতে পারি। তবে কর্ম চাই। সৎকর্ম ক'রে মানুষই দেবতা হয় আবার অসৎকর্মের দ্বারা মানুষ পশুতে পরিণত হয়। কর্মের ফল কর্মের অনুযায়ী হয়। তাই যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফল পায়।

শাস্ত্রে জ্ঞানকে আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর অজ্ঞানকে বলা হয়েছে অন্ধকার। আসলে প্রবৃত্তি অন্ধকার ও নিবৃত্তি আলোক প্রবৃত্তির বশেই মানুষ জাগতিক ভোগকে ইহসর্বস্ব জ্ঞান করে, একটা বিষয়কে ভোগ ক'রে আবার অন্য একটা বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে অথচ ভোগের কোনদিন আর শেষ হয় না। শরীর ভোগসাধনের যন্ত্র বা উপায়। দেহাত্মবাদীরা কেবল শরীরের যত্ন করে, শরীর ছাড়া তারা অন্য কিছু বিশ্বাস করে না। শাস্ত্রে দেহাত্মবাদীদের তাই জড়বাদী বলা হয়েছে। চার্বাকপন্থীরা দেহাত্মবাদী। চার্বাকপন্থীদের কাছে পরলোক ব'লে কিছু নেই, ইহলোকই তাদের সর্বস্ব। দেহের সুখে তারা সুখী আর দেহের দুঃখে সর্বদা দুঃখী। উপনিষদে দেহত্মাবাদীদের অবিবেকী ও অজ্ঞানী বলা হয়েছে। কঠোপনিষদে আছে,

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকোঃ নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥[৩৬]

'যে লোক বালকের মতো বিবেকহীন, প্রমাদগ্রস্ত ও ঐশ্বর্যমোহে আচ্ছন্ন তার কাছে সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোকসম্বন্ধে কোন চিন্তা কখনো উদিত হয় না। সে ভাবে এই পৃথিবীলোকেরই মাত্র অস্তিত্ব আছে, এর অতিরিক্ত পরলোক বা স্বর্গ নরক ব'লে অন্য কিছু নেই।

এরাই আসলে অজ্ঞানী। এরাই পুনঃপুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে'। জ্ঞানীদের কথা স্বতন্ত্র। জ্ঞানীরা যদিও শরীরকে আত্মার বাসভূমি ব'লে মনে করেন তবু শরীর তাঁদের কাছে অনিত্য, কারণ শরীরের জন্ম ও মৃত্যু আছে। তাঁরা শরীরে থেকেও অশরীরী। শরীর যাক কি থাক সেদিকে তাঁরা কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না। আত্মাই তাঁদের কাছে একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে,

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থিস্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মনং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥[৩৭]

আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি ছাড়া অজ্ঞানের পারে যাবার আর কোন উপায় নাই। অজ্ঞানই বন্ধন, অজ্ঞানই সকলকে নাগপাশে বেঁধে রাখে। এই নাগপাশকে কাটতে হোলে জ্ঞানরূপ তরবারি চাই। "প্রজ্ঞানে-নৈনমাপ্নয়াৎ",—প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে লাভ কিনা উপলব্ধি করা যায়। যারা অজ্ঞান-অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে তাদের চিত্ত সংযত ও শান্ত নয়, তারা আত্মা বা ব্রহ্মকে কোনদিনই জানতে পারে না। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নয়াৎ ॥[৩৮]

তাই প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয় এই ব'লে—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥[৩৯]

'হে জগৎপরিপালক, সত্যরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার জ্যোতির্ময় পাত্রে আবৃত। আপনি সেই আবরণ অপসারিত করুন, আমি সত্যপরায়ণ হোয়ে ব্রহ্মের রূপ দর্শন করি'। "যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি",[৪০]—তোমার যা কল্যাণতম রূপ আমি তাই দর্শন করি। প্রার্থনা করার অর্থ knock অর্থাৎ আঘাত করা। প্রার্থনা করছ

মানেই you are knocking at the door of you will (তুমি তোমার সুপ্ত বাসনা বা ইচ্ছার (মনের) দ্বারে আঘাত করছ)। প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই তাই। তীব্র ব্যাকুলতা থাকলে অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, অন্তরের অন্ধকার দূর হয় ও জ্ঞানের আলোক প্রভিভাত হয়। নইলে মুখে বলছ হে ভগবান, আমায় ভক্তি দাও, প্রেম দাও, শান্তি দাও, কিন্তু অন্তরে তার কোন সাড়া নাই বা ব্যাকুলতার নামগন্ধ নাই। অনেকে আবার এই ব'লে প্রার্থনা করেঃ 'হে ভগবান, আমায় ধন দাও, মান দাও, পুত্র দাও'। চণ্ডীতেও 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' ও এমন কি 'ভার্যা মনোরমং দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনা আছে। এ'প্রার্থনা জ্ঞানীদের জন্য নয়। এ'সব কামনাপুরণের জন্য প্রার্থনা। এতে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।[৪১] উপনিষদের প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপনিষদে আছে,

> অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
> মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।
> রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

হে অন্তরাত্মা ও জ্যোতির্ময় পুরুষ, আমাদের অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চলো! হে সর্বঅকল্যাণবিধ্বংসিন্, তোমার করুণার দৃষ্টিপাতে আমাদের রক্ষা করো। আমাদের অন্তরে তোমার ঐশীশক্তি বিকশিত হবার পথে যত অন্তরায় সে'সব দূর করো, আর আমাদের সত্যকার স্বরূপ যে তোমা থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন সেকথাও যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই'!

আত্মা অবিনাশী। আত্মার কখনো অংশও হয় না, আত্মা চিরদিন পূর্ণ। আর যদি বা আত্মার অংশ কল্পিত হয় তবে সে অংশ পূর্ণই, কারণ every part of infinity is infinity, অর্থাৎ অনন্ত বা পূর্ণের প্রত্যেকটি অংশ অনন্ত বা পূর্ণ। উপনিষদে আছেঃ "পূর্ণস্য

পূর্ণামাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে”। আগুনের কণা আগুনের অংশ হোলেও তার দাহিকাশক্তি পূর্ণের মতো সমান। তাই আত্মার অংশকল্পনা মিথ্যা।

আমাদের individual (ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টি) সত্তা universal (সার্বভৌমিক অখণ্ড) সত্তার স্বরূপ। যেমন বিম্ব আর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব বিম্ব থেকে আলাদা নয়—অভিন্ন। ব্রহ্ম বিম্ব আর individual বা ব্যষ্টি আমরা সকলে প্রতিবিম্ব।[৪২] এখন জিজ্ঞাস্য হোতে পারে প্রত্যেক প্রাণীর আত্মা যদি ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন হয় তবে প্রাণী তো অসংখ্য, সুতরাং অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে আত্মা বা ব্রহ্মও তাহোলে অসংখ্য। তার উত্তর হোল আকাশে সূর্য একটাই, কিন্তু একশোটা পাত্রে জল রাখলে ঐ একই সূর্যের প্রতিবিম্ব একশোটাতে পড়বে। কিন্তু সত্যই কি সূর্য একশোটা? আধার কেবল ভিন্ন, আধেয় এক ও অভিন্ন। বিচিত্র আধারে প্রতিবিম্ব বিচিত্র হোলেও সূর্য একটাই। সে'রকম ব্রহ্ম এক, কিন্তু অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে তার প্রতিবিম্ব অনেক, আর প্রতিবিম্ব অনেক হোলেও বিম্ব আসলে একটাই। তাই বেদান্তে ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন। মহারাজ, ধর্ম বস্তুটি কি?

স্বামিজী মহারাজ। ধর্ম তিন রকমের—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। এখন তোমরা কোন্ ধর্ম জানতে চাচ্ছ?

প্রশ্ন। আধ্যাত্মিক।

স্বামিজী মহারাজ। আধ্যাত্মিক ধর্মের বিষয় হোলেন শরীরী আত্মা। শরীরে যিনি থাকেন তিনি শরীরী। তিনি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। আসলে আত্মা ও ব্রহ্ম একই। যে প্রাণালী দিয়ে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করা হয় তার নাম আধ্যাত্মিক ধর্ম। আধ্যাত্মিক ধর্মের আরম্ভ হয় যখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার

আকুলতা মানুষের মধ্যে জাগে। আত্মা ও পরমাত্মা—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্বন্ধ তা নির্ণয় করার নামই 'ধর্ম'।

যাদের আমরা সান্ত বা সীমাবদ্ধ বলি তারা আসলে অনন্তের এক একটি অংশ। ঘরে বাতাস আছে, সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করলে সুতরাং ঘরের বাতাস সীমাবদ্ধ হোয়ে থাকলো। এখন হয়তো বলতে পার যে অনন্ত আকাশকে তুমি সীমাবদ্ধ করলে। কিন্তু তা কি সত্য? অনন্ত আকাশের অংশমাত্রকে তুমি সীমাবদ্ধ করলে, আর যা সীমাবদ্ধ তা অনন্ত আকাশের একটা অংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়; তেমনি এক একটি প্রাণীর মধ্যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান, সকল জীবাত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মারই স্বরূপ। অনন্তের অংশ কল্পনা করলেও তাই অংশ অনন্ত। অদ্বৈতবাদীরা এই অংশ-অংশী ভাব স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদীরাই ভেদ স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদীদের কাছে প্রতিটি জীবাত্মা পূর্ণ পরমাত্মা থেকে অভিন্ন।

প্রশ্ন। মহারাজ, অপরাপর অবতারেরা যা preach (প্রচার) করে গ্যাছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তা থেকে কোন-কিছু নতুন করেছেন কি?

স্বামিজী মহারাজ। নতুন কি আর করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন-কিছুকে ভাঙার জন্য আসেন নি, বরং গড়তে এসেছিলেন। যে সত্য অনন্তকাল চলে আসছে তাকেই তিনি নতুন ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে reveal (প্রকাশ) ক'রে গেলেন—এই যা। সনাতন সত্যকে তিনি নতুন রূপ দিয়ে প্রচার করলেন।[৪৩]

প্রশ্ন। সনাতন ধর্ম যদি আবহমান কাল থেকে চলে আসে ও তার সত্য অটুট থাকে তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আসার বা সার্থকতা কি?

স্বামিজী মহারাজ। সার্থকতা ছিল, কেননা পূর্ব ধারা বা গতির ব্যতিক্রম হয়েছিল। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছেন:

'যখনই ধর্মে গ্লানি সৃষ্টি হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই। একটা' ধর্ম বা সাধনার ধারা চলতে চলতে তার course-এর (ধারা বা প্রবাহের) মধ্যে মাঝে মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনের সময় সমগ্র বিশ্বে একটা আলোড়ন, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির ভাব দেখা দেয়। একেই বলে ধর্মগ্লানি। ধর্ম বা ধর্মসাধনার যা-কিছু ভাল তাকে ত্যাগ ক'রে মানুষ তখন অসচ্ছল পথে চলতে থাকে আর তখনই কোন মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই লোকই perfect ideal man (সিদ্ধ ও আদর্শ মানুষ); তাঁকে শাস্ত্রে মহাপুরুষ, ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা, অবতার এই সব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যিনি সত্যকে জীবনে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন তিনিই সত্য প্রচার করার অধিকারী। অবতারদের তাই আধিকারিক পুরুষ বলে। শ্রীশ্রীঠাকুর তো নিজেই বলেছেন: 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তবে বেদান্তের দিক দিয়ে নয়'। বেদান্ত অবতার স্বীকার করে না। তবে শঙ্করাচার্য আধিকারিক পুরুষের কথা ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। বেদান্তের মতে জগৎ বা সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা। শঙ্করাচার্য 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন কোন উদ্দেশ্য বা প্রযত্ন ছাড়া স্বভাবত প্রবাহিত, ঈশ্বরও তেমনি খেলার মতো এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন, এতে তাঁর নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকে না।[৪৪]

অবতারের কথাও তাই। অদ্বৈতবাদীদের কাছে ব্রহ্ম ছাড়া আর সব মিথ্যা কিনা পরিবর্তনশীল। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরাই অবতার স্বীকার করেন।[৪৫] অবতারেরা ঈশ্বরের অংশ। মানুষকে ধর্মের বা সত্যের নূতন আলোক দেবার জন্য তাঁরা মানুষের মতো রূপ ধারণ ক'রে আসেন। তাতে তাঁদের নিজেদের কোন অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি থাকে না, জীবের কল্যাণসাধন হয় একমাত্র

ব্রত।[৪৬] শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের মর্মকথা তাই। সনাতন সত্যকে উপলব্ধি ক'রে মানুষ পরমকল্যাণের অধিকারী হোক এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সত্য লাভ করার পথকে তিনি নতুনভাবে এ'যুগে প্রচার করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তো মোটেই লেখাঁপড়া জানতেন না, কিন্তু সকল ধর্ম ও সাধনার ভিতর এক শাশ্বত সত্য আছে একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। চৌষট্টিখানি তন্ত্র সাধন করেও তিনি খৃষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব ও বেদান্ত সকল রকম মতের সাধন ক'রে দেখলেন সত্য বা লক্ষ্য সবারই এক, পথ বা প্রণালী কেবল আলাদা। তিনি প্রচারও করলেন: "যত মত তত পথ",—সকল ধর্ম ও সাধনার ভিতর সত্য এক, পথই কেবল ভিন্ন ভিন্ন। এখানে ধর্ম বলতে ধর্মমত ও পথ, নচেৎ আসল ধর্ম তো এক, অখণ্ড ও সার্বভৌমিক। শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মমতকে পথ বলেছেন। সম্প্রদায়ভেদে ধর্মমত অসংখ্য। আমরাও তাই বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, গৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ এঁদের সকলের পূজা করি এবং সকলকেই সম্মান ও সমান শ্রদ্ধা দান করি।

প্রশ্ন। জন্ম ও মৃত্যু বলতে কি বোঝায়?

স্বামিজী মহারাজ। Distribution is life and unification is death. (বিস্তারই জীবন আর সংকোচ মৃত্যু)। Expansion-ই (বিস্তারই) জীবন আর contraction (সংকোচ) মৃত্যু। মনে কর একজন কুমোর (কুম্ভকার) একতাল কাদা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঘটী বাটী জিনিস তৈরী করলো। একেই distribution অথবা expansion (বিস্তার) বলে। Distribution (বিস্তার) মানে variation (বৈচিত্র্য)। একতাল কাদা ছিল, তা থেকে সৃষ্টি হ'ল হাঁড়ি, কলসী, গ্লাস প্রভৃতি। সেগুলো ভেঙে ফেল্লে, তারা আবার একতাল কাদাতেই পরিণত হোল আর এটাই unification বা contraction (একত্রিত করা বা সংকোচ)। এই unification-ই death কিনা মৃত্যু।

Struggle fot existence (জীবনসংগ্রাম) হোল life (জীবন) আর satisfaction (নিশ্চেষ্টতা) death (মৃত্যু)। যেমন তুমি বেঁচে আছ আর তার প্রমাণই you are fighting for life with your circumstances, surroundings or environments (তুমি বাঁচার জন্য তোমার জীবনের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করছ)। Fighting (যুদ্ধ) মানেই struggling for expansion, which is life (প্রসার বা জীবনের জন্য যুদ্ধ করছ— যা জীবন)। প্রসার ও উন্নতির জন্য এই যে জীবনসংগ্রাম এটাই তোমার existence এবং life-এর (সত্তা ও জীবনের) পরিচয়।

প্রকৃতির ভিতর দুটো শক্তি আছে ঃ একটা positive (ইতি বা অস্তিবাচক) আর অপরটা negative (নেতি বা নাস্তিবাচক)। জীবনে positive ও negative (অস্তি ও নাস্তিবাচক) শক্তিদুটোর মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলেছে আর opposite (বিরুদ্ধ) শক্তিদুটোর অনবরত দ্বন্দ্ব থেকে হোচ্ছে সৃষ্টির বিকাশ। সৃষ্টি কিনা দ্বন্দ্ব। সৃষ্টিই life (জীবন)। তাই struggle for existence (জীবনসংগ্রাম) প্রাণের লক্ষণ আর satisfaction (নিশ্চেষ্টতা) হোল মৃত্যু। Satisfaction (নিশ্চেষ্টতা) মানে তুমি জীবনে আর কিছু চাও না-আর চাও না ব'লে mental (মানসিক) বলো physical (দৈহিক) বলো সমস্ত প্রচেষ্টাই বন্ধ হোয়ে যায়। সন্তুষ্ট মানে নতুন-কিছু করার বা পাবার জীবনে আর কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই, সুতরাং থাকা বা না-থাকা তোমার পক্ষে সমান হোয়ে দাঁড়ায়। সংসারে এই প্রয়োজন না থাকার নাম মৃত্যু। সংসারে বেঁচে থেকেও কোন বিষয়সম্বন্ধে aspiration (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) ও activity (কর্মকুশলতা) যদি না থাকে তবে তা মৃত্যুর সামিল।

প্রশ্ন। মহারাজ, মুক্তি কি এ'জীবনে লাভ করা যায় ?

স্বামিজী মহারাজ। মুক্তি এ' জীবনেই লাভ করা যায়। তুমি আসলে যা তা জানার নামই মুক্তি। অজ্ঞান-অন্ধকারের নাশই মুক্তি। বন্ধন ও মুক্তি আসলে মনের সৃষ্টি। মনে করছ তোমার বন্ধন আছে, কাজেই আছে, আবার মনে কর যে বন্ধন নেই, দেখবে সত্যই বন্ধন নেই। আমি বদ্ধ, আমি সংসারী, আমি পাপী-তাপী এ' সব মনে করো বলেই বদ্ধ, সংসারী ও পাপী-তাপী। কিন্তু মনে করো তুমি মুক্ত, তুমি অসংসারী—শুদ্ধ বুদ্ধ ও চিরপবিত্র, দেখবে সত্যই তাই উপলব্ধি করবে। এর জন্য চাই সাধনা। সাধন কিনা যত্ন। যুগ-যুগান্তরের সংস্কার কি আর একদিনে যায়! তার জন্য অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাসই সাধনা। 'যন্ সাধন্ তন্ সিদ্ধি'। দিনরাত চিন্তা করো 'তোমার পাপ নাই, তুমি পবিত্র, আত্মস্বরূপ এবং সংসার তোমায় বন্ধন করতে পারে না, বাসনা তোমায় প্রলুব্ধ করতে পারে না, তুমি বাসনা-জয়ী চিরমুক্ত', দেখবে সত্যই তাই উপলব্ধি করবে। তখন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে আলোকিত হোয়ে উঠবে। কেবল 'মুক্তি' 'মুক্তি' ক'রে চেঁচালে কি হবে, মুক্তির means বা উপায় খুঁজে বার করো, তারপর উঠে পড়ে লাগো। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' এই রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ক'রে সাধনে লেগে পড়তে হয়। ম্যাদাটে চেষ্টায় কিছু হয় না। তাই রোক্ চাই। কেবল মুখে না ব'লে হাতেনাতে কিছু কর দিখিনি, নিশ্চয়ই হবে। এ' জীবনেই মুক্তিলাভ করার জন্য ব্যাকুলতা চাই, আর চাই দৃঢ় ইচ্ছা ও ঐকান্তিক চেষ্টা। চাও না বলেই তো পাও না। মন ও মুখ এক ক'রে মুক্তি চাও, নিশ্চয়ই পাবে।

প্রথমে মানুষ হোতে শিক্ষা করো। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন মানহুঁস। যিনি জ্ঞানোপলব্ধির জন্য সচেতন ও হুঁসিয়ার তিনিই মানুষ। আমরা যে অনন্তের সন্তান এ'বিষয়ে আমাদের হুঁশ নেই। আমরা নশ্বর দেহকে আত্মা ব'লে ভেবে সংসারে যত অনর্থ সৃষ্টি করি। সৎ যা তা

আত্মস্বরূপ আর অসৎ সমস্তই মায়া বা অবিদ্যা। তবে 'সদসৎ'-ও relative world-এর (আপেক্ষিক জগতের) কথা। আমরা একটা জিনিস অপরের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলি ওটা ভাল আর এটা মন্দ। আপেক্ষিক জগৎ তাই দ্বৈত। সৃষ্টির আগে আত্মারই একমাত্র সত্তা ছিল। তিনি দুই হওয়াতে বিশ্ব সৃষ্টি হোল। 'দুই' জ্ঞান মায়া থেকে সৃষ্টি হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মায় বা ব্রহ্মে মায়ার কল্পনা করেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হোল। এক ছিল, দুই বা বহু হোল এর নাম সৃষ্টি। সৃষ্টি মানে দ্বৈত বা বৈচিত্র্য। সৃষ্টি আছে বলে আমরা সৎ ও অসৎ এই পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি শব্দ ব্যবহার করি। দ্বৈতকে অপেক্ষা করেই সৎ ও অসৎ। তবে আত্মা বা ব্রহ্মকে আমরা সৎ বলি কোন অসৎ ধারণাকে অপেক্ষা ক'রে নয়, কেননা আত্মা স্বভাবত অদ্বৈত। আসলে ব্রহ্মই সত্য আর বৈচিত্র্য বা মায়া মিথ্যা। আত্মায় মায়ার নামগন্ধ নেই অথচ মায়া আরোপ ক'রে আমরা আত্মাকে বলি 'সৎ'। সৎ কিনা 'অস্তি' বা সত্তা তথা existence। সৎ বোধের বা উপলব্ধির বিষয়। বোধ কিনা শুদ্ধজ্ঞান, কিন্তু মন দিয়ে কল্পনা ক'রে আমরা বলি আত্মা 'সৎ'। 'সৎ'-ই আবার আত্মা। সমস্ত ভালোর ধারণাও এই 'সৎ' থেকে সৃষ্টি হয়। যেটা permanent বা শাশ্বত সেটাই সৎ। আত্মা permanent অর্থে নাম-রূপের মধ্যেও আত্মার কোন বিকৃতি হয় না, তিন কালেই আত্মা শুদ্ধ ও অবিকৃত। নাম ও রূপই আসলে মায়া। আত্মায় দেশ ও কাল আমরা কল্পনা কিনা আরোপ করি, অথচ কল্পনা বা আরোপ মিথ্যা। জগৎ পরিবর্তনশীল, তাই জগৎকে আমরা অসৎ বলি। সাধারণ মানুষ আমরা দ্বৈত বা ভেদভাব নিয়ে জগতে বাস করে, তাই আত্মস্বরূপ হোলেও নিজেদের মরণশীল ব'লে মনে করি। মরণশীল ভাব অজ্ঞান থেকে সৃষ্টি হয়। তাই সদসদ্‌বিচার প্রয়োজন। দেহ আত্মা নয়, দেহের ধ্বংস আছে সুতরাং অনিত্য, নিত্য একমাত্র আত্মা—এ'কথার বার বার অনুশীলন

করার নাম 'সদসদ্‌বিচার'। সদসদ্‌বিচারে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হোলে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মাসম্বন্ধে অজ্ঞান দূর হোলে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হয়। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ।

প্রথম প্রথম কি করলে প্রকৃত উন্নত ও পবিত্র হোতে পারি সেটাই আমাদের চিন্তা করা দরকার। তারজন্য দরকার চরিত্রগঠন, শিক্ষা, সত্যকথন, ভাল হবার ইচ্ছা ও সত্যবস্তুকে জানার একান্ত আকুলতা। প্রথম থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এ'সব শিক্ষা দিতে হয়। যাতে তারা জীবনে আদর্শ লাভ করে, দেশ ও দশের সেবার আত্মোৎসর্গ করতে পারে সে'সব ছেলেবেলা থেকে তাদের শিক্ষা দিতে হয়। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' শুধু সন্ন্যাসীর জীবনে নয়, প্রতিটি মানুষেরই তা আদর্শ হওয়া উচিত। এজন্য চাই শিক্ষা, শিক্ষাই সকল সদ্‌গুণের মূল। প্রাচীনকালে ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠানো হোত আদর্শ শিক্ষালাভ ও পবিত্রভাবে জীবন গঠন করার জন্য। চরিত্রগঠন ও যথার্থ শিক্ষা লাভ ক'রে তারা পরে আদর্শ গৃহস্থ হোত। তখনকার দিনে জীবনের motto (মূলমন্ত্র) ছিল আগে শিক্ষা তারপর জীবনগঠন এবং তারপর ইচ্ছা হয় সংসার করো। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করো।

শিক্ষার দোষে আজকাল সমাজের এই অধঃপতন। অর্থকরী বিদ্যায় আছে কি, অর্থকরী বিদ্যায় নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও টাকাকড়ি উপার্জন এবং স্বার্থের ভাবকেই ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। এ' বিদ্যা তাই অবিদ্যার সামিল। অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ। বিদ্যায় বন্ধন দূর হয় ব'লে বিদ্যার আর এক নাম 'জ্ঞান'। কিন্তু আজকালকার অর্থকরী বিদ্যায় বন্ধন নাশ হওয়া তো দূরের কথা, অবিদ্যাবন্ধনের নাগপাশেই মানুষ বদ্ধ হয়। যে লোক বাসনা

ও স্বার্থের দাস সে আর পরার্থে জীবনোৎসর্গ ক্যামন ক'রে করে বলো। তার জন্য চাই ত্যাগ। স্বার্থপরতার নামগন্ধ থাকলে দেশ ও দশের সেবা এবং কল্যাণসাধন করা যায় না। সমস্ত দেশটা যেন paralysed (অসাড়) হোয়ে ঘুমিয়ে আছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি সকলের মজ্জায় মজ্জায় ঐ স্বার্থ, ত্যাগের নামগন্ধ নাই, হৃদয়ে উৎসাহ ও শরীরে শক্তি নাই, সুতরাং দেশের কল্যাণই বা ক্যামন ক'রে করবে লোকে।

ধর্মই জাতির মেরুদণ্ড। তবে ধর্ম প্রাণের কিনা অনুভূতির বস্তু। কতকগুলো doctrine, dogma আর কুসংস্কার ও লোকাচারই ধর্ম নয়। Doctrines, dogmas, rituals বা ceremonies ধর্মের বহিরাবরণ মাত্র। তবে এগুলি seoondary (গৌণ) ও non-essential, সুতরাং জীবনের অপরিহার্য বস্তু নয়। ধর্মের primary (মুখ্য) ও essential (প্রয়োজনীয়) জিনিস হোল আত্মার অনুভূতি। তুমি দুর্বল ও মরণশীল মানুষ নও, অমৃত ও ব্রহ্মস্বরূপ— এটা বোঝার নামই ধর্ম। জীবনে ভয় ত্যাগ করতে হয়। 'দ্বৈতাদ্ ভয়ম্'— দুই বা দ্বৈতজ্ঞান থেকে ভয় সৃষ্টি হয়। ভয়ই অজ্ঞান, সুতরাং বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়ঃ 'সর্বং বস্তু ভয়াম্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্য-মেবাভয়ম্'। জগৎ দ্বৈত ব'লে জগতের সকল-কিছুই ভয়ের কারণ, একমাত্র বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণা না এলে অভয়রূপ অদ্বৈতজ্ঞানের অনুভূতি হয় না। তাই ত্যাগই অভয় আর স্বার্থপরতা ভয় ও দুর্বলতা। 'Cowards die many times before their death' (কাপুরুষেরা প্রকৃত মৃত্যুর আগেও অনেকবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়)। সমস্ত দেশকে তাই অভয়ের বাণী শোনাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ, তবেই দেশের সুদিন আবার ফিরে আসবে।

নিজের স্বাধীনতা আগে তারপর দেশের স্বাধীনতা। First be and then make (আগে নিজেকে তৈরী করো, তারপর দেশ ও দশকে

তৈরী করবে)। যে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না সে অপরকে ক্যামন ক'রে মুক্ত করবে। ইংরাজদের তোমরা নিন্দা করো, কিন্তু ওদের কটা গুণই বা গ্রহণ করতে পেরেছ, বরং imitate-ই (নকলই) করেছ ওদের মন্দগুলোকে। ওদের ভিতর unity, cleanliness, fellow-feelling (একতা, পরিচ্ছন্নতা, পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা) ও নিজের জাতির উপর sympathy-র (সহানুভূতির) ভাব লক্ষ্য করার বিষয়। ওদের সদ্‌গুণের কটাই বা তোমরা imitate (অনুসরণ) করতে পেরেছ। তোমাদের ভিতর না আছে স্বাস্থ্যবোধ, একতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা এবং না আছে পরোপকার করার মনোবৃত্তি, বরং আছে দুর্বলতা, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। এই পরশ্রীকাতরতার জন্যই তো সমস্ত দেশটা আজ উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। একজনের ভাল আর-একজন কিছুতেই দেখতে পারবে না। কিন্তু ইংরাজ বা আমেরিকানদের দেখ—নিজেদের জাতের জন্য তাদের কী দরদ! কেউ হয়তো কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, কিসে সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবে তারজন্য তারা সর্বরকমে তাকে সাহায্য করে, আর তোমরা,—সাহায্য করা তো দূরের কথা, কিসে তার ব্যবসা নষ্ট হবে এ' চেষ্টাই কেবল করবে। অবশ্য সকল লোকের কথা আমি বলছি না, ভাল ও মন্দ লোক সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। History repeats itself (ইতিহাসে যা একবার ঘটেছে তার পুনরাবর্তন আবার হবে)। এদেশ আবার উঠবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-আবির্ভাব সে'দিনের সূচনাই ঘোষণা করছে! সিংহশক্তি সকলের ভিতর ঘুমুচ্ছে, আবার জাগবে, দেশের সুদিন আবার ফিরে আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্মের মধ্যে যেন সংকীর্ণতার ভাব কিছুমাত্র না এসে পড়ে এদিকে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর সবারই ঠাকুর। কেবল ব্রাহ্মণ, অভিজাত বা ধনীদের জন্য নন,

তিনি দীন-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, মুচি-মুদ্দফরাস সকলেরই জন্য। তাঁর উপর সকলের সমান অধিকার। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামী তাঁর উদার মতের উপর চালাতে কখনো চেষ্টা করো না। তিনি নিজে সকল গোঁড়ামীর পারে গিয়েছিলেন। এখন যদি বলো তিনি বামুনের হাতেই শুধু খাবেন আর অপরের হাতে খাবেন না তাহোলে আমি বলবো তোমারা নতুন একটা মত সৃষ্টি করতে চলেছ। বাম্‌নামীর গোঁড়ামী ঢুকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ভাবকে নষ্ট করা কখনই উচিত নয়। তাঁর মধ্যে জাতাজাতির বালাই ছিল না। তবে অধিকারদোষ তিনি মানতেন দেখেছি। কোন খারাপ চরিত্রের বা কোন মাম্‌লা-মোকদ্দমাবাজ্ লোক, তার হাতের ছোঁয়া জিনিস তিনি খেতে পারতেন না। দিলেও তা তিনি বুঝতে পারতেন। কিন্তু এ' তোমাদের কি হীনবুদ্ধি যে বামুনরান্না ভাত ছাড়া অন্য ভাত তিনি খাবেন না! তাহোলে যাদের তোমরা ছোট জাত বলো বা অস্পৃশ্য ব'লে ঘৃণা করো তারা কিছু নিবেদন ক'রে দিলে কি শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রহণ করবেন না? তা কেন। তিনি ব্রাহ্মণের যেমন ঠাকুর তেমনি শূদ্রেরও; তিনি বড়লোকের ঠাকুর আবার গরীবেরও ঠাকুর। তিনি তোমাদের মনটাই কেবল দ্যাখেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে জাত বা যে লোকই তাঁকে অন্ন বা যে কোন জিনিস নিবেদন ক'রে দিক না কেন তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। ভেদভাব অজ্ঞানীদের কাছে। তিনি যদি এত জাতাজাতির বালাই বা বড়লোক গরীব ভেদভাবই রাখবেন তবে এ'যুগের ঠাকুর হোয়ে এলেন কেন! ওসব গোঁড়ামীর ভাব মন থেকে একেবারে ধুয়ে-মুছে দাও। ওসব কুসংস্কার। কুসংস্কারই মায়া। সংস্কারবর্জিত না হোলে ভগবান লাভ হয় না। সকল সংস্কারের পারে যেতে হবে আর তবেই মুক্তি!

তোমরা যে যার ব্যক্তিগত সংস্কার বা ভাব অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘাড়ে চাপিয়ে বলতে চাও সেটাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব কোনদিন সংকীর্ণ নয় জানবে। যে যার individual opinion (ব্যক্তিগত অভিমত) দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের universal (সার্বজনীন) মত বা ভাব ব্যাখ্যা করতে যেও না, তাতে তাঁকে ছোট করাই হবে। তিনি কি আর তোমাদের একটা মাত্র মত বা ভাবের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকেন? অনন্তভাবসমুদ্র শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁর ভাবের কি আর ইয়ত্তা আছে! তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বা মত বুঝতে হোলে নিজের ব্যক্তিগত অভিমতকে আগে বর্জন করতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ কিরকম জান? আমার শ্রীরামকৃষ্ণস্তবেই বলেছি,

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরহংসং রামকৃষ্ণং ভজাম ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর তো আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না! মানুষের ছদ্মবেশে এসেছিলেন মানুষেরই দুঃখ-ক্লেশ দূর করার জন্য। তিনি নিজেই বলেছেন 'এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্যপরিভ্রমণ'।

দিনরাত্রি বিচার করবে 'আমিকে'। কেবল বাইরের আচার-বিচার, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির paraphernalia নিয়ে ডুবে থাকলে চলবে না। কর্ম করলেও বিচার চাই, নচেৎ কর্মপাকে জড়িয়ে পড়বে। কর্মের মধ্যে 'আমি' 'আমার' অভিমান ভাল নয়, তাতে সংসারবন্ধন বাড়ে বই কমে না। কর্মের মধ্যেও ত্যাগের ভাব থাকা দরকার। সর্বদা ধ্যান-ধারণা ও সদসদ্‌বিচার করবে। সংসারে থেকেও সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। বিরজা ক'রে সন্ন্যাসী হোলে, কিন্তু পূর্বাশ্রমের কিনা বাপ-ঠাকুরদার সংস্কারের প্রভাব এড়াতে পারলে না। এতে সন্ন্যাসাশ্রম ও সংসার দুকূলই নষ্ট হয়। আসলে

সংস্কারই বন্ধন। সংস্কার দূর না হোলে জীবনে কিছুই হোল না জানবে—তা সাধু হও আর গৃহস্থই হও,—গৃহী হও আর ধনীই হও। নিজের মধ্যে ডুবতে চেষ্টা করো। আগে চাপরাশ নাও, তারপর নিজেকে প্রচার করো। চাপরাশ ছাড়া প্রচার করলে মায়ায় বা সংসারে জড়িয়ে পড়বে। কল্পনা ও আরোপের কিছু কিছু দরকার আছে। ভক্তির বা কর্মের পথ ঠিক ঠিক জ্ঞানীদের জন্য নয়। তবে জ্ঞানবিচার সবাই করতে পারে না ব'লে গোড়ার দিকে ভক্তি বা কর্মের পথ ভাল। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা। তারা শিখা সূত্র দণ্ড কমণ্ডলু সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছে, তাদের তাই সর্বদা আত্মবিচার করা উচিত। নইলে যদি বৈরাগী বা ভট্‌চায্যিদের দলে নাম লেখাতে আরম্ভ করো তবে সন্ন্যাস নিয়ে আর ফল কি হোল! তার চেয়ে আদর্শ গৃহস্থজীবন বরং ভাল। জীবনে যা-কিছু করবে ভাববে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য করছ। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য কর্ম করলে দোষ নাই। এসব কাজ মানুষকে বাঁধতে পারে না, বরং তাতে স্বার্থভাব দূর হয়। মিথ্যা নাম-যশ আর ভোগসুখ নিয়ে কি হবে বলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন এ'সব আমড়ার মতো, শাঁস আর আঁটিটাই সব, খেলেও আবার অম্বল হয়। এ'যুগে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ অভিনব ও অনুকরণীয়। তাঁর উপদেশ ভাল ক'রে পড় ও ধ্যান করো, তারপর নিজেদের জীবন সেই আদর্শে তৈরী করো। শ্রীশ্রীঠাকুর এই করেছেন, ঐ করেছেন, কাম-কাঞ্চন স্পর্শ করতেন না, বার বছর তপস্যা করেছেন—এসব কেবল মুখে বল্লে কি হবে, শ্রীশ্রীঠাকুরের-জীবনাদর্শ চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তা follow (অনুসরণ) করার চেষ্টা করো। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন সকলের জন্য। নিজের জীবন দিয়ে জগতের লোককে শিক্ষা দেবার জন্যই তাঁর আসা। তিনি ideal type (আদর্শ), তোমরা তাঁকে অনুসরণ করবে, তাঁরই জীবনের আদর্শ অনুসরণ ক'রে নিজেদের

জীবন গড়ে তুলবে। মুখের কথায় কিছু হবে না। হয় শরণাগত হও—নয় বিচার করো। দুটোর একটা চাই। যখন মনুষ্যজন্ম নিয়েছ তখন ভগবান লাভ এ'জীবনে করা চাই। এ'জীবনেই ভগবান লাভ করবে এ'রকম মনের জোর চাই। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু,—সকলের আশাই পূর্ণ করেন। তবে চাইতে হয়, অন্তরের দ্বারে knock করতে (ধাক্কা দিতে) হয়। জ্ঞানের পথ দরজা দিয়ে বন্ধ। দরজা হোল সংস্কার, বাসনা, অজ্ঞান বা মায়া। সাধনভজন ও জপ-তপ, অহরহঃ জ্ঞানবিচার ও আকুলতার নাম knock করা (ধাক্কা দেওয়া)। একবার জ্ঞান লাভ হোলে সব হোল। তখন মুক্ত হোয়ে সংসারে থাক আর অরণ্যেই থাক অজ্ঞান বা সংসার আর বাঁধতে পারে না, তখন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ',—সকল গ্রন্থিই খুলে যায়, সকল সংশয় বা সন্দেহ দূর হয়, সকল কর্মের বন্ধন মুক্ত হয়। তখন পরাবর ব্রহ্মের উপলব্ধি অর্থে নিজের সঙ্গে সঙ্গে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সকলের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য অনুস্যূত দ্যাখে। এটাই মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য।

॥ পাদটীকা ও বিবরণী ॥

1. "Lastly, in the Nineteenth Century, there came Bhagavān Sri Rāmakrishna with his mission, for the people of this age and for the future. His message was to establish the universal religion and to destroy the evils of sectarianism, bigotry and narrow-mindedness. * * It is believed that His message is most fitted for the prsent age of science and rationalism. Rāmakrishna gave a death blow to all religious intolarance and fanaticism by emphasizing the truth that all sects are like different paths which lead to the same goal. He propagated His mission among the most enlightened classes of people in modern India, and it is now spreading all over the world. In this cycle of reason and science, one cannot remain sectarian, and hold dogmatic ideas and narrow views. This is the spirit of the age, and it needs such a manifestalion as the embodiment of non-sectarianism, toleration and universal sympathy for all religions."

—*Abhadānanda*

—'অবশেষে উনবিংশ শতকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগ ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য তাঁর বিচিত্র ধর্মবাণী নিয়ে আবির্ভূত হোলেন। ধর্মের নামে গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতাকে দূর ক'রে প্রকৃত বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর বাণীর উদ্দেশ্য। * * তাঁর বাণী এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যুক্তিবাদের যুগে সম্পূর্ণ উপযোগী ব'লে অনেকে বিশ্বাস করেন। সমস্ত ধর্মমত একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় এই তত্ত্বকে প্রতিপন্ন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ পরধর্মবিদ্বেষ, গোঁড়ামী ও অনুদারতার উপর মৃত্যুশেল নিক্ষেপ করেছেন। বর্ত্তমান ভারতের প্রধান প্রধান মনীষীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এই উদার বাণী প্রচার করেছিলেন। সেই বাণী ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রচারিত হোল। এই যুক্তি ও, বিজ্ঞানের যুগে এখন আর কেউ ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলির ভুলে যুক্তিহীন নিয়ম ও প্রথা মানতে চায় না। এ' রকম মনোভাব বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। এজন্য বর্ত্তমান যুগ চায় এমন একটি আদর্শ যা অসম্প্রদায়িকতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সকলের প্রতি সমান সহানুভূতিপূর্ণ ভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ'।

2. "এ'অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব ইনি দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা ধর্মবিশেষের সম্পত্তি নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই একদিন শান্তি লাভের জন্য ইঁহার উদার মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। * * দিনের পর দিন,- মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইবে ততই এ' অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল ধর্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে, কাহার সাধ্য ইহার গতিরোধ করে!"—স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (৪র্থ খণ্ড—গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ৭ম সং)।

স্বামী অভেদানন্দ ॥

॥ স্বামী অভেদানন্দ

॥ পাদটীকা ও বিবরণী ॥

॥ রাজযোগ ॥

১। ব্রহ্মপুরাণ ১।৫৭

২। বৈজ্ঞানিক জি. জেমস জিন্স একথা অন্যভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "As the existing universe dissolves away into radiation. * * new heavens and a new earth coming into being out of the ashes of the old" (—*The Universe around Us,* 1933 p. 349.)। Old and new-র ক্রম-আবর্তনও প্রবাহাকারে নিত্য।

৩। মুণ্ডক উপনিষৎ ১।৭; ৪। মুণ্ডক উপনিষৎ ২।১; ৫। মুণ্ডক উপনিষৎ ১।৮

৬। আপেক্ষিক সত্য অর্থে দ্বৈতজ্ঞান (relative reality)—যা পারমার্থিক সত্য বা absolute reality নয়।

৭। 'কর্ম' অর্থে শাস্ত্রকারেরা বর্ণাশ্রমবিহিত কর্তব্য বলেছেন।

৮। যতকাল কর্ম তার ফলও ততকাল স্থায়ী, তাই কর্মের ফলকে 'অমৃত' বলা হয়েছে।

৯। সাংখ্যদর্শন ১।৬৭; ১০। শাংখ্যসূত্র ২।৯; ১১। বৈশেষিকদর্শন ১।২।১

১২। "নিত্যং পরিমণ্ডলম্।"—বৈশেষিকদর্শন ৭।১।২০

পরমাণু অথবা atom বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতে ছিল "a fixed unalterable mass"। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল একে বলতেন "the imperishable foundation stones of the universe"। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে পরাণু ছিল "uncreatable, unalterable and indestructible"। স্যর জে. জে. টমসন এবং তাঁর অনুবর্তীরা atom-কে বিভক্ত ক'রে তার রহস্য ভেদ করেন। পরে প্রমাণিত হোল "the atom was built up of electrified particles"। নিউটনের সমর্থিত "a fixed mass" পরে "an aggregate of rest mass and energy"-তে

পরিণত হোল। বৈশেষিকবাদীরা হয়তো বলবেন তাঁদের পরমাণু বিজ্ঞানের atom-এর চেয়ে আরও অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব সুতরাং নিত্য। প্রকৃতই বিজ্ঞানের atom এবং বৈশেষিকদের স্বীকৃত atom এক পর্যায়ভুক্ত নয়।

১৩। সাংখ্যসূত্র ১।৭২ ১৪। মনুসংহিতা ১।৫

১৫। সমগ্র বিশ্ব যখন অবিভক্ত, তমাসাচ্ছন্ন, বায়ুশূন্য ও কারণসমুদ্রে লীন ছিল তখন এক অতীন্দ্রিয় পুরুষ (নারায়ণ) ঐ কারণসলীলে শয়ান ছিলেন। পরে সেই সলিল থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য বিচিত্র বস্তু সৃষ্টি হয়েছিল। —কূর্মপুরাণ ৬।১-৩

অন্যান্য পুরাণেও এ'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন (১) ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে (ব্রহ্মখণ্ড ৩) আছে: "সমগ্র বিশ্ব প্রাণীশূন্য হোয়ে নির্জন নির্বাত অবস্থায় গভীর অন্ধকারে আবৃত ও শূন্যময় ছিল, তখন ছিলেন একমাত্র পরমাত্মা, আর ছিল আকাশ, কাল ও দিক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (২) মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে সৃষ্টির আগে যখন কিছুই ছিল না তখন এই বিশ্ব নির্বাত, আলোকশূন্য ও সর্বোতভাবে তমাসাচ্ছন্ন ছিল। বিজ্ঞানে এ' অবস্থার একটি রূপ কল্পনা করা হয়েছে ও তাকে বলা হয়েছে a chaotic mass। (৩) বৃহদ্ধর্মপুরাণ ২৫ অধ্যায়ে আছে: 'অন্ধকারময়ং সর্বং * * তপেতি বর্ণযুগলমাকাশাদুদভূন্মৎ ॥৫॥ স শব্দঃ সর্বতো ব্যাপ্তো রবেঃ কিরণবৎ সখি",—অন্ধকারের ভিতর থেকে তখন 'তপঃ অনুষ্ঠান কর' এই শব্দ হোল। তপঃ অর্থে তেজ বা heat.

১৬। ঐতরের উপনিষৎ ১।২; ১৭। ঐতরেয় উপনিষৎ ১।২

১৮। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৫।১৩; ১৯। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।২।২

২০। ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭২।৫ এবং ১০।৮২।৫-৬ মন্ত্র।

২১। "অপ এবং সসর্জাদৌ তাসু বীজমাথাসৃজৎ"—(মনু০ ১।৮)। যদিও মহর্ষি মনু "অপ এব সসর্জাদৌ"—অপঃ বা সলিলই প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল বলেছেন তবু একথা ঠিক যে আকাশ পদার্থ হিসাবে প্রথম সৃষ্ট। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতির অভিপ্রায় তাই। শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণপ্রসঙ্গে ভাষ্যকারেরা বিচার করেছেন তিন ভূতের কথা শ্রুতিতে উল্লেখ থাকলেও

তাদের আগে আকাশ ও মরুতের সৃষ্টি হয়েছিল একথা ধ'রে নিয়ে শ্রুতির অভিপ্রায় পঞ্চীকরণ বুঝতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১।২।২ শ্লোকে পঞ্চভূতের সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। আচার্য শংকরের 'পঞ্চীকরণ' ও তার উপরে সুরেশ্বরাচার্যের 'বার্তিক' দ্রষ্টব্য।

২২। ঋগ্বেদের "তপঃ" আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে "heat-energy" এবং এই energy থেকে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ জিন্স এর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: (১) "The final state of the universe will, then, be attained when * *, and this energy transformed into heat-energy, wandering for ever round space, and when all the weight of any kind whatever, which is capable of being transformed into radiation, has been so transformed." (২ "* * in this low-level heat-energy may, in due course, reform itself into new electrons and protons, * *" —(Jeans ; *The Universe around Us* (1933), p. 3491)।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন নীহারিকাই (Nebula) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। নীহারিকার সর্বাঙ্গে বাষ্প অথবা বা ছোট ছোট জড়কণায় আবৃত থাকে। বাষ্পরাশি পরস্পরের সংঘর্ষণের ফলে ক্রমাগত জ্বলতে থাকে। হাজার হাজার বছর এ'রকম জ্বলতে জ্বলতে পরে নিবে যায় ও তাপ (heat—তপঃ) পরিত্যাগ ক'রে যখন ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করে তখন এক একটি সূর্য বা গ্রহের সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্ লাপ্লাস বলেন সৃষ্টির আদিতে এক অখণ্ড বাষ্পমণ্ডল থেকে ঘনীভূত নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশ্বসংসার কারণাকারে সেই বাষ্পময় পদার্থের ভিতর বিলীন ছিল। ক্রমে তাপ বিকিরণ ক'রে সেই নীহারিকার কুজ্মটিকাগর্ভ থেকে পৃথিবী ও জীবজন্তু প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

সমগ্র সৌরজগৎ যে মহাশূন্যে নীহারিকার আকারে সুপ্ত ছিল এ'রহস্য জার্মাণ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন। কাণ্ট বলেন নীহারিকা থেকে বিক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি জমাট বেঁধে গ্রহ সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্টের পরিকল্পনা ও যুক্তিকে

অনুসরণ ক'রে প্রমাণ করেন নীহারিকার পুঞ্জীকৃত বাষ্পরাশির বাইরে যে সমস্ত অণু-পরমাণু থাকে সেগুলি আভ্যন্তরীণ অণু-পরমাণুর আকর্ষণে পুনরায় ভিতর দিকে যাবার চেষ্টা করে। অণুগুলির এই সংকোচন ও আকর্ষণের আকুলতা থেকে বাষ্পপিণ্ডরূপ নীহারিকা ঘূর্ণায়মান হোতে থাকে। ঘূর্ণায়মান আদিম নীহারিকাই সূর্য এবং সূর্য থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল। একথা কাণ্ট, লাপ্লাস ও পরে সেজ্‌উইক, জিন্স, মোউলটন, জেফরীস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন। কাণ্ট ও লাপ্লাসের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের ভিতর মতভেদও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড (Prof. Whitehead) বলেন: "The doctrine of evolution lies mainly in the province of biology, although it had previously been touched upon by Kant and Laplace, in connection with the formation of suns and planets" (Vide *Science and the Modern World.* p. 122)। ডঃ অটো (Dr. R. Otto (*Naturalism and Religion* p. 240) গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ *Coumic Evolution and Its Purpose*-পুস্তিকায়ও এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

২৩। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।২।২

২৪। ঊনবিংশ শতকের 'বৈজ্ঞানিকেরা এর নামকরণ করেছেন 'the conversation of energy'। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক J. W. N. Sullivan-রচিত *Basis of Modern Science*, pp. 71-72 এবং বৈজ্ঞানিক জিন্স্‌-এর *Mysterious Universe* এবং *Universe around Us*, p. 344 দ্রষ্টব্য।

২৫। বৈজ্ঞানিক স্যর জেমস জিন্সের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়: "At first it is a chaotic mass of fiery gas, but, as it cools, its centre liquifies"। তিনি আরও বলেছেন: "In time, it becomes so cool that a solid crust forms over its surface."—*The Stars in their Courses*, p. 123.

২৬। "তস্য পূর্বে সমুদ্রে যোনিঃ।"—বৃহ° উ° ১।১।৮; "অয়ং (বায়ুঃ) বৈ সমুদ্রঃ"—যজু° ৩৮।৭; "যোঽয়ং (বায়ুঃ) পবতঽ এতস্মাদ্বৈ সমুদ্রাৎ সর্বে দেবাঃ * *।"—শতপথ ব্রা° ১৪।২।২।২।

২৭। ডঃ জিন্স বলেছেন: "As a consequence no fewer than 1,300,000 earths could be packed inside the sun."—*The Stars in their Courses*, p. 19.

২৮। বৈজ্ঞানিক জিন্স *Mysterious Universe*-গ্রন্থে (p. 1) বলেছেন: "* * here and there we come upon a giant star large enough to contain millions of millions of earths".

২৯। 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম'-গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ'কথার উল্লেখ করেছেন।—শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম, পৃ' ৫০-৫১

৩০। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় সূর্য থেকে ৩৬০,০০০ লক্ষ টন ধাতুদ্রব্য (ওজনও) নষ্ট হয়—অর্থাৎ nature ধাতুদ্রব্য absorb ক'রে নেয়। সুলিভান (J. W. Sullivan)-প্রমুখ বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন: 'the sun * * is losing three hundred and sixty thousand million tons of matter every day, * *. (vide *Limitations of Science*, p. 48)। এ'রকম সমস্ত গ্রহ কম ও বেশী প্রতি সেকেণ্ডে ক্ষয় হোতে চলেছে: "The same transformation of material weight into rediation is in progress in all the stars"—vide Jeans: *The Universe around Us*, p. 343.

৩১। ডঃ জিন্স বলেছেন: "Detailed calculation shows that the new-born sun must have had many times the mass of the present sun."—vide *Mysterious Universe*, p. 60.

৩২। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যেদিন লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে যান সেদিন বৈকালে কোন একটি রাস্তায় তিনি সর্বপ্রথম দূরবীনের সাহায্যে ৯১টি চন্দ্রযুক্ত শনিগ্রহ ও আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখেছিলেন। *Leaves from My Diary*-তে (পৃ' ২৯) তিনি লিখেছেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে নিউ ওয়াশিংটন মানমন্দিরে ১৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি শনি, বৃহস্পতি, ইউরেনাস, ধ্রুবতারা ও নীহারিকাস্তর (Nebula Layer) প্রভৃতি দেখেছিলেন। তাছাড়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্ট হ্যামিণ্টনের

(৪,২৫০ ফিট উচ্চ) লিক্ মানমন্দির তিনি পরিদর্শন করেছিলেন। লিক্ মানমন্দির 'শান্তিআশ্রম'-এর পথে পড়ে।

অধ্যাপক জোড (Prof. C. M. Joad) বলেছেন আমেরিকার মাউণ্ট উইলসনের ১০০ ইঞ্চি পরিমিত দূরবীনের ভিতর দিয়ে প্রায় দু'লক্ষ নীহারিকা (Nabulae) দেখা যায়। স্যর জেমস জিন্স হিসাব ক'রে বলেছেন একটা দূরবীনের ভিতরের যে ব্যাস, পৃথিবীর ব্যাস তার চেয়ে হাজার লক্ষ গুণ বড়। কিন্তু তাহলেও ঐ ছোট ব্যাসের ভিতর দিয়ে আকাশে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা দেখা যায়। এক একটি ঘূর্ণায়মান নীহারিকার মধ্যে যে উপাদান থাকে তা দিয়ে হাজার লক্ষ সূর্য সৃষ্টি হোতে পারে। যদি এক হাজার লক্ষকে দু'লক্ষ অথবা আরো হাজার লক্ষ সংখ্যায় বাড়ানো যায় তাহলে যত সংখ্যা হয় ততগুলি সূর্য বা গ্রহ-নক্ষত্র আকাশে আছে এ'রকম কল্পনা করা যায়। স্যর জিন্স বলেন সম্ভবত পৃথিবীতে যাবতীয় সমুদ্রের বেলাভূমিতে যতগুলি বালুকণা কল্পনা করা যায়, আকাশে সূর্য বা গ্রহ-উপগ্রহ প্রায় ততগুলি ('probably something like the total number of grains of sand on all the sea-shores of the world')। সূর্যকে এ'রকম একটি বালুকণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলেও একথা ভুললে চলবে না, সূর্য আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ৩০০,০০০ লক্ষ গুণ বড়।—cf. Prof. Joad : *Guide to Modern Thought*, p. 65.

৩৩। বৈজ্ঞানিক জে. জে. ক্রোথার *An Outline of the Universe*-গ্রন্থে (১ম ভাগ পৃ. ৪৮) লিখেছেন: "The 1oo-inch telescope at Mount Wilson reveals one million photographable stars, 1,500,000,000 in the galactic system"। ডঃ জিন্স *Mysterious Universe*-গ্রন্থে (পৃ. ১) গ্রহদের সংখ্যাসম্বন্ধে বলেছেন পৃথিবীরূপ সমুদ্রের বেলাভূমিতে অসংখ্য বালুকারাশির মতো আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা অগণিত। মোটকথা মাউণ্ট উইলসনে স্থিত দূরবীনে ১৫০ কোটি নক্ষত্রের মোট সন্ধান আজ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকায় প্যাসাডেনার পাহাড়ে ২০০ ইঞ্চি অর্থাৎ

১১ হাতের সামান্য বেশী ব্যাসের ও ৫৫০ মন ওজনের একটি দূরবীন বসানো হয়েছে। প্যাসাডেনার মানমন্দিরের (Observatory) গম্বুজের ব্যাস ১৩৭ ফুট। সেই বৃহৎ দূরবীনের সাহায্যে খালি চোখে দশহাজার মাইল দূরের একটি ছোট প্রদীপশিখাকেও দেখা যায়। সেই দূরবীন দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকাশে একশত কোটি আলোক-বৎসর (light-years— ১৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ + ৩৬৫ মাইল) দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত।

৩৪। জড়বস্তুর observation (নিরীক্ষা) experiment (পরীক্ষা) নিয়ে গবেষণাগারের অনুশীলন বৈজ্ঞানিকদেরও যে ঠিক তৃপ্তি দিতে পারছে না একথা জিন্স-প্রমুখ প্রায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন: "We individuals see the universe only as a traveller sees a landscape lighted up by a flash of lightening, * * We should see it as an ever-changing picture of growth, followed by decay"(—*Stars their Courses*, p. 150)। বৈজ্ঞানিক ডঃ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কথাও তাই। তিনি বলেছেন: "Modern Physics impresses us particularly with the truth of the old doctrine which teaches that there are realities, existing apart from our sense-perceptions. * * these realities are of greater value for us than the richest of the world of experience." (—*Universe in the Light of Modern Physics*, p. 138.)। এ'সম্বন্ধে মনীষী আইনষ্টিনের স্বীকৃতি আরো সুন্দর। তিনি মুক্ত-লেখনীতে স্বীকার করেছেন :"There is only the way of intuition which is helped by a feeling for the order lying behind the appearance"। এই 'order'-ই Divine Order। তিনি দার্শনিক লিবনিজের মতো 'pre-established harmony-কে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। ডঃ ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক রচিত *Where is Science Going*-গ্রন্থে এ্যালবার্ট আইনষ্টিনের Preface, pp. 12. দ্রষ্টব্য। C M. Beadnell তাঁর *Dictionary of Scientific Terms*-গ্রন্থে (p 75) লিখেছেন: "Modern science tends to show that matter is further trans-

mutable into energy and conversely the energy is transmutable into matter"।

৩৫। সাংখ্যের ধারণা অনেকটা বেদান্তের মতো, তবে সাংখ্যের মতে চেতন পুরুষ বহু আর প্রকৃতি এক হোলেও জড়া। প্রকৃতির স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজের কোন চৈতন্যশক্তি (intelligence) নাই—ক্রিয়াশক্তি ছাড়া। তন্ত্রের কালী নৃত্যচঞ্চলা চৈতন্যময়ী, কাজেই তন্ত্রের কালী ও সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে ভেদ অনেক। তন্ত্রের ত্রিগুণময়ী কালী জড়া নন। আবার অদ্বৈত বেদান্তের মায়া চৈতন্যরূপিনী মহামায়া বা কালী নয়। অদ্বৈত বেদান্তের মতে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা হোলেও অনির্বচনীয়া ও মিথ্যা বা তুচ্ছা, কেননা তার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু তন্ত্রের কালী চৈতন্যময়ী ও সনাতনী। তিনি পরমেশ্বর পবমশিবের স্বরূপ থেকে সম্পূর্ণ অভিন্না ও এক : "সা পরমেশ্বরস্য স্বরূপাৎ অভিন্না শক্তিরেকৈব"—(স্পন্দকারিকা, পৃ' ১০)। অদ্বৈত বেদান্তের মতে ব্রহ্মানুভূতি হোলে মায়াময় জগৎ মিথ্যা ব'লে প্রতীত হয়, কিন্তু তন্ত্রের চৈতন্যরূপিনী শক্তি কখনো মিথ্যা প্রতিভাত হন না। তন্ত্রের মতে জগৎ মিথ্যা নয়। তন্ত্রে কালী পরমশিবের স্বশক্তিভূতা, সুতরাং মহাপ্রলয়েও শক্তি শিবের সঙ্গে সম্পরিযক্ত অবস্থায় এক ও অখণ্ডরূপে থাকেন : "যা অনাদিরূপা চৈতন্যাধ্যাসেন মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মা স্থিতা"। প্রকাশ ও বিমর্শ অথবা পরাসম্বিৎ ও শক্তি তখন চনকাকারে অবিনাসম্বন্ধে প্রকাশ পায়। নারদপঞ্চরাত্রের মতে মহাকারণে মহাশক্তি লক্ষ্মী বাসুদেবের সঙ্গে এক ও অভিন্নভাবে থাকেন। এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্যর জন উডরফ-প্রণীত *Sakti and Sākta*, pp. 261-263 এবং *Garland of Letters*, pp. 100-107 দ্রষ্টব্য।

৩৬। বিজ্ঞানের দিক থেকে energy-র ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই ব'লে : "The term 'energy' represents the work that can be done by forces acting on matter"—vide *Where is Science Going*, p. 170.

৩৭। এটি বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। "Two kind of energy were recognised, namely potential energy and

kinetic energy, the former being the energy possessed by bodies at rest and the latter being the energy of moving bodies" (vide *Where is Science Going*, p. 180)। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *God, Our Eternal Mother*-বক্তৃতায় বলেছেন: "Science teaches that universe existed in a potential state in that energy, and gradually through the process of evolution the whole potentiality has become kinetic or actual"। তাঁর *Reincarnation*-গ্রন্থ (পৃঃ ২১) দ্রষ্টব্য।

৬৮। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *The Way to the Blessed Life*-পুস্তিকায় বলেছেন: "Electricity is one universal, inscrutable force, but on account of the various ways, in which it is made manifest through different electric machines, it appears in many forms, as heat, as light, or as motion".

৬৯। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এখানে এটির সংক্ষেপে পরিচয় মাত্র দিয়েছেন। যাঁরা এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত জানতে চান তাঁরা বৈজ্ঞানিক জিন্সের *Universe Around Us*, pp. 113-114, 344 এবং *Physics and Philosophy*, p. 114 এবং ডঃ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের *Where is Science Going*, pp. 176-182 গ্রন্থগুলি আলোচনা করতে পারেন। বৈজ্ঞানিকদের মতে *conservation of energy* হোল: "the amount of energy in the universe is always constant, * * energy is never either created or destroyed" (স্যর আর্থার এডিংটন-প্রণীত *Nature of the Physical World*, p. 235 দ্রষ্টব্য)।

Conservation of energy-কে হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন "the persistence of force'—vide *First Principle* (1862), pt. II, chpt. VIII, এবং Russell: *Mysticism and Logic*, pp. 103-105। এ'সম্বন্ধে ডঃ অটো (Dr. Otto) বলেছেন জার্মান দার্শনিক কাণ্টই প্রথম এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন ও তারপর রবার্ট মেয়ার (Robert Mayer) ও হেল্মহোজ্ (Helmholtz) তাকে বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রয়োগ করতে

চেষ্টা করেন। ডঃ অটো বলেছেন: "This was first recognised by Kant as a general rational concept in his Critique * * and was transferred by Robert Mayer and Helmholtz to the domain of natural science." (vide *Naturalism and Religion,* p. 195)। বিখ্যাত সাইকো-য়্যানালিষ্ট্ ডঃ ইয়ুঙ স্বীকার করেন রবার্ট মেয়রই (১৮৪০-৯১) conservatian of energy-র (শক্তি-সংরক্ষণের) ধারণা প্রবর্তন করেন (vide C. G. Jung: *Collected Papers on Analytical Psychology* [1917], pp. 231, 411)। *Critique of Pure Reason*-গ্রন্থে কান্ট যেখানে কালের (time) First Analogy নিয়ে বিচার করেছেন সেখানে বলেছেন: "In all change of appearances, substance is permanent; its quantum in Nature neither increases nor diminishes"। কান্টের এই অচঞ্চল বস্তু হোল matter অথচ, কাল (time) স্রোতের মতো অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে অনন্তের দিকে এবং তা অনিত্য। কিন্তু অনিত্যের ধারায় একটি নিত্য বস্তু অবশ্যই থাকা চাই—যাকে আশ্রয় ক'রে প্রবহমান কালের স্রোতকে (time-succession) ধরা-ছোঁওয়া যায়। কান্ট এই নিত্য বস্তুটি স্বীকার করেছেন। কান্টের সময়ে বিজ্ঞানের চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং কান্ট নিজেও দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিতালী পাতিয়ে একটি যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কান্টের ভাষ্যকার অধ্যাপক পেটন (Prof. Paton) সেকথার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "He (Kant) identifies substance with matter as known to the science of his time, and find in the contemporary doctrine of the conservation of matter, * *" (vide *Kant's Metaphysic of Experience,* Vol II, p. 209)। ইংরাজ দার্শনিক ব্রাড্লি এই conservation of energy-কে ঠিক ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি, তিনি moving ও resting গতি ও স্থিতি শক্তি-দুটির বিকাশকে 'energy of position' ও 'potential energy' বলেছেন। তাঁর অভিমত হোল: "But to speak strictly, thay are nonsense"। মোটকথা ব্রাড্লির মতে 'actual matter and actual motion are 'unaltered quantity",

সুতরাং matter এবং motion-এর পরিমাণের ('constancy') সত্তা মানতে তিনি রাজী নন। সেজন্য "it is not probable" ব'লে তিনি এই মতকে অস্বীকার করেছেন (vide Bradley ; *Appearance and Reality*, pp. 293-294) ।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ conversation of energy-সম্বন্ধে বলেছেন শক্তিসংরক্ষণের অর্থ হোল—'to hold our mind in a centre',—আমাদের বিচিত্রমুখী সচঞ্চল মনকে কোন এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্থির রাখার নাম শক্তিসংরক্ষণ। মনের স্বভাব ছুটে বেড়ানো, আর এই ছুটে বেড়ানোর নাম change অর্থাৎ চলমানতা বা বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যে শান্তি নাই—শান্তি একমাত্র স্থৈর্যে ও অচঞ্চল অবস্থায়। তাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: 'Revelation does not come to one unless one has that one-pointed state of mind. * * Revelation is pouring all the time into each mind, but the mind is not able to receive it. It is dissapated. But make the receiver ready to receive that revelation. How can you make it ready ? By stopping all the distrubing elements, by focussing and conversing your energy. So by conversation of energy we can keep our minds quiet and peaceful . .' (—vide *True Psychology*, p. 113)। স্বামী অভেদানন্দের *Path of Realization*-গ্রন্থও (পৃঃ ৮-৯, ১০-১১) দ্রষ্টব্য।

অনেকে এই conversation of energy-তত্ত্বের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান, কিন্তু তা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "A kind of scientific Advaitism has been spreading in Europe ever since the theory of the conservation of energy was discovered, but all that is parināmavāda, evolution by real manifestation"—vide *Complete Works of S, V.*, Vol. VI, p. 184.

৪০। 'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।'—কৌষীতকী উপনিষৎ।

৪১। প্রাণ বা প্রাণশক্তিকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং তার প্রমাণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়। কৌষীতকী উপনিষদে (৩।৮) আছে: 'স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতো,"—প্রাণ অথবা প্রাণশক্তি যা প্রজ্ঞাত্মা বা চৈতন্য থেকে অভিন্ন তা এবং মৃত্যুহীন অমৃত। প্রাণ এখানে ব্রহ্মবাচ্য। কেন-উপনিষদে (১।২) বলা হয়েছে: 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ'। আচার্য শংকর এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'ন হ্যাত্মনা অনধিষ্ঠিতস্য প্রাণনমুপপদ্যতে। 'কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ,' 'ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যাপানং প্রত্যগস্যতি,' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি চ বক্ষ্যতে—'যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে, তদেব বহ্ম ত্বং বিদ্ধি' ইতি। ০ ০ তদ্ ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো বিবক্ষিতঃ"।

ব্রহ্মসূত্রের প্রাণাধিকরণে আছে (১।১।২৩): "অত এব প্রাণঃ"। এখানে প্রাণকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা হয়েছে,—প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু নয়। আচার্য শংকর এই সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন: "প্রাণস্যাপি হি ব্রহ্মলিঙ্গসংবন্ধঃ শ্রূয়তে—সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, (ছান্দোগ্য উ' ১।১১।৫) ইতি। প্রাণনিমিত্তৌ সর্বেষাং ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়াবুচ্যমানৌ প্রাণস্য ব্রহ্মতাঃ গময়তঃ। * * যদাপি ভূতশ্রুতিমহাভূতবিষয়া পরিগৃহ্যতে তদাপি ব্রহ্মলিঙ্গত্বমবিরুদ্ধম্। * * প্রাণশব্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। * * প্রজ্ঞাত্মত্বং চ ব্রহ্মপক্ষ এবোপপদ্যতে। নহ্যচেতনস্য বায়োঃ প্রজ্ঞাত্মত্বং সংভবতি। * * তস্মাৎ প্রাণো ব্রহ্ম"। এবং স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Self-knowledge*, pp-70 দ্রষ্টব্য।

৪২। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Self-knowledge*-গ্রন্থে (পৃঃ ৮৭-৮৮) এ' সম্বন্ধে বলেছেন: "Every particle of the universe is in constant motion or vibration. That which we call heat or light, sound or rest, odour, touch or any object of sense-preception, is nothing but a state of vibration of the same unknown substance. * * 'The whole world

consists in the vibration of atoms, or the most minute particles of material substance, * *."

৪৩। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Spititual Unfoldment*-গ্রন্থে (পৃঃ ২৭) বলেছেন : "To conquer the mind is more difficult than to conquer the whole world. * * A Yogi says : If one man conquers in battle a thousand times thousand men, and if another conquers himself, he (the latter) is the greatest of conquerors"।

৪৪। তন্ত্রে 'কুণ্ডলিনী' বলতে 'coiling energy'—অর্থাৎ অব্যক্ত শক্তি। সূক্ষ্ম (potential) অবস্থায় এই শক্তি বিশ্বের সকল জিনিসের মধ্যে নিহিত। তন্ত্রে এই শক্তি তেজোময় 'বিদ্যুৎলতাকারা'। কুণ্ডলিনীই 'কামকলা'। কামকলাবিলাসতন্ত্রে 'কামকলা'-সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "কাম কমনীয় তথা কলা চ দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দু"। 'কাম' অর্থে কামেশ্বর শিব এবং তিনি প্রকাশরূপী। তিনিই অগ্নি নামে পরিচিত। 'কলা' অর্থে বিমর্শশক্তি। তন্ত্রে এই শক্তি 'অগ্নিষোমরূপিণী' নামে পরিচিতা। এঁকে ইন্দু অথবা চন্দ্র কল্পনা করা হয়েছে। অগ্নি ও চন্দ্রের মিলিত রূপই 'বিন্দু'। অগ্নি ও সোম (চন্দ্র) অথবা কামেশ্বর শিবের সঙ্গে অবিনাসম্বন্ধে জড়িতা যে মহাত্রিপুরসুন্দরী তিনিই 'বিন্দু' অথবা শক্তির সমষ্টি রূপ ও কামকলা। বিমর্শশক্তি কামেশ্বরী 'ষোড়শী' নামেও পরিচিতা : "বিমর্শরূপিণী বিদ্যা ষোড়শী যা প্রকীর্তিতা"। শিব ও শক্তির মিলিত তথা মিথুন রূপ কুণ্ডলিনী। তাকে বিন্দু, নাদ ও বীজরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। 'কাম' অর্থে ইচ্ছা, ইংরাজীতে বলা হয় 'divine creative will'। ইনিই প্রকৃতপক্ষে Cosmic will বা ঈশ্বর, প্রজ্ঞা ও অব্যক্ত। বিন্দু শিবাত্মক এবং বীজ শক্ত্যাত্মক। নাদ তাদের সমবায়সম্বন্ধরূপে কল্পিত, অর্থাৎ বিন্দু ও বীজ দুটি তত্ত্ব থেকে নাদের সৃষ্টি। সারদাতিলকতন্ত্রে (১।১০) কুণ্ডলিনীকে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপিণী (অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য) বলা হয়েছে। কাণ্টের Ego-ও thinking, feeling ও willing-এর সমষ্টি। পণ্ডিত রাঘবভট্টের মতে এই তিন শক্তি ঈশ্বর ও জীবের রূপভেদ মাত্র। যোগিনীহৃদয়তন্ত্রে এদেরকে ইচ্ছা, বামা ও পশ্যন্তি ইত্যাদি বলা হয়েছে।

তন্ত্রমতে ব্রহ্মের কারণাবস্থাকে 'শব্দব্রহ্ম' অথবা কুণ্ডলিনী' বলে। কুণ্ডলিনীই 'শব্দব্রহ্ম'। এই শব্দব্রহ্ম সঙ্গীতবিদ্যার উৎস ও আলম্বন। শব্দব্রহ্ম অথবা কুণ্ডলিনী ত্রিভুজাকার অর্থে বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটি তত্ত্বের (principles) স্বরূপ সৃষ্টি করে। (ক) সারদাতিলক (১।১১-১২) ও (খ) প্রপঞ্চসারতন্ত্রে (১।৪৪) শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে পরা বা মহাবিন্দুর বিচ্ছুরণ থেকে সৃষ্টি। যেমন,

(ক) ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগমবিশারদাঃ॥

(খ) বিন্দোস্তস্মাদ্ ভিদ্যমানাদ্ রবোঽব্যক্তাত্মকো ভবেৎ।
স রবঃ শ্রুতিসংপন্নৈঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে॥

কামকলাই কুণ্ডলিনী ও পরমাশক্তি। তন্ত্রে একে 'পরা' বা 'মহাবিন্দু' বলা হয়েছে। পাদুকাপঞ্চকে এর অক্ষরপ্রতীক অ+ক+থ। এই শক্তিকে আবার 'অবলালয়' বলে। অবলালয়ের রূপ হ+ল+ক্ষ। মাহেশ্বরীসংহিতায় 'অবলালয়'-কে কুণ্ডলিনী এবং কুণ্ডলিনীকে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই ত্রিবিন্দু ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। ত্রিবিন্দুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ললিতাসহস্রনামে কুণ্ডলিনী 'কমলারূপা দেবী'। এর টীকাকার ভাস্কররায় 'কাম' অর্থে ইচ্ছা অর্থাৎ শিব ও শক্তির মথুনমূর্তি এবং 'কলা' অর্থে তাদের প্রকাশ (manifestation) বলেছেন। তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে সর্বমন্ত্রের মূল (root) বা বীজ (seed) বলা হয়েছে।—Woodroffe : *The Garland of Letters*, pp 365-174. দ্রষ্টব্য।

৪৫। 'স্বয়ম্ভূ' অর্থে কারু দ্বারা সৃষ্ট নয়—অনাদি। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বলতে অনাদি শিবলিঙ্গ। এখানে জীব যে প্রকৃত অবিনশ্বর ও জন্মমৃত্যুহীন শিব বা শব্দব্রহ্মস্বরূপ একথাই 'স্বয়ম্ভূ'-শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

৪৬। ভারতীয় দর্শনে vital energy-কে 'প্রাণশক্তি' বলে। পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারা অনেকটা তাই। গ্রীক ও পাশ্চাত্য দর্শনের মতে vital energy-ই *psyche* বা soul। একে আমরা আত্মা বলি। *Psyche* অথবা soul গ্রীকদের মতে 'vital force' এবং 'basis of consciousness'

(জ্ঞানের অধিষ্ঠান)। কিন্তু এরিষ্টটল (Aristotle) এই force অথবা soul-সম্বন্ধে সুবিচার দেখান নি। প্লেটোনিষ্টরা soul-কে দুভাগে ভাগ করেছেন: (১) দেহে আত্মা অর্থাৎ vital force বা প্রাণশক্তি, আর (২) দেহাতীত আত্মা যিনি অতীন্দ্রিয়। তন্ত্রের কথাও তাই। প্লেটো আত্মাকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে তাদের স্থান নির্দেশ করেছেন মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিতে। মধ্যযুগের চিন্তাধারা অনেকটা এ'রকমের ছিল। যেমন দেহাতীত আত্মাকে তারা বলতো spark কিনা চৈতন্যবান ('possessor of consciousness'), আর vital force-কে বলতো জীবশরীরে শক্তি (energy), অথবা তাদের ভাষায় বলা হোত spiritus animales। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য দর্শন অপার্থিব ও পার্থিব দু'ভাগে আত্মার ভেদ করেছে এবং তার মতে vital force বা vital energy এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ,—কারণ আর কার্য। যোগদর্শনে vital energy বা প্রাণশক্তিই জীব, কিন্তু ঐ energy চৈতন্য বা ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। জীব ও শিব একই।

তন্ত্রে যাকে 'নাদ' বলা হয়েছে সেই নাদের সচঞ্চল অবস্থার নাম 'মহামায়া', কিন্তু মহামায়া স্বরূপে কুণ্ডলিনী থেকে ভিন্ন নয়। নাদও তাই। আবার নাদের জাগ্রত অথবা ক্রিয়াশীল অবস্থাই 'মহামায়া'। মহামায়ার সঙ্গে পুরুষ বা জীবাত্মার কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মহামায়া নাদ অথবা কুণ্ডলিনীরূপে সকল অবস্থায় প্রতিটি পুরুষের (লোকের) মধ্যে বাস করেন। ভাষ্যকার উমাপতি স্বতন্ত্রতন্ত্রের ২৪ সংখ্যক কারিকায় বলেছেন: "কুণ্ডলিনী শব্দবাচ্যা তু ভুজঙ্গকুটিলাকারেণ নাদাত্মনা স্বকার্যেন প্রতিপুরুষং ভেদেনাবস্থিতো, ন তু স্বরূপেণ প্রতিপুরুষমবস্থিতা"। স্বতন্ত্রতন্ত্রের কারিকায় আছে: (২৪): "যথা কুণ্ডলিনী শক্তির্মায়াকর্মানুসারিণী। নাদবিন্দ্বাদিকং কার্যং তস্যা ইতি জগতস্থিতিঃ"॥ মহামায়া থেকেই পরা অথবা সূক্ষ্মা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী চার রকম শব্দের সৃষ্টি।

৪৭। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *True Psychology*-গ্রন্থে (পৃঃ ৯৫) একথাই বলেছেন: "Our mind substance is like finer matter in vibration, which is thrown into different *vrittis* (বৃত্তি) or

whirlpools or eddies by these stimuli, the sensations from the external world" ।

৪৮। ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানে মনের তিন ভাগকে mental, sub-mental ও supra-mental (মন, অবচেতন মন ও অতীত মনের অবস্থা) বলে।

৪৯। বেদান্তেও তাই। ব্যক্ত ও অব্যক্ত অথবা কার্য ও কারণকে অভেদ এক বলা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল অথবা দ্বৈতবাদী দর্শনগুলি এই অভিমত সমর্থন করে না। তাদের মতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত—কার্য ও কারণ আলাদা,—এক নয়।

৫০। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক হফডিঙ্ বলেছেন: "We understand by unconsciousness a state which lies below the threshold of our consciousness in general (not merely of our self-consciousness)"—vide *Outlines of Psychology*, p, 72.

৫১। পাশ্চাত্য দার্শনিক অধ্যাপক হার্টম্যান (Prof. Hartmann) *Philosophy of the Unconscious*-গ্রন্থে মনের unconscious state-কে 'purely positive conception' অথবা state ব'লে প্রমাণ করেছেন। বেদান্তের মতে অচৈতন্য অর্থে অনভিব্যক্ত বা আবৃত চৈতন্য,—জ্ঞানের অভাব নয়।

৫২। বিশ্বের যত-কিছু অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেগুলিকে 'অলৌকিক' বলেন নি। তিনি বলেছেন যা-কিছু অলৌকিক বা আশ্চর্য আমরা দেখি সে সকল মনের শক্তি (psychic powers)। যোগসাধনা দ্বারা সেগুলি আয়ত্ত করা যায়। *True Psychology*-গ্রন্থে (পৃ: ৪৯, ৫৩-৫৪) তিনি বলেছেন: "It is ordinarily believed that they (prodigies) have miraculous powers and spirit communication, and those spirits know everything and give the massage. That is the popular belief. * * The power of the subject in mind will produce these effects. * * And it is there

below the threshhold of your consciousness"। মনের অচেতন-স্তরে যে শক্তি নিহিত তার বাইরে প্রকাশের নাম শক্তির বিকাশ।

মনই প্রকৃতি। সাধারণ কথায় একে আমরা Nature বলি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *How to be a Yogi*-গ্রন্থে Was Christ a Yogi-নিবন্ধের আলোচনায় মনের শক্তিসম্বন্ধে বলেছেন কোন মানুষ ইচ্ছা করলে যোগসাধনায় 'অলৌকিক শক্তি' লাভ করতে পারে। তিনি বলেছেন: 'Consiquently, by studying the secret of Yoga anyone can easily understand the higher laws and principles, an application of which will explain the mystries, connected with the lives and deeds of God, like Krishna, Buddha or Christ" (পৃঃ ১৮৬)। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের ভিতর যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, যোগসাধনা দ্বারা সকল মানুষই তা আয়ত্ত করতে পারে: 'This science of Yoga, * * explains all mystries, reavels the causes of miracles. and describes the laws which govern them' (পৃঃ ১৮৬),—যোগসাধন অথবা যোগবিজ্ঞানে অলৌকিক শক্তির রহস্যসমূহ প্রকাশিত হয়। স্বামিজী মহারাজ পুনরায় বলেছেন 'These powers are not supernatural; on the contrary, they are, in nature governed by natural laws, though higher, and, therefore, universal. When these laws are understood, that which is ordinarily called miracles by ignorant people, appears to be the natural result of finer forces working on higher plane'। মনের শক্তি তখন মানসিক ক্ষেত্রের উচ্চ স্তরে বিকশিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই ব'লে সেগুলিকে অলৌকিক বলা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং সেগুলি মনের শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি আবার বলেছেন: 'There is no such thing as the absolutely supernatural'। আসলে এ'সকল 'the result of higher or finer force of nature' (পৃঃ ১৮৭-১৮৮)। Nature অর্থাৎ প্রকৃতি তথা মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে

বিভিন্ন শক্তির বিকাশ। Nature বা মনের অবচেতন স্তরে (subconscious mind) অনন্ত শক্তি সুপ্ত থাকে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলেছেন: 'We must not forget that nature is infinite, and that there are circles within circles, grades, beyond grades, planes after planes, arranged in infinite succession, and the desire of a Yogi is to learn all the laws which govern these various planes, and to study every manifestation of force, whether fine or gross' (পৃঃ ১৮৮)।

তন্ত্রসাধনায় সাধক যখন ষট্চক্রের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সিদ্ধি লাভ করেন তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অনুভূতি লাভ করেন এবং ইচ্ছা করলে ঐ সমস্ত শক্তির উপর অধিকার লাভ করতে পারেন। তবে যোগীর লক্ষ্য শুধু একটি মাত্র মনের স্তর অথবা চক্রের অনুভূতিকে লাভ করা নয়, সমস্ত চক্রের তথা সমষ্টি মনের রহস্য অবগত হওয়া: 'his aim is to comprehend the whole of nature' (পৃঃ ১৮৮)। সুতরাং একথা ঠিক যে, মনের শক্তিগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না বিকাশ লাভ করে ততক্ষণ তাদের আমরা অলৌকিক বা অদ্ভুত ব'লে মনে করি, কিন্তু ঐ শক্তিগুলির কারণ ও রহস্য যখন আমাদের কাছে সাধনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখন আর তারা অলৌকিক বলে মনে হয় না: 'So long as an event is isolated it appears super-natural and miraculous, * * it helps to reavel the secrets of nature and to explain the causes of all miraculous deeds (পৃঃ ১৯০)।

এ'প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শরীরের মেরুদণ্ডে ষট্চক্রের (মূলাধার প্রভৃতি) সত্তাসম্বন্ধে বলেছেন অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেছে মেরুদণ্ডে চক্রহিসাবে কোন বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, প্রকৃতপক্ষে মনেই আমরা চক্র বা পদ্ম কল্পনা করি। কিন্তু একথার দ্বারা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ষট্চক্রের সত্তা একেবারে অস্বীকার করেন নি, কেননা কল্পিত চক্র বা পদ্মগুলি আসলে force-centres বা শক্তিকেন্দ্র। In spiral way বা চক্রাকারে বা এঁকেবেঁকেই

শক্তির বিকাশ হয়। শরীরে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধক শক্তিকেন্দ্র (force-centres) কল্পনা করেন। শক্তিকেন্দ্রগুলির মধ্যে শক্তিবিকাশের তারতম্য আছে। চক্রের বা পদ্মের পাপড়িগুলিই তার পরিচায়ক। আজ্ঞাচক্র দু'দলবিশিষ্ট, অথচ এখানে শক্তির বিকাশ অধিক। রহস্য এই যে, দুই-দলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের পশ্চাতে দ্বাদশদলবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় গুরুচক্রের স্থিতি বা বিকাশ। শক্তি কেন্দ্রায়িত হোয়ে গুরুশক্তিরূপে সেখানে বিরাজিত। শক্তিকেন্দ্র তথা চক্রগুলির অনুভূতিও ভিন্ন ভিন্ন। মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্র-দলবিশিষ্ট পদ্ম বা চক্র অনন্ত শক্তির আধার এবং সেখানে পরমশিব শক্তির সঙ্গে মিথুনাকারে বিরাজিত। শিব ও শক্তির অনুভূতিব চরম-অভিব্যক্তি এই সহস্রার চক্রে।

৫৩ (ক)। মেণ্টাল বা ফেথ্‌হিলাররা মনের শক্তি (will-force) দিয়ে শারীরিক বা মানসিক সমস্ত অসুখ দূর করতে পারেন।

৫৩ (খ)। কঠোপনিষৎ ২।১।১।

৫৪। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি *Spiritual Unfoldment*-গ্রন্থে (পৃঃ ৩২-৩৬) আরও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: 'The powers of mind are scattred like the rays of an electric light that illumines the surrounding objects. An electric light which enlightens the objects within a very limited circle . . . We may compare the concentrated mind of a Yogi to a mental search-light. . . A Yogi can throw the search-light of his mind upon the minutest objects at any distance in the realm of the invisible and unknown. . .'।

৫৫। অনেকের ধারণা নেতিমূলক পথ (nagative path) দিয়ে অগ্রসর হোলে পরিশেষে মানুষ শূন্যে (void) উপনীত বা পর্যবসিত হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। বেদান্তে 'নেতি'-মুখে ইতি বা অস্তিবাচক ব্রহ্মের উপদেশ করার অর্থ এ' নয় যে ব্রহ্ম non-existent বা শূন্য কোন-কিছু, বরং এর দ্বারা ব্রহ্ম যে কোন একটি 'সৎ' বস্তু, entity বা সত্তা এটাই বোঝায়। ব্রহ্ম

যে একমাত্র 'সৎ' সেকথা উপনিষদেও বলা হয়েছে। যেমন 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬।২।১), 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ', 'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব' (বৃহদারণ্যক উঃ ১।৪।১০, ১।৪।৪), 'আত্মা বা ইদমেক একাগ্র আসীন্নন্যৎ কিঞ্চনমিষৎ' (ঐতরেয় উঃ ১।১)। এ'সবের দ্বারা ব্রহ্ম যে একমাত্র 'অস্তি' ও 'ইতি'-বাচক বস্তু এবং সত্য এবং ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সকল বস্তু মিথ্যা কিনা পরিবর্তনশীল একথাই প্রমাণ হয়।

৫৬। গীতা ৬।৩৪

৫৭। গীতা ৭।৩৫ এবং সাংখ্যসূত্রে (২।৩৪) বলা হয়েছে। 'বৈরাগ্য-দভ্যাসাচ্চ'। পাতঞ্জলদর্শনেও একথাই বলা হয়েছে। যেমন 'অভ্যাস-বৈরাগ্যভ্যাং তন্নিরোধঃ' (১।১২),—অর্থাৎ বারংবার অনুষ্ঠান ও ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি সাধন ক'রে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়। ভাষ্যে ব্যাস বলেছেন: "চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলী ক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীন-চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। বেদান্তে নিরোধপদ্ধতি অস্বীকার করা হয়েছে, বেদান্তে রূপান্তর স্বীকার করা হয়। মানুষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করলে মন ব্রহ্মে রূপান্তরিত (transformed) হয়! স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Dactrine of Karma*-গ্রন্থের পরিশিষ্টে একথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন: "But you cannot kill them out. There are certain cults that teach: 'Kill out all the desires and make your mind blank'. We cannot do that, It will be obsolutely impossible to do that. We can reduce the number of desires by discrimination and not allowing indulgence. In that way we can pursfy our heart of mind"। শ্রীঅরবিন্দের অভিমতও তাই। দিব্যজ্ঞানের বিকাশ হোলে মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়।

৫৮। যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

পাতঞ্জলদর্শনে 'প্রত্যাহার'-সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (২।৫৪), —অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় থেকে চিত্ত নিবৃত্ত হোলে ইন্দ্রিয়গণ বিরত হয়, চিত্তের অনুকরণ করে এবং তাকেই প্রত্যাহার বলে। ভাষ্যে ব্যাস একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন: "যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমানমণু নিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ,"—অর্থাৎ মধুমক্ষিকাদলের একটি প্রধান মৌমাছি থাকে, ঐ মক্ষিকারাজ কোন বিষয় থেকে উড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দলের অপর সকল মক্ষিকাও উঁড়ে যায়। আবার মক্ষিকারাজ কোন একটা নতুন জিনিষে বসলে সকল মক্ষিকা তার অনুসরণ করে। এ'রকম চিত্তকে বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করলে সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়েরাও প্রতিনিবৃত্ত হয়, এর নাম প্রত্যাহার।

৫৯। গীতা ৬।১৫ ৬০। গীতা ৬।২৭

৬১। সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ —গীতা ৬।২৪

৬২। শনৈঃ শনৈরুপরমেত্তদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মন কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥
—গীতা ৬।২৫; কঠোপনিষৎ ১।৩।১৩ এবং ২।৩।১০ শ্লোক।

৬৩। মহাভারত, বনপর্ব।

৬৪। উপনিষদের অনেক স্থানে হৃদয়কে গুহা বলা হয়েছে। যেমন,

(ক) "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ, পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্"।
—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১৭

(খ) "এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রন্থিং * *"।
—মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১ ১০

(গ) "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্"।
—কঠ ১।২।১২

(ঘ) "পরেণ নাকং নিহিতং"।—কৈবল্য উপনিষৎ ১।৩

(ঙ) "মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ"।
—নারায়ণোপনিষৎ ১২।১

তাছাড়া মহর্ষি ব্যাস পাতঞ্জলভাষ্যে বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ ভাবপ্রসঙ্গে হৃদয়কে গুহা বলেছেন: "বুদ্ধিবৃত্তিরবিশিষ্টাং ব্রাহ্ম শাশ্বতং গুহা যস্যাং কবয়ো বেদয়ন্তে"। পঞ্চদশী ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে গুহা অর্থে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ: "দেহদভ্যন্তরঃ প্রাণাঃ * * গুহা সেয়ং পরম্পরা"।—পঞ্চদশী ৪।৩

৬৫। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।১

৬৬। আচার্য শংকর তৈত্তিরীয় (১।১) ভাষ্যে "নিহিতং গুহায়াং" প্রভৃতি সম্বন্ধে বলেছেন: "নিহিতং স্থিতং গুহায়াম্, গূহতেঃ সংবরণার্থস্য—নিগূঢ়া অস্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃপদর্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ, গূঢ়াবস্যাং ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থাবিতি বা, তস্যাং পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে তদ্ধি পরমং ব্যোম্, * * 'যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হার্দস্য ব্যোম্নঃ পরমত্বম্। তস্মিন্ হার্দে ব্যোম্নি যা বুদ্ধিগুহা, তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম * *"।

৬৭। গীতা ৩।২১

৬৭। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *True Psychology*-গ্রন্থে (পৃঃ ১০৬-১০৮, ১১৫) এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "The Hindu psychologists divide mental conditions into five different parts. The finest is the scattered state of minds or the *kshipta*. * * The next is the *muḍha* that is stupid. The scattered state (*kshipta*) in one extreme, and the stupid (*muḍha*) is the other. The mind is wholly idiotic, cannot think, cannot see anything clearly, * * The third state is the *vikshipta*, that swings between two extremes: sometimes tremendously active and sometimes wholly stupid. * * The fourth state is called the *ekāgra*, the one-pointed state of mind. * * Now the fifth state is that state of mind which is held under restraint or absolute control by the will-power. In that state, the avenues of the senses are completely closed".

৬৮। পতঞ্জলি "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" (১।১৭) সূত্রে চারটি যোগ অথবা সমাধিসম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভাষ্যকার মহর্ষি ব্যাস বলেছেন: "বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা। * * সর্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ"।

৬৯। পাতঞ্জলিদর্শনের ১।১৮ সূত্রে "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কার-শেষোঽন্যঃ" ব'লে অসম্প্রজ্ঞাত যোগভূমিসম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষ্যে ব্যাস বলেছেন: "সর্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যং উপায়ঃ; * * স চ অর্থশূন্যঃ, * * এষ নির্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ"। এই অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের সকল বৃত্তি নষ্ট হয়, কোন অর্থ বা বিষয় থাকে না। একেই নির্বীজ বা নিরোধ-সমাধি বলে। নিরোধ-অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার বিদেহ ও প্রকৃতিলীন ভেদে দুরকম। ১।১৯-২০ সূত্রে এই দুরকম সমাধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৭০। সংখ্যাসূত্র ৯।৫৯; ৭১। গীতা ১৪।৬-৮

৭২। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মনি ভারত।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥—গীতা ১৪।৯

৭৩। স্বামী অভেদানন্দ *True Psycolology*-গ্রন্থে (পৃঃ ১১৬-১১৭) বৃত্তিকে reflection বলেছেন। Reflection নানা প্রকারের, যেমন emotions, sensations, feelings প্রভৃতি। স্বামিজী মহারাজ বলেছেন: "At all the other times there is the reflection of the mental conditions upon the soul"। তিনি আত্মাকে একটি শাদা স্ফটিকের (crystal ball) সঙ্গে তুলনা করেছেন। বর্ণহীন স্ফটিকের কাছে একটি রঙীন ফুল অথবা বস্তু ধরলে ফুলের বা বস্তুর রঙ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বের নাম 'বৃত্তি'। সে'রকম "the mind substance, which is constinuously throwing the reflection of its various states of emotions, of sensations, of feelings, of other mentaf conditions upon the crystal ball of our true self. And for that reason it is called the *vritti*"। এই গ্রন্থের অপর স্থানে তিনি

বৃত্তিকে জলের আবর্ত বা তরঙ্গের সঙ্গেও তুলনা করেছেন—'whirlpools or eddiess' (Ibid, p. 95)।

৭৪। মন যখন কোন বিষয় গ্রহণ করে তখন অন্য বিষয়কে সে আর নিতে পারে না ব'লে ন্যায়-বৈশেষিকেরা মনকে 'অণু'-পরিমাণ বলেছেন। মোটকথা যুগপৎ একই সময়ে দুটি বস্তুর জ্ঞান লাভ করা মনের পক্ষে অসম্ভব। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকদর্শনে (৭।১।২৩) "তদভাবাদণু মনঃ" সূত্রে মনকে 'অণু' বলেছেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদের (কারিকা ৮৪) বলেছেন :

সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।
অযৌগপদ্যাজ্‌জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে ॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার এই মতকে সমর্থন ক'রে বলেছেন : "তত্র মনসোঽণুত্বে প্রমাণমাহ। অযৌগপদ্যাদিতি। জ্ঞানানাং চাক্ষুষরাসনাদীনাম-যৌগপদ্যেমেককালোৎপত্তির্ণাস্তীত্যনুভবসিদ্ধম্। * * তন্মনসো বিভুত্বে চাসন্নিধানং ন সম্ভবতীতি ন বিভুঃ মনঃ"। শ্রুতিতে দেখা যায় মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকলে আর অপর কোন বিষয় গ্রহণ করতে পারে না : "অন্যত্রমনা অভূবম্ নাশ্রৌষম্, অন্যত্রমনা অভূবং নাদ্রাক্ষম্।" পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এবং বৈজ্ঞানিকেরাও মনকে অণু (atom) ব'লে স্বীকার করেছেন। মন অণু সুতরাং বিভু বা সর্বব্যাপক নয়, আর অণু ব'লে সে একটা বিষয়ে নিবিষ্ট অথবা একটি মাত্র বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে। এ'রকমও দেখা যায় একই লোক এক সময়ে হয়তো কথাও কয়, চিঠিপত্র লেখে আবার কোন একটা জিনিসে মনোনিবেশ করে। এ'থেকে মনে হোতে পারে লোকটি যখন একই সময়ে তিনটি কাজ করে তখন তার মন নিশ্চয় তিনটি বিষয়কে গ্রহণ করে, কারণ মন গ্রহণ না করলে ইন্দ্রিয় কখনো গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু একথা ঠিক নয়, কারণ শাস্ত্রকারদের বক্তব্য এই যে, যে সময়ে মন দেখে, ঠিক সে সময়ে মন শোনে না বা পড়ে না। সামান্য হোলেও দুটি কার্য বা বিষয়ের মধ্যে একটু সময়ভেদ থাকে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Self-knowledge*-গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬) এ' কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন : "Two sense-perceptions do not occur at the

same moment, there must be a minute interval of time between them. For instance, when we see a sight and hear a sound apparently at the same time, proper analysis will show that the one sensation is followed by the other, we cannot have various perceptions simultaneously".

Sensation বা সংবেদন সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর অনেক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। প্রধানত *Self-knowledge*, পৃঃ ৫-৬, ১০০, ১০১, এবং *True Psychology*, পৃঃ ৭৩, ১৩৬ দ্রষ্টব্য। অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "When any sensation arises, it comes through * * nerves and by certain stimuli the nervous matter is agitated, and this agitation flows in the form of a current through the nerves until they reach the cortical cells of the brain" (vide *True Psychology* p. 73)। Senations 'suggestion' বা ইঙ্গিতের আকারে স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে মস্তিষ্ককোষে যায়: "Sensations or vibrations of the external objects, which come through the nerves, are nothing but suggestions, and these suggestions are carried by these nerves to the brain"। সংবেদনের ইঙ্গিত মস্তিষ্ক থেকে পরে ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে যায়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ sensation অথবা perception তথা সংবেদন বা প্রত্যক্ষব্যাপারে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের প্রণালী গ্রহণ করেছেন। প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের ও বিশেষ ক'রে অদ্বৈত বেদান্তের অনুযায়ী অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রণালী বেশ ভিন্ন। বেদান্তের মতে বিষয়ের জ্ঞান হয় তখনই যখন অন্তঃকরণচৈতন্য বৃত্তির আকারে বাইরে গিয়ে বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে ও বিষয়ের সঙ্গে একীভূত হয়। অন্তঃকরণ প্রথমে বৃত্তির আকারে পরিণত হয় ও সেই বৃত্তি বিষয়কে গ্রহণ ও আবৃত ক'রে বিষয়ের আকার ধারণ করে। অন্তঃকরণে চৈতন্য থাকে, অন্তঃকরণ বৃত্তির আকার ধারণ করলে সে বৃত্তিতেও চৈতন্য থাকে আর চৈতন্যযুক্ত বৃত্তি বিষয়কে আবৃত ক'রে বিষয়াকারে পরিণত হোলে তাতেও চৈতন্য থাকে।

কাজেই অন্তঃকরণচৈতন্য, বৃত্তিচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য চৈতন্যরূপে সমান ও একাকার। চৈতন্য থাকার জন্য বিষয়ের অজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়কে না-জানা-রূপ অজ্ঞতাও নষ্ট হয়, সুতরাং বিষয় প্রকাশ পায় এবং বিষয়সম্বন্ধে তখনি জ্ঞান হয়। কাজেই বেদান্তের মতে কোন বিষয়ের জ্ঞান হোতে গেলে প্রমাতৃ (কর্তা), প্রমাণ (করণ) 'ও প্রমেয় (কর্ম) এ'তিন চৈতন্য এক হওয়া চাই।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ sensation বা perception-বিষয়ে বেদান্তের প্রণালী অনুযায়ী বিচারের উল্লেখ করলেও *True Psychology*-গ্রন্থে (পৃ: ৩৮) স্বীকার করেছেন কোন বিষয়ের জ্ঞান (knowledge) হোতে গেলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সত্তা এক হওয়া দরকার: "Subject recognizes object because the object is one with the subject. Consciousness means recognition" (Ibid., p. 38)। এই subject অর্থাৎ দর্শন বা শ্রবণকর্তার সঙ্গে বিষয়ের এক হওয়ার প্রণালী অনেকটা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক হোয়াইটহেডের recognition theory-র মতো। হোয়াইটহেড স্বীকার করেছেন: "The awarness of an object as some factor is what I call recognition. * * Recognition is an awareness of sameness" (vide *Concept of Nature*, p. 143)। Critical Realist-দের ভিতর অনেকে এ'ধরনের sameness-রূপ একতা বা ঐক্যের কথা স্বীকার করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন্ কোন অনুভূতি পেতে গেলে তার পিছনে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অর্থাৎ কোন conscious entity থাকে। তাঁর *Self-knowledge*-গ্রন্থে (পৃ: ১০০-১০১) একথা তিনি আরো পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন।

৭৫। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Self-knowledge* (1944), পৃ: ৬৫ এবং কৌষিতকী উৎপনিষৎ দ্রষ্টব্য।

৭৬। পাম্পিং মেশিন যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখনকার কথাই অভেদানন্দ মহারাজ উল্লেখ করেছেন, নচেৎ বর্তমান যান্ত্রিক উন্নতির যুগে ৩০০ ফিটেরও অনেক বেশী গভীরতা থেকে পাম্পিং মেশিনের সাহায্যে জল তোলা সহজসাধ্য।

৭৭। মহারাজ প্রণীত *True Psychology*-পৃঃ ৪৮-৫৪।

৭৮। স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত "জীবন-কথা", পৃঃ ১৪৬-১৪৭

৭৯। গীতা ৬।৪৫ ;

৮০। গীতা ৭।১৯ ;

৮১। গীতা ৭।৩

৮২। "ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা * * "—গীতা ৬।১৯ ;

৮৩। জাবালোপনিষৎ ৪ ;

৮৪। জাবালোপনিষৎ ৪ ;

৮৫। গীতা ৫।৭ ;

৮৬। কৈবল্যোপনিষৎ ১।৩

৮৭। গীতা ৩।৪ ;

৮৯। গীতা ৩।১৯

৯০। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১·৪·১) আছে : "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ,"—সৃষ্টির আগে পুরুষাকারে একমাত্র আত্মা ছিলেন, কিন্তু "স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে ; স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ, স ইমমেবাত্মাং দ্বেধপাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্ ; * *—অর্থাৎ আদিপুরুষ এক থাকার জন্য নিরানন্দ অনুভব করলেন, তাই তিনি ইচ্ছা করলেন একজন সহচারিণী হোক। তাঁর নিজের শরীর তাই দু'ভাগে বিভক্ত হোল আর তা থেকে পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি হোল। তারা পতি-পত্নীর মতো 'তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব' থাকলেন এবং সেই নারী 'মনুষ্যা অজায়ন্ত'—পুরুষ থেকে সৃষ্ট হোল।

বিখ্যাত সাইকো-এ্যানালিষ্ট্ (psycho-analyst) ডঃ ইয়ুঙ্ (Dr. Jung) তাঁর *Psychology of the Unconscious* (1946)-গ্রন্থে (পৃঃ ৯৬) এ'সম্বন্ধে মন্তব্য বলেছেন : "We meet here a peculiar myth of Creation which requires a psychological interpretation. In the begining, the *libido* was undifferentiated and bisexual, th!s was tollowed by differentiation into a male and a female component".

॥ গীতা ॥

১। গীতা ২।১৭ ; ২। কঠোপনিষৎ ২।৬।২ ; ৩। ঐ ২।৬।৩

৪। গীতা ২।১৮ ; ৫। এই reflected বা modal consciousness-কে ভারতীয় দর্শনে 'বৃত্তি' বলে।

৬। গীতা ২।১৯ এবং কঠোপনিষৎ ১।২।১৯ ; তবে কঠোপনিষদে প্রথম লাইনের পাঠভেদ এই : 'হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্'।

৭। আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অধ্যাসসম্বন্ধে বলেছেন : 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। * * সর্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্মাভাসতং ন ব্যভিচরতি"। আচার্য এর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন : "তথা চ লোকেহনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি"। শুক্তিকায় রজত ভ্রম বা এক চন্দ্রকে জলে দুই বা অনেক চন্দ্র ব'লে দেখা—এ' সকল অধ্যাসের উদাহরণ। আত্মায় অনাত্মার আরোপই অধ্যাস : "প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ"। তাছাড়া আচার্য শংকর অধ্যাসের আরো একটি সুন্দর কারণ বলেছেন : "অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ",—অর্থাৎ যে যা নয় তাতে তার জ্ঞান হওয়ায় নাম অধ্যাস।

৮। স্বামী অভদানন্দ মহারাজ *Doctrine of Karma*-র Appendix A-তে (পৃঃ ১২৭-১৩৩) মায়া বলতে যথার্থ কি বোঝায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "Delusion does not mean non-existence. It means relative reality, that is, exists for the time being, and has no permanent existence"। অনেকে মায়াকে মরিচিকার (mirage) সঙ্গে তুলনা করেন, কিন্তু স্বামিজী মহারাজ বলেছেন : "I should say it is more like a dream. Dreams are real so long as we are dreaming, but when we wake up they become unreal"। তিনি বিচিত্র সংসারকেও স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি সংসাররূপ স্বপ্ন থেকে জাগরণের ('an awrkening from their state of dream') নামকরণ করেছেন : "superconsciousness. It is Godconsciousness"। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের নাম সংসারনিদ্রা থেকে দিব্যজাগরণ। আত্মা বা ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ, অথচ এক অনির্বচনীয় শক্তির মোহে

আমরা স্বরূপ চিনতে পারি না। এ' মোহকে স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'delusion' বা মায়া। তাঁর ভাষায় বল্লে বলতে হয়: "It is a kind of perplexing problem. But we have to go through it and transcend it" (পৃ: ১৩৩)।

৯। "সর্বব্যহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ। স্বপ্ন-ব্যবহারস্থেব প্রাক্‌প্রবোধাৎ।"—শাঙ্করভাষ্য ২।১।১৪। ১০। গীতা ২।২০

১১। সাংখ্যসূত্রম্ ১।৭৬ ; ১।৭৮ সূত্রে আবার হয়েছে: "ভাবে তদ্যোগেন তৎ সিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তৎসিদ্ধিঃ"। কারণ যদি সৎ-পদার্থ হয় তবেই তা থেকে কিছু-না-কিছু সৎকার্য সৃষ্টি হোতে পারে, নচেৎ অভাব বা শূন্য থেকে ভাবপদার্থরূপ কার্য সৃষ্টি হোতে পারে না। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর-কৃষ্ণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন,

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্ ॥৯

সৃষ্টির আগে কার্য সৎ, কেননা কার্য অসৎ হোলে কেউ সে কার্যকে সৃষ্টি করতে পারে না। কার্য ও কারণের নিয়তসম্বন্ধ থাকা চাই, নইলে সকল বস্তু থেকে সকল বস্তু সৃষ্টি হোতে পারে। সৎ ও অসতের মধ্যে কখনো কোন সম্বন্ধ হয় না, সুতরাং কার্য সৎ-ই ইত্যাদি।—তত্ত্বকৌমুদী

১২। গীতা ২।১৬

১৩। সাংখ্যকারিকা ৯ এবং তত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয়েছে: "কার্যস্য করণাত্মকত্বাৎ-নহি কারণাদ্ভিন্নং কার্যং * * কার্যস্য কারণাভেদসাধকানি চ প্রমাণানি * *"।

১৪। স্বামী অভেদানন্দ: *Doctrine of Karma* দ্রষ্টব্য।

১৫। সাংখ্যসূত্রে (১।১০৮) ঠিক এ'ভাবে কার্য থেকে কারণের অনুমাণ করা হয়েচে। যেমন: "কার্যদর্শনাত্তদুপলব্ধিঃ"। কার্যের নাশই যে কারণের স্বরূপ সেকথা সাংখ্যকার বলেছেন: "নাশঃ কারণলয়ঃ" (১।১২১)। এ'থেকে প্রত্যেক কার্যের পিছনে এক একটি কারণ থাকে, কোন কার্য কারণশূন্য নয় একথাই বলা হয়েছে।

ন্যায়মতে কারণরূপী ঈশ্বরও কার্য দেখে অনুমিত হন। যেমন: "যথা ঘটাদিকার্যং কর্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি। ন চ তৎ কর্তৃত্বমস্মাদাদীনাং সম্ভবতীত্যতস্তৎকর্তৃত্বেনেশ্বরসিদ্ধিঃ"—(মুক্তাবলী, পৃঃ ১৮)। বৈশেষিকের মতেও তাই। দুটি পরমাণুর (পরিমাণ্ডল্য) সংযোগে যে দ্ব্যণুকের সৃষ্টি তার সংযোগও ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হয়। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে।

১৬। সাংখ্যর মতে সৃষ্টির কারণ প্রকৃতি, আর ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর। মীমাংসাদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না। সাংখ্যেও তাই। বেদান্তে ব্রহ্মই একমাত্র কারণ। কারণ প্রধাণত দু'রকম: উপাদান ও নিমিত্ত। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—দুইই। অন্য দর্শনের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছা নিমিত্তকারণ আর উপাদান (সমবায়ী) কারণ তা থেকে ভিন্ন। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম কখনো সৃষ্টির কারণ নন, তবে কারণত্বরূপ উপাধি ব্রহ্মে উপচার বা কল্পিত। কারণত্ব-রূপ উপাধি একমাত্র সবিশেষ বা সগুণব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে কারণ বা কারণত্ব-উপাধি মিথ্যা। সৃষ্টি বা জগদ্বৈচিত্র্য কল্পিত বা মিথ্যা, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। মাণ্ডুক্যকারিকায় বলা হয়েছে: "মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিত সচরাচরম্",—অর্থাৎ সমস্তই মনের সৃষ্টি। আচার্য শংকরের কথায় বলা যায়: "চরাচরং ভাতি মনবিলাসম্"—সবই মনের বিলাস বা বিকার মাত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনই সৃষ্টি করে কল্পনা দিয়ে।

১৭। মায়ারাজ্যের ঈশ্বর প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভ। তৃতীয় অবস্থার (মায়ার) যে ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর তিনি অব্যক্ত, অব্যাকৃত বা প্রজ্ঞা। তাঁতে সৃষ্টি অসম্ভব। অব্যক্ত সুষুপ্তির অবস্থা। মায়া বা সৃষ্টি তখন ঘুমন্ত বা সুপ্ত (dormant) অবস্থায় থাকে। স্থূল বা কার্যের আকারে প্রকাশ পায় হিরণ্যগর্ভরূপ ঈশ্বরে। বিরাট-ঈশ্বর জীবজগৎ।

১৮। 'Relization of the Absolute'-শব্দগুলি অভেদানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত লক্ষ্য ক'রে বলেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভিতর কাণ্ট, শেলিঙ, হেগেল, ফিক্টে এঁরা Absolute বা Transcendental Unity-র (ব্রহ্ম বা বিশ্বাতীত সত্তার) কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু Absolute-কে (ব্রহ্মকে) তাঁরা knowledge বা অনুভূতি থেকে আলাদা ক'রে

ভেবেছেন। কাণ্টের Absolute বা Noumenon আবার knowledge বা realization-এ ধরা পড়ে না, তা unknown and unknowable। ব্রাড্‌লি, বোঁসাকে, রয়েস, বের্গসোঁ এঁদের কথাও তাই। বর্ণনা বা প্রকাশভঙ্গী প্রত্যেকের আলাদা হোলেও সকলে ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) অনুভূতি অর্থাৎ appreciation বা apperception of the Self বা Absolute—শব্দই ব্যবহার করেছেন, the Absolute itself is an appreciation (ব্রহ্ম অনুভূতিরই স্বরূপ)—এ'কথা বলেন নি।

১৯। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

২০। শ্রীভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১।

২১। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।১।৪

২২। অধ্যস্ত বস্তুমাত্রেই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্ত হোলে জগৎ বাধিত হয়। 'ব্রহ্মই সত্য' এই জ্ঞান যখন হয় তখন আর জগৎ সত্য এ'জ্ঞান থাকে না, জগতের সত্যত্বজ্ঞান তখন লোপ পায় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এই জ্ঞান থাকে।

২৩। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।৭

২৪। অব্যাকৃত, অব্যক্ত, প্রজ্ঞা ও প্রকৃতি আসলে একই।

২৫। বিবেকচূড়ামণি ১১০-১১১ শ্লোক।

২৬। অবিদ্যাকে কোন কোন প্রাচীন দার্শনিক দু'ভাগে ভাগ করেছেন, তুলাবিদ্যা ও মূলাবিদ্যা। তুলাবিদ্যা জীবকে এবং মূলাবিদ্যা কিনা মায়া বা মহামায়া ঈশ্বরকে আশ্রয় ক'রে থাকে। তাছাড়া মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যেও অনেকে ভেদ স্বীকার করেন। আচার্য শংকর নিজে এবং পদ্মপাদ ও বিবরণসম্প্রদায় মায়া বা অবিদ্যাকে অভিন্ন বলেন, তাঁরা মায়ার কোন ভেদ স্বীকার করেন না। বাচস্পতি মিশ্র ও তাঁর সম্প্রদায় মায়া ও অবিদ্যার ভেদ স্বীকার করেন।

২৭। প্রকৃতি বা শক্তিসম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্যশিরোমণি জীব-গোস্বামীর মতে শক্তির দুটি বিশেষ স্বরূপ: একটি অচিন্ত্যত্ব আর অপরটি স্বাভাবিকত্ব। (ক) অচিন্ত্যশক্তি বলতে গোস্বামিজী বলেছেন শক্তি অনিবার্য এবং মন ও বুদ্ধির অতীত; অর্থাৎ মানুষের চিন্তা বা তর্ক দিয়ে যে শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন

করা যায় না, আর 'দুর্ঘটঘটকত্ব' শক্তিযুক্ত, অর্থাৎ যা কখনো হবার নয় এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা সম্পন্ন তিনি করতে পারেন। এই অচিন্ত্যশক্তি শক্তিমান পরমাত্মার সঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধে সম্পর্কিত। (খ) স্বাভাবিক শক্তি বলতে তিনি বলেছেন যা ঈশ্বর বা পরমাত্মায় স্বভাবত থাকে এবং তাঁর স্বরূপকে মহিমাময় করে। কিন্তু ঈশ্বর সে সকল স্বাভাবিক শক্তিকে অতিক্রম ক'রে থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শক্তির তিন রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে: স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি ও বহিরঙ্গশক্তি। এদেরকেই পরাশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তিও বলে। বিষ্ণুপুরাণে এদেরকে পদ্মা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা ব'লে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে পরা বা স্বরূপশক্তিকে বেদান্তের সৎ, চিৎ ও আনন্দের মতো সন্ধিনী, সম্বিদ্‌ ও হ্লাদিনীশক্তি বলা হয়েছে। হ্লাদিনীশক্তি পরমাত্মার আনন্দশক্তি। এই শক্তি সর্বকল্যাণময়ী ভাগবতানন্দের প্রস্রবণ।—Cf. Dr. S.K. De: *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*, পৃ: ২১০-২১৫

২৮। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম ও জগতের ভিতর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, কিন্তু আসলে সে সম্বন্ধ কাল্পনিক বা মিথ্যা। অদ্বৈতবাদীরা জগৎ ও ব্রহ্মে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (law of identity) স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক ও অন্যান্য দ্বৈতবাদীরা আধার-আধেয়সম্বন্ধ, সংযোগসম্বন্ধ প্রভৃতি স্বীকার করেন। জীব-গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকার করেন।

২৯। গীতা ১।২১

৩০। নির্গুণব্রহ্মে সংকল্প কেন—সংকল্পমাত্রের আরোপও অসঙ্গত, সুতরাং ব্রহ্ম বলতে সগুণব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর।

৩১। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী ৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে: 'সোঽকাময়ত। দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি। স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশানায়াঃ মৃত্যুঃ।'—(১।২।৪)। 'মন' ও 'অশনা'-র স্থূলসৃষ্টি সগুণব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম যখন একমাত্র 'সৎ'-রূপে ছিলেন তখন 'ব্রহ্মের ইচ্ছা' বা 'ব্রহ্মে ইচ্ছা' এ'ধরনের কিছু ধারণা ছিল না এবং জন্ম ও

মৃত্যু ব'লে কোন জিনিষ ছিল না। কিন্তু 'অশনা' বা ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল মৃত্যু : "অশনায়া হি মৃত্যুঃ"। ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই মৃত্যু। এই মৃত্যুকে উপনিষদে হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্ম বলা হয়েছে (—বৃহ° উ° ১।২।১, ৫)। ইনি পুরাণে চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সৃষ্টির সংকল্প বীজাকারে ঈশ্বররূপ ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাই ঈশ্বরের আর একটি নাম 'অব্যাকৃত' : 'তর্হি অব্যাকৃত-মাসীৎ'। হিরণ্যগর্ভে সংকল্প ব্যক্ত হয়, তাই সৃষ্টির এখানে আরম্ভ। আমরা সাধারণত যে ঈশ্বরের কল্পনা করি—যেমন তিনি নিয়ন্তা, স্রষ্টা, মাতা, পিতা, ত্রাণকর্তা ও প্রভু, সে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ। অব্যাকৃত-ঈশ্বর সুষুপ্তি ও কারণের স্বরূপ, তাঁতে কোন ক্রিয়ার স্ফুরণ নাই। সংকল্প বা সৃষ্টির সুপ্তবীজ হিরণ্যগর্ভে জাগ্রত হয়; জন্ম, মৃত্যু, ভয়, হিংসা—এ' সকল দ্বৈত জিনিষের স্থূলভাবে বিকাশও এখানে। হিরণ্যগর্ভের পর 'বিরাট'। তখন বৈচিত্র্যের পূর্ণবিকাশ। বিরাট অর্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

৩২। জ্ঞানীর অজ্ঞান নষ্ট হয় বলতে জ্ঞানী সাধারণের মতো অজ্ঞানের কার্যে বদ্ধ হন না। ব্রহ্মজ্ঞান-উপলব্ধির পর জ্ঞানীর কাছে অজ্ঞানের কার্য প্রতীত হোলেও তা মনে বিকার আনতে পারে না। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার (কাল্পনিক জলাশয়ের) ভ্রমেফেলা স্বভাবকে যে একবার মিথ্যা বলে জেনেছে তার কাছে মরীচিকার ছায়া পুনরায় উপস্থিত হোলেও সে তাকে মিথ্যা বলে জানে ও তাতে আর মোহিত হয় না তেমনি যিনি অজ্ঞানকে মিথ্যা বলে একবার জেনেছেন তাঁর কাছে অজ্ঞানের কাজ থাকলেও তা মিথ্যারূপে থাকে। শরীরচেষ্টাদি কাজ হোতে থাকলেও তাতে তিনি অভিমান করেন না, সর্বদাই নিস্পৃহ থাকেন।

৩৩। কথামৃত (১৪ সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮০ এবং স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Who is the Saviour of Souls*-পুস্তিকা ৩, ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৪। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন লীলার জন্য : 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। কোন রকম প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্তির নাম লীলা। মানুষের বিক্রিয়া ঈশ্বরে অধ্যস্ত ব'লে মনে হয় যেন ঈশ্বর ক্রিয়া করেন। কল্পতরুকার বলেছেন : 'প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়াঃ। পুমান্ ক্রীড়েদ্‌যথাব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়া'। কৃষ্ণানন্দতীর্থ টীকায় এ'সম্বন্ধে মন্তব্য

করতে গিয়ে বলেছেন : "এষ হ্যেব সাধুধর্ম কারয়তি য আত্মানমন্তরো যময়তি', 'ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা'। যথা 'লোকে কশ্চিৎ পুরুষঃ সপ্রতিবিম্বগতাঃ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়া বিম্বভূতস্বপ্রযুক্তাঃ পশ্যন্ ক্রীড়তি, তথা ব্রহ্মাপি জীবস্থ-বিক্রিয়াঃ প্রাণিকর্মানুসারেণ স্বপ্রযুক্তাঃ পশ্যন্ ক্রীড়তীতি যোজনা * * ঈশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিব্যাপারেষু প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীতি। * * ঈশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিপ্রবৃত্তি-লক্ষণাক্রিয়া কেবলং প্রয়োজনোদ্দেশং বিনৈব লীলা"।

৩৫। কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৯২ এবং স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Doctrine of Karma*, পৃঃ ১৮- ৯, ৩১

৩৬। গীতা ৫।১৪—১৫

৩৭। গীতায় আছে : 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Doctrine of Karma*, পৃঃ ২০; *Self-knowledge*, পৃঃ ১০৮—১০৯ এবং *Reincarnation*, পৃঃ ২০ এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

৩৮। বেদান্তে জীব, জগৎ, সৃষ্টি ও মায়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে সে সমস্তই সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য ক'রে,—ব্রহ্মকে নয়। শুদ্ধব্রহ্মের দিক থেকে মায়ার প্রশ্ন নাই, সুতরাং সৃষ্টিও নাই—ধ্বংসও নাই। সৃষ্টির বীজ থাকে অব্যক্ত-ঈশ্বরে বা সুষুপ্তিতে এবং তা ব্যক্ত হয় হিরণ্যগর্ভে বা স্বপ্নে। জাগ্রতে হয় মায়ার বিলাস। জাগ্রতই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সেদিক থেকে সৃষ্টি বা অজ্ঞানের উপযোগিতা ও মীমাংসার প্রয়োজন এই অবস্থায়। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Path of Realization*, পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য।

৩৯। কঠোপনিষৎ ২।৫।১১ শ্লোক উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য বেদান্তে ঈশ্বর স্বীকার করলেও এক আত্মাই ঈশ্বর, স্রষ্টা ও সৃষ্টিরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং সৃষ্টি বা সৃষ্টির প্রজার সহিত ঈশ্বর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও তিনি সর্বদা উদাসীন ও নির্লিপ্ত। কঠোপনিষদের ২৫।৫।১১ শ্লোক ছাড়া নীচের এই শ্লোকগুলিতে ঠিক এই তাৎপর্য বোঝানো হয়েছে। যেমন,

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো * * * বহিশ্চ॥

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥
—কঠোপনিষৎ ২।৫।৯, ১০, ১২

কঠোপনিষদে ২।৫।১২ শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে সর্বভূতের নিয়ন্তা (ঈশ্বর) ও সর্বভূতের অন্তরে আত্মারূপে অন্তর্যামী এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি শুদ্ধব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। এক ব্রহ্মই তির্যক ও মনুষ্যাদি বহুরূপ ধারণ করেন, বহুরূপ বা বৈচিত্র্য তিনি নিজের মধ্য থেকে ভিন্ন ক'রে সৃষ্টি করেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: "বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি"। আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে বিবরণমতের অনুযায়ী মন্তব্য করেছেন অন্তকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীব প্রতিবিম্বের সমান ও ঈশ্বর বিম্ব, সুতরাং প্রতিবিম্ব যখন বিম্বের প্রতিচ্ছায়া তখন বিম্বচৈতন্য ঈশ্বর অবশ্যই নিকটতম, তিনি অন্তঃকরণের মধ্যে অন্তর্যামী-রূপে থাকেন। তিনি বলেছেন: "'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' ইত্যাদি শ্রুত্যা ঈশ্বরস্যৈব জীবসন্নিধানেন তদন্তর্যামিভাবেন বিকারান্তরাবস্থানশ্রবণদিতি"। এ'কথা গীতার (১৮।৬১) "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া' শ্লোকের সার্থকতা প্রমাণ করে।

৪০। মাণ্ডুক্য উপনিষদেও আছে: "দেবস্যৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"।

৪১। কৌষীতকী উপনিষৎ ৩।৯

৪২। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ (১৩৪৭), পৃঃ ৮

৪৩। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Doctrine of Karma*, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য।

৪৪। অপ্পয়দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে ঈশ্বরের প্রশ্ন নিয়ে বাচস্পতিমিশ্রের অবচ্ছেদবাদসম্বন্ধে আলোচনা করার পর "অপরে তু", "ব্রহ্মণ এব অবিদ্যয়া জীবভাবঃ" কথাগুলিতে অন্যপক্ষীয় মতে সিদ্ধান্তপ্রতিপাদন করেছেন এ'ভাবে: "এবং চ স্বাবিদ্যয়া জীবভাবমাপন্নস্যৈব ব্রহ্মণ সর্বপ্রপঞ্চকল্পকত্বাৎ ঈশ্বরোহপি সহ সর্বজ্ঞত্বাদিধর্মৈঃ স্বপ্নোপলব্ধদেবতাবজ্জীবকল্পিত ইত্যাচক্ষতে",—অর্থাৎ বৃহদারণ্যকভাষ্যে ও বার্তিকে আছে যে, আপন অবিদ্যার অধীন হোয়ে ব্রহ্ম

যেন জীবভাবাপন্ন এবং তিনি বিশ্ব প্রপঞ্চের কল্পনা করেন। সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি ধর্মযুক্ত ঈশ্বর কল্পিত,—যেমন মানুষ স্বপ্নে সর্বজ্ঞ দেবতার কল্পনা করে।

৪৫। গীতা—২।২-২৪

৪৬। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Self-knowledge*, পৃঃ ১২১ দ্রষ্টব্য।

৪৭। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Life Beyond Death*-র ২৭২ পৃষ্ঠায় ঔষধাদির ব্যবহার ও মৃতদেহকে মমি (Mummy) ক'রে মাটির ভিতর কিভাবে রাখা হোত তার বর্ণনা করেছেন।

৪৮। Subconscious state of the mind অর্থে মনের অবচেতন স্তর। একে বেদান্তদর্শনে সুষুপ্তি বা অব্যক্ত বলা হয়েছে। অবচেতন মনেই প্রতিজন্মের সংস্কার সঞ্চিত থাকে, তাই অভেদানন্দ মহারাজ একে 'সবার চেয়ে বড় স্তর' বলেছেন। *True Psychology*-গ্রন্থে (পৃঃ ৪৪, ৪৮) তিনি বলেছেন: "It is the vast field, and contains the germs * * greater than the mind * * on the conscious plane"। প্রতিদিন আমরা যখন গভীরভাবে নিদ্রা যাই তখন ঐ অবচেতন স্তরে গিয়ে স্থিত হই। জাগ্রত অবস্থা 'conscious state of the mind',—মনের চেতনস্তর। Subconscious state of mind-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছেন তা *Complete Works of S. V.*. vol, VI, p. 27 দ্রষ্টব্য। আমাদের সকল কর্ম চেতন স্তরে সম্পন্ন হয়। স্বপ্নে জাগ্রতের স্মৃতি সংস্কারের আকারে থাকে। সুষুপ্তিতে অর্থাৎ অবচেতন স্তরে সংস্কারমাত্র থাকে, তখন সংস্কার ব্যক্ত নয়—অব্যক্ত। অব্যক্ত অবস্থায় মূল-অজ্ঞান থাকে আর থাকেন সেই সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। এই ধারণাই পরে অর্ধনারীশ্বরে পরিণত হয়।

৪৯। এ'কথাই কেনোপনিষদে: "কেনেষিতং পতিত প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ" ইত্যাদি শ্লোকে মন, প্রাণ, বাক্য চক্ষু এ'সব আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয় একথা বলা হয়েছে। আত্মা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ",—শ্রোত্রের ও মনের কেন্দ্র বা উৎসস্বরূপ। তাহলেও মন আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না: "যন্মনসা ন মনুতে"—(কেন ১।৫)। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Self-knowledge*-গ্রন্থে Realiza-

tion of the Self-বিষয়বস্তুর (পৃঃ ১০০) আলোচনাপ্রসঙ্গে একথার উল্লেখ করেছেন। আত্মচৈতন্য দর্শনশক্তির পিছনে থাকে বলেই আমরা দেখতে পাই। স্বামিজী মহারাজ মনকে বলেছেন : "finer matter in vibration", —মন কতকগুলো সূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি। এক মুহূর্তের জন্যও তার কম্পনের স্থির নাই। মনের কম্পন থেকে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও সংবেদনের সৃষ্টি হয় : "The vibrations of the mind substance produces perceptions and sensations" (পৃঃ ১০১)। মনের সূক্ষ্মকম্পনশীল উপাদনগুলির নাম স্বত্ত্ব— "the vibrations of the finer particles of the ethereal substance are called in Sanskrit *sattva*"।

৫০। "আত্মায় লয় পায়" বলতে স্বামিজী মহারাজ *Self-knowledge*-এ (পৃঃ ৬৯) ও *Life Beyond Death*-গ্রন্থে (পৃঃ ২২৯-২৩০) বলেছেন মৃত্যুর পর 'প্রাণে' (life-force-'এ) সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি লয় পায়। কৌষীতকী ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণ 'মুখ্যপ্রাণ' নামে উল্লিখিত। স্বামিজী মহারাজ একে life-force (জীবনীশক্তি) বলেছেন (vide *Self-knowledge*, p. 58)। উপনিষদে এই প্রাণকে জ্যোতি বা চৈতন্যস্বরূপ প্রজ্ঞার সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে : "যে বৈ প্রাণঃ স প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" (১।৩।৩)। অভেদানন্দ মহারাজ *Self-knowledge*-গ্রন্থে (পৃঃ ৫৫) এ' কথাই বলেছেন : "* * the Prāna or life-force is inseparable from intelligence"। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'মুখ্যপ্রাণ' শরীরের সকল শক্তি নিজের ভিতর আকর্ষণ ক'রে উৎক্রমণ করে। কৌষকীতে তাই বলা হয়েছে : "স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতি * * যথা প্রজ্ঞায়াং সর্বাণি ভূতানি একীভবন্তি * * ;" (কৌ উঃ ৩।৪)। গীতাতেও আছে : "যদা সংহরতে চায়ং কূর্মাঙ্গানীব * *" (২।৫।৮)।

৫১। 'অজ্ঞান আর চৈতন্য থাকে' অর্থে-ব্রহ্মচৈতন্যের তখন পূর্ণপ্রকাশ থাকলেও মূল-অজ্ঞান সেই প্রকাশকে আবৃত অর্থাৎ অভিভূত ক'রে থাকে। এই আবণের অবস্থাই সুষুপ্তি। সুষুপ্তির অবস্থায় মানুষ প্রতিদিন ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়, তবে ঐ মূল-অজ্ঞান থাকার জন্য ব্রহ্মের সঙ্গে এক হওয়ার জ্ঞানকে উপলব্ধি করা যায় না। সমাধির অবস্থা অনেকটা সুষুপ্তির মতো। তবে দুইয়ের পার্থক্য হোল সমাধি থেকে নেমে আসার পরও ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞান সর্বদা

থাকে, আর ভ্রম হয় না, কিন্তু প্রতিদিনের সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত হোলে আমাদের অজ্ঞান দূর হয় না। সিদ্ধান্তলেশকার এ'সম্বন্ধে একটু অপরভাবে বলেছেন: "বিভেদজনকোঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে। আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি"। টীকার কৃষ্ণানন্দ তীর্থও আশঙ্কা তুলেছেন এই ব'লে: "স্বাপপ্রলয়াদৌ অজ্ঞানকার্যনাশেন তৎকরণাজ্ঞানস্যাপি নাশোঽস্তি। পরিণামপরিণামিনোরভেদাৎ। স চাজ্ঞাননাশো নাত্যন্তিকঃ। পুনরুত্থানাৎ। মুক্তৌ তু তত্ত্বজ্ঞানেন স্বরূপেণাপি নাশোঽস্তি। স চাত্যন্তিকঃ। পুনরুত্থানাভাবাদিতি মত্বা অজ্ঞাননাশস্যাত্যন্তিকত্বং বিশেষণং দত্তম্"।

এ'সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *True Psychology*-গ্রন্থে বলেছেন: "Now what difference is there? In the deep sleep state or *suṣupti*, you go down to your subconscious plane, where the mind or intelligence (*mana* or *buddhi*) is fully covered over by the *tamas* quality (*tamaguna*), * * * but this kind of darkness (ignorance) does not prevail in the superconscious state or *samādhi*. But it exists in the deep sleep state or *suṣupti*. In the deep sleep, the consciousness or intelligence is fully covered by the nescience or *avidyā*, and distinguishing or discriminating faculty remains unmanifested or dull. The superconscious state is quite different, because, though consciousness or pure intelligence is overpowered by the causal nescience (*kārana-ajñāna*) or *māyā*, yet the self-effulgent light of the pure consciousness reigns supreme in the superconscious state, and so the power of discrimination and knowledge are not lost there. Therefore, if you enter once into the state of superconscious or *samādhi*, you will be a new man, possessed of divine knowledge or pure consciousness. And there lies the difference between the deep sleep state or *suṣupti* and the state of superconsciousness or *samādhi*. Another difference is noticed between them that when a man of ignorance awakes from the deep sleep or *suṣupti*, he remains as ignorant as before, no change is found in his experience or knowledge, but when he comes down (*vyutthāna*) from the

highest state of superconsciousness (*samādhi*), he is entirely changed into a different man, he becomes a man of divine illumination or God-man" (pp. 160-161).

তিনি পুনরায় এ' গ্রন্থে বলেছেন : "Another point will make you realize the differance between the states, subconscious and superconscious. When a man goes to sleep and when the same man wakes up, there is no change between the waking man and sleeping man, For instance, if one goes to sleep as an idiot, he comes out as an idiot, when he wakes up. He has not changed into a wise man all at once by sleeping, or by going to the subconscious plane, But when he goes to the superconscious plane, he becomes a wise man and a saint when he wake up, because, in that plane he has realized God, the Absolute. That is the difference" (vide pp.-166—167)।

৫২। কৌষীতকী উপনিষদে (১।৩) আছে মৃত্যুর পর জীবাত্মা যদি দেবযান ('the path of the gods') দিয়ে অতিক্রম করে তবে প্রথম অগ্নিলোকে যায়, তারপর সে বায়ুলোক, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে গমন করে : "স এতং দেবযানং পন্থানমাসাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স আদিত্যলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকম্"। তাছাড়া পিতৃযানে গমন করলে চন্দ্রলোকে যাবার কথাও আছে। "বৈকুণ্ঠাঽপরাজিতা" (৪।৮) এসব লোকের কথাও পাওয়া যায়। এ'সমস্ত লোক কর্মমার্গীদের জন্য, মুক্তিকামীদের জন্য নয়। গীতায় (৮।১৬) আছে : "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন",—অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবাত্মা যে লোকেই যাক না কেন, কর্মের ফলভোগ শেষ হোলে আবার সে পৃথিবীতেই ফিরে আসে। তাছাড়া প্রশ্ন-উপনিষৎ ১।৯; ঋগ্বেদ ১০।১৯।১, ১০।২।৭; ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১০।৪-৬ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬।২।১৫ শঙ্খ্যায়নব্রাহ্মণ ৩।১-৭ প্রভৃতিতে 'লোক'-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

৫৩। কৌষীতকী উপনিষদে (১।৪।১৯) আছে : " * * যত্রৈতদভূত্তত এতদাগাদ্ধিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতন্বন্তি"। বৃহদারণ্যক

উপনিষদে (২।১।১৯) আছে : "অথ যদা সুষপ্তো ভবতি, যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে * *"। মানুষ যখন গভীরভবে ঘুমায় তখন বাইরের কোন বিষয়ে তার আর জ্ঞান থাকে না। সে সময়ে যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে পুরীতৎ নাড়ীর দিকে গেছে সেই হিতানাড়ী দিয়ে প্রাণরূপী জীবাত্মা বহির্গত হয় এবং পরে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হোয়ে অবস্থান করে। শাংকরভাষ্যে ও আনন্দগিরির টীকায় একথা আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা আছে।

৫৪। সাংখ্যসূত্র ১।১৯

৫৫। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *True Psychology*, পৃ: ১৮৪-এবং *Reincarnation*, পৃ: ২০

৫৬। *Reincarnation*, পৃ: ২২ দ্রষ্টব্য।

৫৭। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃ: ৮০

৫৮। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *True Psychology*, পৃ: ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য।

৫৯। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১৪শ সঃ), ১ম ভাগ, পৃ: ৫০

৬০। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।১।১৮) জাগ্রত ও স্বপ্ন দুটি অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে ঠিক এরকম কথাই বলা হয়েছে। যেমন: "এবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্তেতে",—অর্থাৎ পুরুষ নিজের বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে জাগ্রত স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে স্বকর্ম-অর্জিত সূক্ষ্মশরীরের ভিতর পুনরায় বিচরণ করে। আচার্য শংকর এ'সম্বন্ধে ভাষ্যে আরো পরিষ্কারভাবে বলেছেন: 'প্রাণান্ গৃহীত্বা জাগরিতস্থানেভ্য উপসংহৃত্য স্বে শরীরে এব দেহে—ন বহিঃ, যথাকামং পরিবর্তেতে—কামকর্মাভ্যামুদ্ভাসিতাঃ পূর্বানুভূতবস্তুসদৃশীর্বাসনা "অনুভবতীত্যর্থঃ",—অর্থাৎ জীবাত্মা প্রাণসমূহকে (প্রাণ, আপন, সমান প্রভৃতিকে) জাগ্রত অবস্থা থেকে আহরণ ক'রে নিজের স্বপ্ন বা সূক্ষ্মদেহের ভিতর ইচ্ছানুসারে অনুভব তথা ভোগ করে, কিন্তু জাগ্রতের কামনা বা কর্মানুসারে সৃষ্ট পূর্বেকার অনুভূত বস্তুর বাসনাগুলিকে অনুভব করে না।

৬১। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Life Beyond Death*, পৃঃ ১৫৬-১৫৭, ১৩৮, ১৪৩ এবং *Path of Realization*, পৃঃ ১৭৫-১৯৮ দ্রষ্টব্য।

৬২। মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পদকারিকায় (৩।৩১) একটিমাত্র কথায় এটি বোঝানো হয়েছে: "মানোদৃশ্য মিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎসচরাচরম্। মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নবোপলভ্যতে" ॥ মনেই দ্বৈত, সুখ-দুঃখ ও সংসার এবং মনের নাশে এদের কোন-কিছুই থাকে না। লঙ্কাবতারসূত্রে (২।১৩৬) জগৎ বা লোকসমূহ যে চিত্তমাত্র অর্থাৎ মনের কল্পনা তা উল্লেখ করা হয়েছে: "চিত্ত-মাত্রং যদা লোকং প্রপশ্যন্তি জীতাত্মজা"। সংস্কার থেকে সংসারের সৃষ্টি একথা শূন্যবাদী নাগার্জুন মাধ্যমিক কারিকায় স্বীকার করেছেন: "সংসারমূলং সংস্কারঃ * *"। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের সিদ্ধান্তও তাই। "মনোমনন-নির্মাণমাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্" (৪।১১।৪৩), "সর্বং সংকল্পরূপেণ চিচ্চমৎকুরুতে চিতি' (৬।৫২।১৬)।

৬৩। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১৪শ সংস্করণ) ১মভাগ, পৃঃ ৫২-৫৩

৬৪। গীতা ১।৩৮

৬৫। "বহুশাখাহ্যনন্তশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।'—গীতা ২।৪২

৬৬। 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম'-গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: 'আমাদের স্বর্গের কথাও বলা হয়। কিন্তু ইহা কোথায়? কোথায় এই স্বর্গ? প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ একটি মানসিক অবস্থামাত্র। * * আপনারা ঘুমন্ত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখেন, তেমনি পৃথিবীর অন্তর্গত সমস্ত ব্যাপারও স্বপ্নের ন্যায়'। —শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম, পৃঃ ৫১-৫২।

৬৭। অভেদানন্দ মহারাজ এই সকল ঘটনা অনেকবার অনেকের কাছেই বলেছেন। তাঁর *Life Beyond Death*-গ্রন্থের Appendix D-এ (পৃঃ ২৬৮-২৭৯) এ' প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

৬৮। ঠিক এ'রকমের একটি ঘটনা ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে ছিলেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বসে আছেন, হঠাৎ মানুষের একটি মুখ বাতাসে ভেসে এসে তাঁর সামনে এলো ও কাতর হোয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে। স্বামিজী তাকে আশীর্বাদ করলে দেখলেন প্রেতাত্মার ম্লান মুখ জ্যোতির্ময় হোয়ে অদৃশ্য হোল। তিনি

অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলেন সত্যই একটি লোক ঐ বাগানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'-গ্রন্থে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এ'ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

৬৯। যোগানন্দ স্বামিজীর "Slate-writing"-এর কথা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Life Beyond Death*-গ্রন্থে (পৃঃ ২১২-২১৭) উল্লেখ করেছেন, সুতরাং এখানে আর ঐ ঘটনার উল্লেখ করলাম না।

৭০। গীতা ২।১৬।

৭১। গীতা ২।২৮ এবং মহাভারতের স্ত্রীপর্বে আছে,

অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥

গীতার ১৫।৩ শ্লোকেও পুনরাবৃত্তি আছে,

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥

আচার্য শংকর এর ভাষ্যে বলেছেন: "* * তথা ন এব উপলভ্যতে স্বপ্ন-মরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্বনগরসমত্বাদ্ দৃষ্টনষ্টস্বরূপো হি স ইতি অতএব ন অন্তো ন পর্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তিঃ বা বিদ্যতে" প্রভৃতি। কঠোপনিষদের ১৬।১ শ্লোকেও "উর্ধমূলঃ অবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" এবং মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে 'ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ' বলা হয়েছে। 'অশ্বত্থ' অর্থে অ+শ্বঃ+স্থ অর্থাৎ যাহা বর্তমানে আছে, কাল বা পরক্ষণে থাকিবে না এমনই অনিত্য সংসার।

৭২। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-প্রণীত *True Psychology*, পৃঃ ৩১-৩২ এবং *Doctrine of Karma*, পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

৭৩। বেদান্ত বলতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অদ্বৈত বেদান্ত বলেছেন।

৭৪। এই 'change' অর্থে স্বামিজী মহারাজ *True Psychology*-গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৮) বলেছেন: "By change, I mean it is subject to growth, progress and evolution".

৭৫। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *True Psychology*, পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য।

১৬। সাংখ্যদর্শনের 'পুরুষ' এবং উপনিষৎ বা বেদান্তের 'আত্মা' ঠিক এক নয়। বেদান্তের আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অতীত হোলেও এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু নিঃসঙ্গ এবং সুখ-দুঃখের অতীত। সাংখ্যের পুরুষ অদ্বিতীয় নন,—বহু। মনে হয় সাংখ্যীয় পুরুষের চিরমুক্ত অসঙ্গতার ধারণা থেকে পরবর্তী কালে বেদান্তের অসঙ্গ ও অদ্বিতীয় আত্মার ধারণা বিকাশ লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক বিকাশের ধারাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতীয় ভাবধারায় সাংখ্যীয় মতবাদ বা ধারণার প্রাচীনত্বকেই স্বীকার করা হয়। সাংখ্যীয় ভাবধারাকে ভিত্তি করেই বেদান্তের অতিসূক্ষ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ (transcending) ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়। তাছাড়া উপনিষদে কোন কোন স্থানে 'আত্মা'-শব্দের স্থানে 'পুরুষ'-শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন 'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা পরা গতিঃ (কঠ উঃ ১৷৩ ১১) তাছাড়া ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের বহুস্থানে 'পুরুষ'-শব্দে 'আত্মা'-বোঝানো হয়েছে।

১৭। গুণ বা বিশেষণের স্বভাব কোন জিনিসকে সীমাবদ্ধ (limited) করা। যেমন 'মানুষ'-শব্দ যখন আমরা ব্যবহার করি তখন জগতে যত মানুষ বা মনুষ্যজাতি আছে তাদেরকে বুঝি, কিন্তু যখন সেই 'মানুষ'-শব্দে কোন গুণ বা বিশেষণ আরোপ করি—যেমন দীর্ঘ মানুষ বা ক্ষুদ্র মানুষ প্রভৃতি, তখন জগতের সকল মানুষকে বোঝায় না, কেবল যারা দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র মানুষ তাদেরই বোঝায়। সুতরাং দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র বিশেষণ দিয়ে আমরা মানুষের অখণ্ডতাকে বিভক্ত বা সীমাবদ্ধ করি।

১৮। গীতায়ও (১৩৷২০-২১) এ'কথাই বলা হয়েছে,

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে অনাদি। বুদ্ধি, দেহ ও ইন্দ্রিয় পর্যন্ত সমস্ত বিকৃত। সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক গুণগুলি প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট। দেহরূপ কার্য ও দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এদের উপাদানের জন্য প্রকৃতি একমাত্র কারণ, প্রকৃতি থেকেই এদের সৃষ্টি।

৭৯। স্বষ্টি মিথ্যা বলায় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বুঝবে হবে।

৮০। (ক) 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।'—ঈশোপনিষৎ ৮

(খ) 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ ০ ০।'—গীতা ৮।৯

৮১। 'প্রাণই ব্রহ্ম' অর্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রাণোপধিক হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম বলেছেন। ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভের মধ্যে পৃথকবুদ্ধি করি ধারণার সুবিধার জন্য, আসলে ঈশ্বরচৈতন্য ও হিরণ্যগর্ভচৈতন্য এক। কিন্তু ধারণার স্তরে এরা আলাদা,—একটি কারণ ও অপরটি কার্য।

৮২। গীতা ২।২৯

কঠোপনিষদের ১।২।৭ শ্লোকের মর্ম তাই।. যেমন,

শ্রবণায়পি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃন্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।

আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

৮৩। এর আর একটি ব্যাখ্যা এই: যিনি আত্মাকে দর্শন করেন তিনি আশ্চর্য, যিনি আত্মার সম্বন্ধে বলেন এবং শ্রবণ করেন তিনিও আশ্চর্য। আত্মরহস্য শুনেও আবার সকলে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না, কেননা আত্মজ্ঞান আশ্চর্য কিনা দুর্লভ। আচার্য শংকর দু'রকম ব্যাখ্যাই করেছেন।

৮৪। ঈশোপনিষৎ ৪

৮৫। ঈশোপনিষৎ ৫

৮৬। ঈশোপনিষৎ ৫

৮৭। ঈশোপনিষৎ ৮

৮৮। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং, পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং, পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥

৮৯। গীতা ১১।৩২

৯০। "তথা দেহধর্মান্ স্থূলোঽহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘ্যামি চেতি। তথেন্দ্রিয়ধর্মান্—মূকঃ; ক্লীবঃ, বধিরঃ অন্ধোঽহমিতি। * * এবময়মাদিরণন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কোর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্বলোক-প্রত্যক্ষঃ। অস্যামর্থহেতোঃ আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে"।

৯১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

তৎ স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তৎ বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তৎ বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥”—কঠ ২।৩।১৭

৯২। স্বামী অভেদানন্দ: *True Psycology*, পৃঃ ১৯২ দ্রষ্টব্য।

৯৩। গীতা ৩।৩৬; ৯৪। গীতা ৩।৩৭;

৯৫। নারদপরিব্রাজক-উপনিষৎ ৩।১ ৯৬। নারায়ণউপনিষৎ ১২।৩;

৯৭। গীতা ২।৬২-৬৩

৯৮। স্বামী অভেদানন্দ: *Doctrine of Karma* (1944), পৃঃ ৩৬ দ্রষ্টব্য।

৯৯। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *True Psycology*, পৃঃ ১২৯ দ্রষ্টব্য।

১০০। গীতা ২।৬৪; ১০১। ২।৬৫;

১০২। গীতা ৮।৭১; ১০৩। গীতা ১৬।২১

১০৪। বিখ্যাত জ্যোতিষী বরাহমিহিরের সহধর্মিণী।

১০৫। গীতা ১৬।২১

১০৬। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Doctrine af Karma*, পৃঃ ১২৭ দ্রষ্টব্য।

১০৭। প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকর বলেছেন: “মায়ানাম বহিরন্যথা আত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্যং করোতি, সা মায়া মিথ্যাচার-রূপা”।—প্রশ্নোপনিষৎ ১।১৬

১০৭ (ক)। (পৃঃ ১০৬) বিভিন্ন শাস্ত্রকারেরাও এ’কথাও বলেছেন:

(ক) “চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসংকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥”—স্মার্তধৃত যামদগ্নিবচনম্।

(খ) নির্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ ॥
—মাণ্ডুক্যভাষ্যধৃতবচন

(গ) এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥—মহানির্বাণতন্ত্র

(ঘ) বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জিতঃ।
কর্তাবহিরকর্তান্তরেবং বিহর রাঘব ॥—যোগাশিষ্ট

১০৮। শাঙ্করভাষ্য ২।৭।১৪

॥ উপনিষৎ ॥

১। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১।২—৩; পাতঞ্জলদর্শনে (৩।৩৪) "হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্" এই সূত্রের ভাষ্যে ব্যাস বলেছেন: "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, তত্র বিজ্ঞানম্ * *"।

১। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১।১—২; ৩। মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১।৭

৪। কঠ উপনিষৎ ১।১।১৪; ৫। শ্বেতাশ্বর উপনিষৎ ৩।১৩

৬। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।২০; নারায়ণ উপনিষৎ ১২।১

৭। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।১ ১; ৮। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।১।৭

৯। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, শীক্ষাবল্লী ৮ম অনুবাক্

১০। "য এবাসৌ তপতি, তমুদ্গীথমুপাসীত।" —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।৩।১

১১। পাতঞ্জলদর্শনে আছে: "ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ" (৩।২৬),—এখানে সূর্যে মনঃসংযম ক'রে বিভূতিলাভের কথা বলা হয়েছে। যোগে বিভূতি বা অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু বিভূতি বা সিদ্ধিব দ্বারা আত্মোপলব্ধি হয় না একথা শ্রীবামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণসন্তানেরাও বলেছেন।

১২। পাতঞ্জলদর্শনে "হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্" (৩।৫৪)। সূত্রে ঐ চিত্তজ্ঞানরূপ বিভূতিলাভের উদ্দেশ্যে হৃদয়ে ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

১৩। পাতঞ্জলদর্শন ১।২৮

১৪। Medulla oblonta-য় ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদুটি পরস্পরকে cross করেছে। একে যোগশাস্ত্রে 'মুক্তত্রিবেণী' বলে, কেননা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী-তিনটি এখান থেকে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন। মূলাধারকে (basic lotus) 'গুপ্তত্রিবেণী' বলে, কারণ এখানে ঐ তিন নাড়ী পরস্পর মিলিত।

১৫। কঠ উপনিষৎ ১।২০ ১৬। কঠ উপনিষৎ ১।২২

১৭। কঠ উপনিষৎ ১।২৩ ১৮। কঠ উপনিষৎ ১।২৪

১৯। কঠ উপনিষৎ ১।২৫ ২০। কঠ উপনিষৎ ১।২৬

২১। কঠ উপনিষৎ ১।২৭ ২২। ঐ ১।২৮

২৩। ঐ ১।২৯ ২৪। ঐ ২।১

২৫। ঐ ২।২

॥ বিবিধপ্রসঙ্গ ॥

১। স্বার্থপরতাই অজ্ঞান একথা অভেদানন্দ মহারাজ *True Pyscho-logy*-গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৯২)।

২। পুরোহিতপ্রথার সৃষ্টি বেদের চেয়ে ব্রাহ্মণের যুগেই বেশী হয়েছিল একথা ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন।—Vide Rādhākrishnan : *Indian Philosophy*, Vol, 1, pp. 124-125.

৩। গীতা ৬।২২

৪। ভ্রম বা অধ্যাস নিয়ে আলোচনার সময় সিদ্ধান্তলেশকার অপ্পয়-দীক্ষিত বলেছেন আসলে ঈশ্বর বিম্ব ও জীবজগৎ প্রতিবিম্বের সমান। শংকর ও বিবরণসম্প্রদায় প্রতিবিম্ববাদী। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অবচ্ছেদবাদী। শংকর ও বিবরণের মতে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ কল্পিত অর্থাৎ অধ্যস্ত: "প্রতিবিম্বে বিম্বাৎ ভেদমাত্রস্যাহধ্যস্তত্বেন * *"। কিন্তু চৈতন্যরূপে জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য (অথবা ব্রহ্মচৈতন্য) দুই এক: "স্বরূপেণ তস্য সত্যত্বান্ন প্রতিবিম্বস্বরূপজীবস্য মুক্ত্যান্বয়াসম্ভব ইতি"।

৫। একথাই অভেদানন্দ মহারাজ *Path of Realization*-গ্রন্থে বলেছেন অন্যভাবে, পৃষ্ঠা ২৪ দ্রষ্টব্য।

৬। ভগবদ্গীতার রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। গীতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। কারু কারু মতে পরবর্তী যুগে মহাভারতের ভিতর এই অংশ যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু বেশী ভাগ পণ্ডিতের মতে গীতা মহাভারতের সমসাময়িক এবং অভিন্ন অংশ বটে। লোকমান্য তিলক গীতারহস্যের গোড়ারদিকে মহাভারত এবং গীতার ভাষা ও লিখনভঙ্গীর সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেছেন গীতা মহাভারতে একটি অংশ। পণ্ডিত টলবয়েজ হুইলার (Talboys Wheeler) একথা স্বীকার করেন। মনীষী তেলাঙের অভিমত অনেকটা এ'রকম। তেলাঙের মতে গীতার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতক। ডঃ আর. জি. ভাণ্ডারকর বলেন ৪০০ খৃষ্টপূর্ব শতকে গীতা লিখিত। অধ্যাপক গার্বে বলেছেন ২০০ খ্রীষ্টপূর্বশতকে। গার্বের মতে গীতার বর্তমান রূপই গ্রহণ করেছে ২০০ খৃষ্টাব্দে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ও রাধাকৃষ্ণনের

মতে বৌধায়নগৃহ্যসূত্রে যখন বাসুদেবের পূজার উল্লেখ আছে তখন বুঝতে হবে গৃহ্যসূত্রকার নিশ্চয়ই গীতার কথা জানতেন। বৌধায়নগৃহ্যসূত্র আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রেরও পূর্বের গ্রন্থ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন আপস্তম্বের রচনাকাল ৩য় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, সুতরাং বৌধায়নের রচনাকাল ১ম অথবা ২য় শতকের বেশী নয়। এ' থেকে গীতার রচনাকাল ৫ম শতক (খৃষ্টপূর্ব) অনুমান করা যেতে পারে (vide Prof. Rādhākrishnan: *Indian Philosophy*, Vol. 1, 522-24)। অবশ্য এটিও আবার স্থিরসিদ্ধান্ত নয়।

৭। অভেদানন্দ মহারাজও একথা বলতেন: "Gitā is nothing but the divine echo the Upanisads",—গীতা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষৎ বা শ্রুতির সার হোলেও তাই গীতাকে বলা হয় 'স্মৃতি'। গীতার ধ্যানমন্ত্রে আছে: "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ"। শ্রীকৃষ্ণকেই দোগ্ধা বা রচয়িতা বলা হয়েছে। অবশ্য এটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়। তবে একথা সত্য গীতার রচনা বা compilation এমনই এক যুগে হয়েছিল যখন জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি সকল মতের বা সম্প্রদায়ের ভিতর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্যের (conflict-এর) ভাব ছিল। মনে হয় এদের সকলের সঙ্গে compromise বা মিতালী পাঠিয়ে harmony আনার জন্য উদারতার ভাব নিয়ে গীতাগ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। অনেকে বলেন গীতা রচনা করা হয়েছিল এক compromising period বা 'in the period of synthesis'—মিলনের বা সমন্বয়ের যুগে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ একথা অপরভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "While only the rich could buy off the gods by their sacrifices, and only the cultured could persue the way of knowledge, the *Gitā* teaches the method which is within the reach of all, that of *bhakti*, of devotion to God. · · · The *Gitā* attempts to synthesize the heterogeneous elements and fuse them all into a single whole"।

গীতায় সাংখ্যের তিন গুণ ও প্রকৃতি, পাতঞ্জলের যোগ ও বেদের ক্রিয়াকাণ্ড বা যাগযজ্ঞের কথা আছে—যদিও কপিলের সাংখ্যের ও গীতার সাংখ্য-

যোগের সঙ্গে হুবহু মিল নাই। কপিলের নাম গীতায় আছে, কিন্তু পতঞ্জলির নামের কোন উল্লেখ নাই, অথচ গীতায় যোগসম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ-বাক্যের ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে সেগুলি পতঞ্জলির যোগদর্শনের প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত থেকে বেশ ভিন্ন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গীতার মধ্যে ঠিক পাওয়া যায় না। অধ্যাপক গার্বে ও হপ্‌কিন্সের মতে গীতার বিষয়বস্তু লেখা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। অধ্যাপক কীথ গীতাকে শ্বেতশ্বতর উপনিষদের মতো একটি উপনিষৎ বলেছেন।—cf. Rādhākrishnan: *Indian Philosophy*, Vol. 1, pp. 529-530। অবশ্য নানা মুনির নানা মত, তবে একথা সর্ববাদীসম্মত যে গীতা একটি মিলনমন্ত্রের গ্রন্থ।

৮। নিদিধ্যাসন এবং পাতঞ্জলদর্শন বা যোগের ধ্যান বা সমাধি এক নয়, কারণ নিদিধ্যাসনে অজ্ঞান ধ্বংস হয় ও থাকে একমাত্র 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শুদ্ধজ্ঞান, কিন্তু যোগের ধ্যান বা সমাধিতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ মাত্র হয়। যোগে supression বা নিরোধ এবং বেদান্তে transformation বা রূপান্তর।

৯। কঠ উপনিষৎ ২।২

১০। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১৪ সং), ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৫-১২৬, ১৬৫

১১। স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত *Doctrine of Karma*, পৃঃ ৯৪ দ্রষ্টব্য।

১২। গীতা ৩।১৫

১৩। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২।৪।১০

১৪। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শংকর বলেছেন: "ঋগ্বেদাদ্যস্য সর্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিঃশ্বাসবৎ যস্মান্ হেতো ভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ'। গীতাভাষ্যেও (৩।১৫) তিনি 'পুরুষনিঃশ্বাসবৎ সমদ্ভুতং ব্রহ্ম' বলেছেন।

১৫। অভেদানন্দ মহারাজ *Ideal of Educatian*-গ্রন্থে (পৃঃ ২০) বলেছেন: . . they (Hindus) did not mean by the Vedas a set of books which must be accepted as true in every letter, but they meant by Veda, wisdom'.

১৬। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৪র্থ সূত্র) আচার্য শংকর স্বীকার করেছেন: "কর্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্বৈলক্ষণ্যাৎ। শারীরং বাচিকং মানসং চ কর্ম শ্রুতিস্মৃতি-

সিদ্ধং ধর্মাখ্যং,……মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারম্যমনুশ্রূয়তে। ততশ্চ তদ্ধেতোর্ধর্মস্য তারতম্যং গম্যতে”। কর্মের ফল ও ব্রহ্মবিদ্যারূপ ফল এক নয়। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদ্য নয়, তা accomplished fact বা বস্তুতন্ত্র।

১৭। সদানন্দ-যতি 'বেদান্তসার'-এর প্রথমে বলেছেন: "বেদান্তো নামোপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরিকসূত্রাদিনী চ।" উপনিষদই বেদান্ত।

১৮। জ্ঞান বলতে ব্রহ্মজ্ঞান। শুদ্ধ নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্য অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেতেন ব্রহ্ম 'শুদ্ধ মনের গোচর', অর্থাৎ বিশুদ্ধবুদ্ধি (তথা জ্ঞান) দিয়ে ব্রহ্মের অনুভূতি হয়। ব্রহ্ম অনুভূতি বা উপলব্ধির স্বরূপ: "যদ্যপি ব্রহ্মণি স্বয়মেব স্বচ্ছতাস্তি তথাপ্যজ্ঞানাবরণভঙ্গার্থং বৃত্ত্যপেক্ষা"। আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "অনুভবাবসানত্বাদ্ ভূতবস্তু বিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানম্' (ভাষ্য ১।১।২)। চিৎপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্ম প্রতিভাসিত হন। ব্রহ্মের জ্ঞানসম্বন্ধে অজ্ঞাননাশের জন্য বৃত্তি স্বীকার করা হয়। বেদান্তসারে সদানন্দ-যতি এ'সম্বন্ধে বলেছেন: 'অহং ব্রহ্মস্মি' জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড ব্রহ্মাকার এক বৃত্তি সৃষ্টি হয়। এই চিত্তের বৃত্তিতে বিম্বরূপ শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাই প্রত্যক্‌চৈতন্য ব্রহ্মের সঙ্গে চিত্তচৈতন্য এক বা অভেদ হোলে আত্মাসম্বন্ধে যে অজ্ঞান থাকে তার ধ্বংস হয় এবং বৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়, সুতরাং তখন স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তখন 'বোধে বোধ' অর্থাৎ জ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র থাকে। বৃত্তিকার সুরেশ্বরাচার্যও বলেছেন: 'ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা'। ব্রহ্মকে না জানা-রূপ অজ্ঞানের নাশের জন্য বৃত্তি স্বীকার করা হয়। বেদান্তসারে সদানন্দও বলেছেন: 'ব্রহ্মাস্মাত্যখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তি-রুদেতি। সা তু চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে।……চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি।… … তথা স্বয়ংপ্রকাশমান-প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাবভাসনার্হতয়া……প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মা-মাত্রং ভবতি"। বৃত্তিচৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞান দূর হয় এবং বৃত্তি আপনা থেকে নষ্ট হয়।

১৯। ব্রহ্মসূত্রে ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শংকর বলেছেন জ্ঞান ক্রিয়া নয়, কেননা ক্রিয়া পুরুষতন্ত্র, অর্থাৎ তা পুরুষের করা না-করার উপর নির্ভর করে। জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান কোন প্রযত্নের ফল নয় বা কোন প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে না। ক্রিয়ার 'চোদনা' অর্থাৎ কর্তব্যতা ও অকর্তব্যতা-রূপ বিধি থাকে সুতরাং তাহা পুরুষতন্ত্র, কিন্তু জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, কারণ জ্ঞান বিধিনিষেধ অর্থাৎ এটা কর বা এটা করো না এসব আদেশ-উপদেশের কোন অপেক্ষা রাখে না: "ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। এখানে "নন্থ জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া," —জ্ঞানও মানসব্যাপার সুতরাং ক্রিয়া হোক এই আশঙ্কা পূর্বপক্ষাবলম্বী করেছেন, কিন্তু আচার্য শংকর 'পুরুষতন্ত্রত্বাৎ' ব'লে ধ্যান বা চিন্তনকে জ্ঞান থেকে আলাদা করেছেন: "জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্। * * যথাভূত ব্রহ্মাত্মবিষয়মপি জ্ঞানং চোদনাতন্ত্রম্"। সুতরাং জ্ঞান বস্তুতন্ত্র ও স্বয়ংপ্রকাশ। শংকর জিজ্ঞাসাধিকরণে তাই বলেছেন: "ভূতং ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যং নিত্যত্বান্ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ" ব'লে জন্মাদ্যধিকরণে পুনরায় বলেছেন: "ব্রহ্ম বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। * * বস্তুতন্ত্রত্বাৎ এবং ভূতবস্তু-বিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ"।

২০। গীতা ১৮।৪৮

২১। এখানে অভেদানন্দ মহারাজ 'মনেরই active বা manifested অবস্থা' বলতে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলেছেন, নচেৎ মন নিজেই অন্তঃ-করণের বৃত্তি এবং মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্প। সাধারণত মন বা চিত্ত বল্লে অন্তঃকরণ বুঝতে হবে।

২২। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ হফডিঙ (Prof Hoffding) একথা স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক হফডিঙ্ (H, Hoffding) বলেছেন: "The mystic tries to lose himself in the Deity, to him an absolute unity, and to become one with the Deity, therefore he strives to avoid all changes of ideas, and the more he succeeds in doing so, the more nearly he approches to ecstasy—a con-

dition which is descriveed as being raised above all consciousness"—vide *Outlines of Psychology* (1925), p. 46.

২৩। কিন্তু আচার্য শংকর স্মৃত্যধিকরণেঃ (২২।১।১) "কপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধং বেদানুসারিমন্বচনবিরুদ্ধং চ" বাক্যে সাংখ্যমত খণ্ডন ক'রে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই সূত্রে (২।১।৩) "যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা" বলেছেন। আচার্য শংকর পতঞ্জলির এই নিরুদ্ধ অবস্থাকে আত্মার স্বরূপ বলেন নি। বৃত্তিকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ suppress করলে অন্তঃকরণ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম অথবা সাম্যাবস্থায় থাকে, তার একেবারে নাশ হয় না। তাই শংকর বলেছেনঃ দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ। * * তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি * * 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃহঃ উঃ ৩।৬।৫০) ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ"। তাই আত্ম-জ্ঞানই মুক্তির কারণ, যোগ নয়। অবশ্য অভেদানন্দ মহারাজ এখানে মাত্র পতঞ্জলির মতে আত্মস্বরূপের কথা বলেছেন।

২৪। গীতা ৩।৪

২৫। কথামৃত, ১ম ভাগ (৫৪শ সং) পৃঃ ২০১-২০২

২৬। বৃহস্পতিস্মৃতিতে এ ধরনের একটি উক্তি আছে,

ত্যজ ধর্মমধর্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ ॥

২৭। 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'।—পাতঞ্জলসূত্র ১।১৩

২৮। কামনাশূন্য অর্থে 'অহং'-বুদ্ধিহীন বা স্বর্থেজ্ঞানশূন্য নিষ্কাম কর্ম। জ্ঞানলাভের পরও কর্ম থাকে, কিন্তু কর্মে তখন স্বার্থের আসক্তি না থাকায় কর্ম অকর্মের মধ্যে গণ্য। জ্ঞানের পর জগদ্ধিতায় কর্ম করলে জ্ঞানী কর্মীকে মায়া বাঁধতে পারে না।

২৯। কথামৃত (১৪ শ সং) ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮

৩০। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।—গীতা ২।৫০

৩১। অধ্যাপক লিউবা ধর্মের ৪৮ রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক প্রাট বলেছেন ধর্ম কোন বস্তুর প্রতি মানুষের নমনীয় ভাব বা অবস্থা (attitude)—যা সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে (—*The Religious Consci-*

ousness, p. 3)। স্পিনোজা ধর্মকে বলেছেন ভগবানের প্রতি সচেতন বা বিচারপূর্ণ ভালবাসা ('an intellectual love of God')। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট ধর্মকে কর্তব্যের প্রত্যভিজ্ঞান (recognition of duties) বলেছেন, তবে সে প্রত্যাভিজ্ঞান ভগবানের আদেশ ('as divine commands') রূপে গণ্য। দার্শনিক ফিক্‌ট বলেছেন ধর্ম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ-অনুভূতির রূপ) "But herein Religion does consist, that man in his own person and not in that of another, with his own spiritual eye and that through that of another, should immediately behold, have, and possess God' (—*Doctrine of Religion*, pp, 405—406)। হেগেল বলেছেন ধর্ম ব্যষ্টি মন বা ব্যক্তির জ্ঞান-বিশেষ (knowledge) এবং সে জ্ঞান বিরাট মনের (ঈশ্বরের) এক রূপ ('of its nature as absolute mind')। ম্যাথ্ আর্নল্ড ধর্মকে নৈতিকতার (morality) ভিত্তিতে ভাবাবেশ (emotion) ও ঈশ্বরের সঙ্গে ওতঃপ্রোত বলেছেন। অধ্যাপক ব্র্যাডলি বলেছেন ধর্ম "the unity of man and God"—অর্থাৎ একটি মধুর সম্পর্ক যা থেকে জীব ও ঈশ্বরের ভিতর চিরমিলন হয় (—*Appearance and Reality*, p. 394)। অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস ধর্মকে বলেছেন অতীন্দ্রিয় এক পবিত্র শৃঙ্খলা ('order') এবং তা পরমার্থ সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন করে (—*Varities of Religious Experience*, p. 53)। অধ্যাপক কেয়ার্ড বলেছেন ধর্ম মানব ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলনসাধনের উন্নত রূপ : 'the elevation of the human spirit into union with the Divine" (—*Philosophy of Religion*, p, 159)। মার্ক্সীয় মতবাদের মতে ধর্ম আফিমের আলেয়া অথবা ফ্রয়েডীয় আত্মসম্মোহনকারী অন্ধ আত্মপ্রতারক ("a pleasing self-hypnotism and an unconscious self-decepton")। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন ধর্ম আত্মানুভূতির এক রূপ ও নাম। তিনি বলেছেন : "The religion of religions is our knoweldge and realization and love" (—*True Psychology*, p, 192)। তাঁর *Spiritual Unfoldment*-গ্রন্থে (পৃঃ ৫-৬) ধর্মকে তিনি

বের্গসোঁর (Prof. Bargson) মতো দু'ভাগে ভাগ করেছেন: (১) সার (essential) ও (২) অসার (non-essential) অংশ। বের্গসোঁর বিভাগ (১) স্থির (static) ও (২) চলমান (dynamic)। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "The essential of religion are principally two: Self-knowledge and Self-control,"—অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান লাভই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য এবং ধর্ম আত্মজ্ঞানের স্বরূপ: "By religion, I do not mean any particular doctrines, dogmas, beliefs or faiths, but I mean the realization in our daily life, in each cast of the worship of the supreme Being, which is the ideal of our religion" (—*Lectures in India*, p. 119)। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "Religion is Realization,"—ধর্ম মানে আত্মানুভূতি। তাছাড়া তিনি বলেছেন ব্রহ্মা থেকে সামান্য একটি দুর্বা পর্যন্ত সমস্তই যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। তাই আমাদের কর্তব্য সকলকে সেই পূর্ণতালাভের পথে সাহায্য করা। এই সাহায্য করার নাম 'ধর্ম'—• • "all beings from Brahman down to a clump of grass will attain to liberation in life in course of time, and our duty lies in helping all to reach that state. This help is called religion—the rest is irreligion" (—*Complete Works of S. V.*, Vol. VI, 1930, pp. 275-276)। গ্রীক দার্শনিকদের ধর্ম ছিল—"Know Thyself", উপনিষদে একে বলা হয়েছে: "আত্মানং বিদ্ধি" বা "আত্মানং বৈ বিজানথ"। ভারতীয় দর্শন ধর্মকে অনুভূতির সঙ্গে এক বলেছে, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি ও ধর্ম এক।

স্বামী অভেদানন্দ *Vedānta Philosophy* (1959)-গ্রন্থে সাবলীলভাবে ধর্মসম্বন্ধে বলেছেন: "That which teaches us what we are, who we are, what we were before, what we shall be in the future, and what our relation is to the universe and to that supreme Being, which is Absolute and external, is called religion" (p. 39), —অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের স্বরূপ কি, পূর্বে আমাদের

কি স্বরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতেই বা আমাদের স্বরূপসত্তা কি, তাছাড়া বিশ্ব সংসার ও শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের আসল সম্পর্ক কতটুকু এই পরিচয় যে বস্তু বা প্রণালী দেয় তাই ধর্ম। ধর্মের অর্থ এ' নয় যে আমরা মন্দিরে, গির্জায় বা মসজিদে যাই কিনা বা আচারবিচার ও ব্রতাদি উদ্‌যাপন করি কিনা। এ' সকল ধর্মের বহিরঙ্গ।

৩২। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Seif-knowledge*, পৃ: ১১৭-১১৮ দ্রষ্টব্য।

৩৩। চিত্তশুদ্ধি অর্থে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হওয়া। পতঞ্জলি একে বৃত্তি-নিরোধ ও স্থিতি বলেছেন। এখানে চিত্ত বলতে 'মন'। সংকল্প ও বিকল্প মনের বৃত্তি বা বিকৃতি। সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তি-দুটির নাশ হোলে মন স্বরূপে স্থিত হয় অর্থে মন শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধ মন ব্রহ্মের স্বরূপ, কেননা এই শুদ্ধ মন-আদর্শে ব্রহ্মের রূপ প্রতিফলিত হয়।

৩৪। 'তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে'।—কথামৃত (১৪শ সং) ১ম ভাগ, পৃ: ১৬৭ দ্রষ্টব্য।

৩৫। গীতা ২।১৯,

৩৬। কঠ উপনিষৎ ১।২।৬,

৩৭। কঠ উপনিষৎ ১।২।২২

৩৮। কঠ ১।২।২৩

৩৯। ঈশোপনিষৎ ১৫,

৪০। ঈশোপনিষৎ ১৬

৪১। অভেদানন্দ মহারাজ *Path of Realization* (1939)-গ্রন্থে (পৃ: ১৩৯—১৪৫) যথার্থ প্রার্থনার রূপ কি সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করছেন।

৪২। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে 'বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৩। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়সম্বন্ধে এ'রকম কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন: "Another point, it was no new truth that Rāmakrishna Paramahansa came to preach, though his adevent brought the old truths to light. In other words, he was the embodiment of all the past religious thought of India. His life alone made me understand what the Shāstras

really meant."—Vide *Complete Work of Swāmi Vivekānanda*, Vol. VI, p. 276)।

৪৪। ব্রহ্মসূত্রে (২।১।৩২) বলা হয়েছে: "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ"। আচার্য শংকর ২।১।৩৩ সূত্রের ভাষ্যে সৃষ্টিসম্বন্ধে বলেছেন: "কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি, যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সংভবন্তি এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি"। সুতরাং সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা।

৪৫। ডঃ সুশীলকুমার দে *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal* (1942)-গ্রন্থে (পৃঃ ১৯০-১৯১) অবতার-সম্বন্ধে প্রধানত আট রকম বৈষ্ণব মতের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "* * we can summarise the theory of Avatāra propounded by the Bengal school of Vaisnavism thus (i) The supreme being, though, one, can manifest in various froms, * * *. (ii) The Avatāra is real and not illusory, * *"। বৈষ্ণবাচার্য জীব-গোস্বামী এই অবতারের আবার 'অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব' ও 'অপ্রাকৃতত্ব' এই দু'রকম গুণের উল্লেখ করেছেন।

৪৬। ডঃ রাধাকৃষণ অবতারবাদসম্বন্ধে বলেছেন। "The theory of Avatāras bring to mankind a new spiritual meassage. * * * An Avatāra is a descent of God into man, and not and ascent of man into God. * * yet an Avatāra genearally means a God how limits Himself for some purpose on earth and possesses even in His limited from the fulness of knowledge" (—vide *Indian Phoilosophy*, vol. p. 545)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতারত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "তিনি (ভগবান) মানুষ হোয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়" (—কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৮২)। অবতারকে তিনি ঈশ্বর-কোটীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবতারেরা ও তাঁর লীলাসঙ্গীরা 'বাউলের

দল'। আবার "সচ্চিদানন্দ বৃক্ষের থলো থলো রাম, থলো থলো কৃষ্ণ" ব'লে অবতারেরা যে অসংখ্য এবং অনেক রূপ ধ'রে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসমুদ্র থেকে যুগে যুগে আবির্ভূত হন একথারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন: "এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য পরিভ্রমণ"। রাজা এ'যুগে তিনি নিজে এবং তাঁর রাজ্যরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। একেই বলে পূর্ণাবতার। দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে সভা আহ্বান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন যুগে নূতন রূপে নিরক্ষর বেশে অক্ষরব্রহ্মের পরিচয় দিতে এসেছিলে একথা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী অভিভাষণে বলেছেন। মানুষের বেশে অবতার আসেন একথা উপলব্ধি করা সহজ কথা নয়। দিব্যদৃষ্টি ও শুদ্ধচিত্ত না হোলে অবতারতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেও কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ"। স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ অন্তরঙ্গপার্ষদগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই ঈশ্বরের অবতাররূপে উপলব্ধি ও গ্রহণ করেছিলেন।

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ সমন্বয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি যখন সমাজে কোন ভাববিপ্লব ও গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই কোন-না-কোন মহামানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হন মুক্তিপথের আলোকবর্তিকা নিয়ে। তাঁদের বলা হয় ঈশ্বরাবতার, অবতারকল্পপুরুষ, ঈশদূত, ধর্মপ্রবক্তা, মহামানব, লোকনায়ক, সত্যদ্রষ্টা প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতকে বাঙলার একটি নগণ্য গ্রামে এ'রকম একজন লোকনায়কের শুভাবির্ভাব ঘটেছিল। পরবর্তী জীবনে পূজিত হয়েছিলেন তিনি শুধু বাঙলায় নয়, শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির বরেণ্যরূপে। নানান দেশের নানান মনীষী এই লোকনায়কদের আগমনের নিগূঢ় কারণ নির্ণয় করেন নানাভাবে। তবে অবিসংবাদিত সত্য যে, মানবোত্তীর্ণ গুণে ও ঐশ্বর্যে ভূষিত বা ঈশ্বরাবতাররূপে পরিগণিত হোলেও তাঁরা পৃথিবীতে আসেন পৃথিবীবাসীর মতো দেহধারণ ক'রে। মানুষের মতো কাটে তাঁদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য; মানুষের মতোই কঠোর তপশ্চর্যায় করেন তাঁরা অতিবাহিত, এবং অসামান্য নিষ্ঠা, কঠোর তপশ্চর্যা ও ঈশ্বরানুরাগ নিয়ে সিদ্ধিলাভ করেন সাধনসিদ্ধ মানুষের মতো।

ঊনবিংশ শতকের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অলৌকিক জীবনের কথাও তাই। সাধারণ মানুষের মতোই এসেছিলেন তিনি কামারপুকুর-গ্রামে। পিতা ছিলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতা চন্দ্রমণি দেবী। তাঁর ভাই-ভগ্নি, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ছিলেন এই নশ্বর পৃথিবীর লোক। তাঁর পার্থিব লীলা ও সকল প্রচেষ্টাই ছিল মানুষের মতো, আবার তাঁরই মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল অসাধারণত্বের সকল-কিছু ঐশ্বরীক ভাব ও ঐশ্বর্য, এবং তারি জন্য মানুষ হোলেও বিদগ্ধ দিব্যদর্শীরা তাঁকে বলেছেন ঈশ্বরাবতার, মহামানব ও লোকনায়ক। তাঁর মানুষী লীলার মধ্যেও তাই পাই আমরা দেবত্বের বিচিত্র নিদর্শন।

ডঃ অধরচন্দ্র দাস *A Modern Incarnation of God*-গ্রন্থে লিখেছেন : "But the conception of Incarnation is scarcely to be found in the principal Vedāntic texts, which teach that *Brahman*, the supreme Reality or Being, manifests itself or himself in the form of the universe, and that in the ultimate state of realization the aspirant sees that *Brahman* pervades the world. * * An Incarnation is after all a man, and apparently we do not perceive any clear difference between the two The former, like the latter; has a body, eats, drinks, and sleeps. The fact, however, remains that an Incarnation is a man with full divine consciousness, wisdom and power, remaining at the same time the Creator, Ordainer and Preserver of the universe. This is a mystery which no logic can penetrate"। লোকনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও তাই। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি কাশীপুরের বাগানে বলেছিলেন : "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়"। কথাও তাই যে, অবতারের সার্থকতা থাকে ভক্তির দিক থেকে, জ্ঞানবিচারের দিক থেকে নয়। অবতার ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ একথা পঞ্চরাত্রসংহিতা, পুরাণ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্র স্বীকার করে। মহাযান বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ প্রভৃতি প্রত্যেক-বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধেরই শক্তিবিশেষ ও অবতার। পঞ্চরাত্রসংহিতায় ব্যূহের প্রসঙ্গচ্ছলে সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে প্রকারান্তরে কৃষ্ণ-বাসুদেবের অবতার ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অসংখ্য অবতারের স্বীকৃতি আছে—যদিও শ্রীকৃষ্ণই সেখানে পূর্ণ-অবতার—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"। পুরাণগুলির কথাও তাই। গীতায় অবতারের রহস্যকথার উল্লেখ আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে দশাবতারের কাব্যমহিমময় বর্ণনা আছে। বৈষ্ণবপদাবলীসাহিত্যে অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তাঁর সঙ্গিনী। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারবিশ্বাসী ছিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্গোত্তর

বৈষ্ণব সাধক ও দার্শনিকেরা লীলাচ্ছলে ঈশ্বরের অবতরণ স্বীকার করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে গৌরদ্যুতিসম্পন্ন শ্রীরাধার অবতার ব'লে বর্ণনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অবতার স্বীকার করেছেন ভক্তির দিক থেকে। আচার্য শংকর "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" এই ২।১।৩৩ সূত্রে অবতারপ্রসঙ্গে বলেছেন: "* * কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি"। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন ইচ্ছার ইঙ্গিত ছাড়া স্বতঃপ্রবাহিত হয় তেমনি প্রয়োজন ছাড়া স্বভাবতই ("কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব") পরমেশ্বরের লীলামাধুর্যের প্রকট হয়। শংকর তাই বলেছেন: "তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলম্, অপরিমিতশক্তিত্বাৎ"। কিন্তু অপরিমিত হোলেও শক্তি স্বীকার করায় শক্তি বা মায়ার কার্য সৃষ্টি-অভিসন্ধিযুক্ত হোতে পারে ব'লে শংকর সিদ্ধান্তরূপে বলেছেন: "ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টি-শ্রুতিঃ"। সৃষ্টি অবিদ্যা বা মায়ার কার্য, কিন্তু পরমেশ্বর মায়াধীশ ও মায়ার অতীত, সুতরাং তাঁর পক্ষে অবতরণকার্যের কোন সার্থকতা নাই এবং তারি জন্য শংকর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অবতারবাদের ঠিক ঠিক আলোচনা করেন নি বা অবতারবাদ প্রতিপাদন করাবও চেষ্টা করেন নি। তবে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহোলে ২।১।৩৩ সূত্রের অবতারণাই বা কেন, তার উত্তরে শংকর বলেছেন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন করার জন্য সূত্রের অবতারণা, অবতারবাদ প্রমাণ করাব জন্য নয়। পূর্বেই বলেছি অদ্বৈত বেদান্তের দিক থেকে তাই অবতরণ বা অবতারবাদের কোন সার্থকতা পাওয়া যায় না। সৃষ্টি পারমার্থিকভাবে সত্য হোলে তবেই সৃষ্টির প্রজা হিসাবে স্রষ্টা ঈশ্বরের দিব্যাবতরণ সম্ভব, আর সৃষ্টিই যদি অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা ও তুচ্ছ হয় তবে ঈশ্বরেব অবিদ্যার সংসারে আবির্ভাব এবং লীলা করারও কোন সার্থকতা থাকে না। তবে গীতার ভাষ্যোপক্রমণিকায় শংকর আবার 'জাত ইব' ব'লে অবতারবাদ তথা ঈশ্বরের স্রষ্টারূপে অবতরণ যেন স্বীকার করেছেন— যদিও সে অবতরণ মায়িক। তিনি বলেছেন: "স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য স্থিতিং চিকীর্ষুঃ * * স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত

ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে"। শুধু তাই নয় "দেবক্যাং বসুদেবা-দংশেন কিল সম্বভূব" একথাও বলেছেন। এখানে শংকরের বক্তব্য হোল স্রষ্টা বা অবতাররূপে আবির্ভূত হন বা অবতরণ করেন সগুণব্রহ্ম নিজ মূলপ্রকৃতি তথা মূল-অজ্ঞানকে বশীভূত ক'রে। তাহোলেও অবতারবাদ এখানে স্বীকৃত হয়েছে—যদিও আবিদ্যক। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্যেরা যথার্থত অবতারের সার্থকতা স্বীকার করেন বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈত দৃষ্টি অনুসারে। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এবং রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি কেউই বিশ্বপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেন নি, বলেছেন ঈশ্বরের লীলাবিলাস এবং লীলার জন্যই ঈশ্বর স্বয়ং অথবা অংশত আবির্ভূত হন। গীতার ভাষ্যে শংকর সেকথা স্বীকার করেছেন—যদিও অবতরণ করেন ঈশ্বর তথা সগুণব্রহ্ম। শংকরের মতে নির্গুণ ব্রহ্মের বিকার-বিচ্যুতি নাই, সুতরাং অবতরণও নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতাররহস্য স্বীকার করেছেন ও বলেছেন 'খোলো খোলো রাম, খোলো খোলো কৃষ্ণ",—অসংখ্য অবতার এক ইশ্বর থেকেই রূপ পরিগ্রহ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও দর্শনচিন্তার অর্থ এবং সার্থকতা তাই এদিক থেকে নির্ধারণ করা উচিত। কোন অবতার, অবতারকল্প পুরুষ বা মহামানব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর অনুভূতিদীপ্ত জীবনের ঘটনায় ও আদর্শে কিছু-না-কিছু নূতনতা ও স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই থাকে এবং তাঁর বাণী ও কর্মপ্রচেষ্টায় একটি সার্থক ইঙ্গিতও বেশ লক্ষ্য করা যায়। সে প্রচেষ্টা, বাণী ও আদর্শের সঙ্গে হয়তো পূর্ব-পূর্ব মহামনীষীদের জীবনধারারও কতকটা মিল থাকা সম্ভব, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট দেখা যায়। সেগুলোকেই আমরা বলি স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর, কৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, শংকর, চৈতন্য এঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবধারা ও আদর্শ স্থাপন ক'রে নূতন নূতন মুক্তি ও কর্মপথের সন্ধান দিয়েছেন। উনবিংশ শতকে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও সে'যুগে আগমন করলেন একে একে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি। এক কথায় সে যুগকে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্যসাধারণ তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করলেন এবং সে তপশ্চর্যার মধ্যে থাকলো নূতনতার রূপ ও

অভিনবতার বৈশিষ্ট্য। তিনি নিরক্ষরের বেশে আগমন করলেন ও পরিচয় দিলেন অক্ষরব্রহ্মের। গ্রাম্য ভাষায় দিলেন উপদেশ, কিন্তু অভিজাত বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে থাকলো তার অসামান্য সাদৃশ্য ও সঙ্গতি। কিন্তু তাই ব'লে কেবল এই ঐশ্বর্যের নিদর্শনই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে সাধনার শ্রেষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রমাণ করবে না। আবার যখনি কোন ধর্মসঙ্ঘের সৃষ্টি হয় কোন মহানবের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে তখনি সেই কেন্দ্রাধিপতির আদর্শ, সাধনা ও অনুভূতিকে অনুসরণ করেই নিয়মিত হয় সংঘের জীবন ও গতি। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে যখন রচিত হোল শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মপন্থীদের উচিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপথ, ধর্ম ও আদর্শের নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত একটি রূপকে খুঁজে বার করা, কেননা তাঁরই উপর প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘজীবনেব ভিত্তি এবং তাঁরই উপর গড়ে উঠবে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনচিন্তার গতি ও প্রকৃতি। অসাম্প্রদায়িক নীতি ও আদর্শ সংঘের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তার নির্দিষ্ট একটি রূপের ধারণা সে সংঘের পিছনে থাকা উচিত, কেননা তাকে নিয়েই গড়ে উঠবে স্বতন্ত্র একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক সংঘ নূতন দৃষ্টিভঙ্গির মাধুর্য নিয়ে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তন্ত্রের—কি ভক্তির—কি যোগের —কি জ্ঞানের পথচারী, তিনি ছিলেন অদ্বৈত বেদান্তেব—কি দ্বৈত বা শাক্ত্যাদ্বৈত মতের অনুসারী এ'সবের নির্ধারণ করা শ্রীরামকৃষ্ণধর্মাবলম্বীদেরই উচিত এবং তাঁরাই নির্দিষ্ট করবেন শ্রীবামকৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের ও দর্শনচিন্তার একটি সুপরিকল্পিত নীতি ও ধারা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম, সাধনা ও দর্শনচিন্তাব নিশ্চয়ই একটি স্বতন্ত্র রূপ, গতি ও প্রকৃতি আছে একথা বিদগ্ধ চিন্তাশীলমাত্রেই স্বীকার করেন। অদ্বৈত বেদান্ত ও যোগের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বোঝা যায় অদ্বৈত বেদান্তের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাধনায় যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অনুভূতি হয়, পতঞ্জলি-নির্দিষ্ট নির্বিকল্পসমাধিতে ঠিক সেই একই উপলব্ধির সন্ধান দেয় না। তাই অদ্বৈত বেদান্তসাধনার সঙ্গে পতঞ্জলির যোগসাধনার কোন নিবিড় সম্পর্ক আছে কিনা এটি বিশ্লেষণ বিশেষ করার জিনিস। তারপর একথাও সত্য যে, শংকর নিজে অদ্বৈতসাধনার আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের ধারা। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ব্যাসের এই ১ম সূত্রের (১।১।১) প্রসঙ্গে তিনি

বলেছেন: "* * শমদমাদিসাধনসংপৎ, মুমুক্ষুত্বং চ"। বাচস্পতি-মিশ্র ভামতীটীকায় এর অনুসরণ ক'রে বলেছেন: 'তস্মাচ্ছান্তো দান্ত' প্রভৃতি। এর স্বপক্ষে শ্রুতিপ্রমাণও দিয়েছেন তিনি যথেষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগমার্গ শংকরের মতে 'সংপৎ' ও বাচস্পতির মতে 'প্রকর্ষ'। পঞ্চপাদিকায় পদ্মপাদ বলেছেন: "ততো মুমুক্ষুত্বং তৎসাধনশমদমোপরম-তিতিক্ষা-সমাধানসম্পন্ন ভূত্বা যাবন্নাস্যতে তাবদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং কঃ প্রতিপদ্যতে?" সুতরাং শংকর থেকে আরম্ভ ক'রে পদ্মপাদ পর্যন্ত সকলের কাছে যোগমার্গের আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অঙ্গ বা উপায় হিসাবে, কেননা যথার্থ সাধন-সম্পত্তিবান যাঁরা তাঁরাই ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ব্রহ্মানুভূতিলাভের জন্য। নব্যবেদান্তীরাও এ' মতের পথচারী। কিন্তু একথাও আবার সত্য যে, শংকর "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৩ সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্টভাষায় সাংখ্যবাদী ও যোগীদের দ্বৈতবাদী ব'লে কটাক্ষ করেছেন: "দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ"। মোটকথা শংকরের মতে অদ্বৈত-বেদান্তসাধনার উপায়রূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে যে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, সাংখ্য ও যোগমার্গে ঠিক সে ধরনের হয় না, সেজন্য তিনি তাদের আত্মার একত্বদর্শী বলতে অনিচ্ছুক। শংকর আরো বলেছেন: "এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যেত্যতিদি-শতি", অর্থাৎ সাংখ্যমত খণ্ডন করার সঙ্গে সঙ্গে যোগমতও খণ্ডিত হোল, কেননা তত্ত্বজ্ঞান বা একত্ববিজ্ঞান একমাত্র বেদান্তবাক্যের বিচারেই সম্ভব, সাংখ্য বা যোগের পক্ষে নয়। তিনি পুনরায় স্পষ্টভাবে বলেছেন: "তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি—'ন্যবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্', 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছিল যোগমার্গনির্দিষ্ট নির্বিকল্প সমাধিতে কিংবা অদ্বৈত বেদান্তনির্দেশিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন-প্রণালীর সাহায্যে কিংবা অপর কোন সাধনায় সূক্ষ্মদর্শীদের তা' অনুধাবনের বিষয়। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির গতি ও প্রকৃতি দেখেই তা' নির্ধারণ করতে হবে সুনিশ্চিতভাবে। অনুভূতির সহায়ক যোগ ও বেদান্তের মধ্যেও বিচারশৈলী এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন যোগমার্গে একাত্মানুভূতি না হোলেও সমাধির প্রশ্ন ও মীমাংসা-সম্বন্ধে বেদান্ত নিজেকে

মতবিরোধ থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত করতে পারে নি। বেদান্তের আলোচনায় সদানন্দ-যতি পতঞ্জলিনির্দিষ্ট সমাধির উপযোগিতা ও বিভাগ মেনে নিয়েছেন, আবার বিজ্ঞান-ভিক্ষু, নৃসিংহ সরস্বতী ও অন্যান্য নব্যবেদান্তীরা সমাধির প্রশ্নকে গ্রহণ করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, পতঞ্জলির বিভাগপদ্ধতির সঙ্গে একমত হোতে পারেন নি। সদানন্দ-যতির মতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দু'রকম। বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাদের ছ'রকমভাবে ভাগ করেছেন: সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার, সানন্দ ও সাস্মিতা। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গৃহীত তিন রকমভাবে বিভক্ত। অথচ সদানন্দ-যতি তা' স্বীকার করেন নি। পুনরায় নৃসিংহ সরস্বতী সবিকল্প সমাধিকে দুটি স্তরে ভাগ করেছেন: (১) প্রথমটিতে থাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-জ্ঞান এবং মনের বৃত্তি এবং ব্রহ্ম হন সেই বৃত্তির বিষয়, আর (২) দ্বিতীয়টিতে থাকে বৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান অবিচ্ছিন্নভাবে তৈলধারার মতো। নির্বিকল্প সমাধিও আবার দু'রকম: (১) প্রথমটিতে থাকে বৃত্তিযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কোন প্রকাশ থাকে না, আর (২) দ্বিতীয়টিতে থাকে ব্রহ্মজ্ঞান বৃত্তিহীন ও পরিশুদ্ধভাবে, আর জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় তো পরের কথা, কোন বৃত্তির সূক্ষ্মসংস্কারও থাকে না, থাকে মাত্র সত্তারূপ জ্ঞান ও আনন্দ এবং একেই তিনি বলেছেন শ্রেষ্ঠ সমাধি। সুতরাং সমাধির স্বরূপনির্ধারণ-ব্যাপারেও বিচার ও বিতর্কের অন্ত নাই।

কিন্তু প্রাচীন ও নব্যবেদান্তীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তথা বিচার-অনুশীলনে অষ্টাঙ্গযোগ ও বিশেষভাবে সমাধির আলোচনা স্থান পেলেও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকেই তাঁরা আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলেছেন। আচার্য শংকর সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: "তত্ত্বজ্ঞানঃ তু বেদান্তেবাক্যেভ্য এব ভবতি",—অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থচিন্তা ও তার সঠিক বিচার থেকেই ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। মহাবাক্যের শ্রবণ, বিশ্লেষণ ও চিন্তা এবং পরে তার নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারা তথা ধ্যান এটাই বেদান্তনির্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ বা উপায়। এখন মহাবাক্য কি? তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি মহাবাক্য। তৎ ত্বম্,—সঃ অহং,—ব্রহ্ম ও জীবের পরিশুদ্ধি তথা অভেদপ্রতিপাদই মহাবাক্যের সার্থকতা। তৎ—ব্রহ্ম এবং ত্বম্—জীব+জগৎ এই দুয়ের

মধ্যে কোন ভেদ নাই—এই প্রত্যভিজ্ঞান লাভই মানুষের পরম প্রেয় ও শ্রেয়। শংকরমতাবলম্বীরা শংকরের এই আদর্শকে স্বীকার করেছেন তাতে আর সন্দেহ নাই। পদ্মপাদ ও বিবরণমতাবলম্বীরা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন স্বীকার করলেও বিচাররূপ শ্রবণের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। 'শ্রবণ' অর্থে এখানে মহাবাক্যের বিচার, সুতরাং ব্যুত্থানের কোন প্রশ্ন বা প্রয়োজন থাকে না—যদিও গীতা ও অন্যান্য ভাষ্যে আচার্য শংকর 'ব্যুৎথান'-শব্দ প্রয়োগ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আবার সমাধি ও সমাধি থেকে নেমে আসার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্ত-শিষ্যদের কাছে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই সকল রকম বিষয়ের আলোচনাও করেছেন, শুধুই যোগের প্রসঙ্গ নয়। অধ্যাত্মসাধনার গোড়ার দিকে তিনি তন্ত্রসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আবার যোগসাধনের প্রসঙ্গে বলেছেন আজ্ঞাচক্রের উপর মন উঠে সহস্রারে লীন হয় (স্বামী সারদানন্দ-লিখিত "শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ")। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ সকল রকম সাধনার কথাই বলেছেন, কেননা সকল রকম সাধনার অনুষ্ঠানই তিনি ব্যক্তিগতভাবে করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসাধনায় চরমপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদাহরণও দিয়েছেন সহজ সরলভাবে ('লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' দ্রষ্টব্য)। তিনি এদের বলেছেন দুধের (দুগ্ধের) কথা যে শুনেছে সে অজ্ঞানী, দুধ যে দেখেছে সে প্রসঙ্গে জ্ঞানী ও দুধ যে খেয়েছে সে বিজ্ঞানী। এখানে শোনা, দেখা ও খাওয়ার মধ্যে ভেদ আছে সত্য, কিন্তু দুধবস্তুটির মধ্যে কোন ভেদ নাই। আবার ছাদ ও সিড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে চুণ-সুরকী দিয়ে সিঁড়ি তৈরী, সেই উপকরণ দিয়েই আবার ছাদ তৈরী হয়, সুতরাং সিঁড়ির চেয়ে ছাদের উচ্চতা বেশী হোলেও উভয়ের উপকরণ তথা মালমসলা চুণ-সুরকী। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে উচ্চতার বিচার করেছেন—কি উপাদান বা উপকরণের অভিন্নতার কথা আলোচনা করেছেন তা' সূক্ষ্মদর্শী বিদগ্ধ বিচারীর ভেবে দেখার বিষয়। মনে হয়, সিঁড়ি ও ছাদের প্রসঙ্গে উচ্চ-নীচের পরিমাপ গৌণ, তাদের উপকরণ ও আসল বস্তুসত্তার অভিন্নতাপ্রতিপাদন করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য,—যেমন জীব ও ব্রহ্মের উচ্চতা-নীচতার পরিমাপ বা নির্ণয় গৌণ, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাপ্রতিপাদনই

মুখ্য। সুতরাং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে মুখ্যত পার্থক্য কোথায়! আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ব'লে মনে হোলেও তারা স্বরূপত এক ও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞানকে কখনও বিজ্ঞানের চেয়ে নিম্নস্তরের, আবার কখনো উচ্চস্তরের ব'লে বর্ণনা করেছেন (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। আচার্য শংকর তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় জ্ঞানকে পারমার্থিক তথা ব্রহ্মজ্ঞান বলেছেন। আবার বিজ্ঞানের বেলায়ও তাই। সুতরাং মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুধ (দুগ্ধ) দেখা ও খাওয়ার কথা উল্লেখ করলেও আসলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভিন্নতাই প্রতিপাদন করেছেন চুণ-সুরকীর চাক্ষুষ নিদর্শন দিয়ে। বেদান্তে বলা হয়েছে মহাবাক্যের বিচারে সিদ্ধ বা পরিপক্ক হোলে প্রথমে ব্যষ্টিজ্ঞান হিসাবে সাধক "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধ (জ্ঞান) ও সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিভাবে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সর্বাত্মক ভাব বা জ্ঞান উপলব্ধি করেন, এ' দু'টি উপলব্ধির মধ্যে কোন কাল তথা সময়ভেদ থাকে না, কেননা তারা একই সঙ্গে (simultaneously) উপলব্ধির বিষয় হয়। শুধু ব্যষ্টির উপলব্ধিতে জ্ঞানের পরিপক্কতা ঘটে না, তার জন্য দরকার ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র জ্ঞান, আর এই একত্র জ্ঞান বা ব্যষ্টি-সমষ্টির সর্বাত্মক জ্ঞানকেই ঠিক ঠিক ব্রহ্মোপলব্ধি বলা যায়। তত্ত্বম্-পরিশুদ্ধির এটি মর্মকথাও বলা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান মানুষের জীবদ্দশায়ই লাভ হয়—কি শরীরপাতের (মৃত্যুর) পর সার্থক হয় এ'নিয়েও বেদান্তীদের ভিতর বাদানুবাদ যথেষ্ট। আচার্য শংকর জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন। জীবন্মুক্তির অর্থ শরীর থাকার সময়ই বেদান্তবাক্যবিচারের পর জ্ঞানলাভ করা। ব্যাসের "তত্তু সমন্বয়াৎ" ১।১।৪ সূত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে শংকর পূর্ব ও উত্তর পক্ষের প্রমাণ দেখিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন শরীর অবিদ্যাপ্রসূত হোলেও শরীর থাকাকালেই সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন: "ন সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। * * তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য সিদ্ধং জীবতোঽপি বিদুষোঽ-শরীরত্বম্। * * 'সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সবাগবাগিব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব' ইতি চ (শ্রুতি)। * * তস্মান্নাব-গতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বম্"। শংকর শ্রুতিপ্রমাণও দিয়েছেন

তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য। তাছাড়া ঔপনিষদিক সত্য সর্বকালে সিদ্ধ ও সত্য। এ' থেকে প্রমাণ হয় অবিদ্যাজাত হোলেও শরীর থাকাকালে ব্রহ্মবিজ্ঞান হোতে বাধা নাই ও তখন শরীর অশরীর অর্থাৎ শরীর থাকা না-থাকার মধ্যে গণ্য হয়। জ্ঞানীর ব্রহ্মদৃষ্টি হোলে তাই অজ্ঞানদৃষ্টি থাকতে পারে না। মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে যেখানে প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোচনা করেছেন, লঘুচন্দ্রিকাকার বিঠ্‌ঠলেশ সেখানে সুধা ও কলসের নিদর্শন দিয়ে বলেছেন: "* * ঘটাদৌ অন্তর্বহির্বিলিপ্যমানসুধাদিবদিতি তত্র স্বাকারসাঁদৃশাকারত্বং তয়োঃ সংবন্ধো ভবতি"। সাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের মতো অসাধারণ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃতিও সমান। জ্ঞানদৃষ্টিতে বাহ্য ও আন্তর—পার্থিব ও অপার্থিব সকলই ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্রে একাকার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন 'বান এলে সকল নদীর জল একাকার হয়'। অদ্বৈতসিদ্ধির মুখবন্ধে গৌড়ব্রহ্মানন্দীটীকায় ও অন্যত্র জীবন্মুক্তিপ্রসঙ্গে যথেষ্ট বিচার করা হয়েছে। মোটকথা শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্রহ্মবিজ্ঞানী ছিলেন এ'সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈত নাই, তবে যোগের, বেদান্তের, তন্ত্রের বা অপর কোন্‌টি সাধনায় তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেটাই বিচারের বিষয়। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী ছিলেন ব'লে বাহ্যজগৎ তাঁর কাছে চৈতন্যময়ী কালীর অপার্থিব লীলাবিলাস-রূপে অনুভূত হোত, কিন্তু এই অনুভূতিলাভের জন্য উত্থান বা ব্যুত্থানের কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করা সমীচীন নয়। তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার-ব্যবহার হয় ব'লে সম্ভবত রূপকভাবে ব্যুত্থান স্বীকার করা হয়।

জীবন্মুক্তি যাঁরা স্বীকার করেন না তাদের অভিমত স্বতন্ত্র। মণ্ডনমিশ্র 'ব্রহ্ম-সিদ্ধি'-গ্রন্থে বিদেহমুক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে জীবন্মুক্তি মুক্তির একটি অবস্থাবিশেষ: "সা চেয়মবস্থা জীবন্মুক্তিরিতি উচ্যতে"। মণ্ডন-মিশ্রের সিদ্ধান্তে জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কার্য ও অজ্ঞান সমূলে ভস্ম বা ধ্বংস করে এবং এর প্রসঙ্গে যুক্তি হোল শরীর যখন অজ্ঞানের কার্য তখন দেহ থাকাকালে মুক্তি হয় না, চরমজ্ঞানের জন্য দেহপাত প্রয়োজন: 'দেহপাতপ্রতীক্ষা তু তত্র নান্তরীয়কত্বাত্তবত্যেব" (—ব্রহ্মসিদ্ধি, পৃঃ ১২৯-১৩০ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শংকরানুসারীরা দেহ থাকার জন্য অজ্ঞানকে 'অজ্ঞানলেশ' বলেছেন। তাঁরা বলেন দগ্ধরজ্জু অর্থাৎ পোড়া দড়ির যেমন কোন বন্ধনশক্তি থাকে না তেমনি

জ্ঞানলাভের পর অজ্ঞান তথা অজ্ঞানলেশ থাকলেও জ্ঞানের তাতে কোন হানি হয় না। তাই ব্রহ্মানুভূতির পর সিদ্ধসাধক ব্রহ্মদৃষ্টি নিয়ে অজ্ঞানের সংসারে থাকতে পারেন, তাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ হয় না,— যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সঙ্গে অজ্ঞানের কার্য জগতের বিরোধ থাকলেও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তুরীয় অবস্থার সঙ্গে তাদের কোনটারই কোন বিরোধ থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিমগ্ন থাকুন আর নাই থাকুন একবার জ্ঞানলাভের পর যখন তাঁর জ্ঞানের বিন্দুমাত্র হানি হয় না তখন ব্যুত্থান বা উত্থানের প্রশ্ন নিরর্থক এটি বিচারীর সিদ্ধান্ত। তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল সময় সকল অবস্থায় মায়ার পারে থাকেন আর আমরা যারা অজ্ঞানী তাদের মধ্যেই কেবল মায়ার পারে ও মায়ার ভিতর এই সীমারেখারূপ বিতণ্ডার প্রশ্ন থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছে ব্যুত্থান ও উত্থান দুইয়ের থাকা না-থাকার সমান। তাছাড়া তত্ত্বদৃষ্টির কাছে এ' ধরনের স্তরকল্পনারও কোন সার্থকতা নাই, যোগসাধনের বেলায় হয়তো এদের সার্থকতা থাকতে পারে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেছিলেন তার নির্দিষ্ট একটি উপায় ও রূপ অবশ্যই নির্ধারণ করা উচিত, কিন্তু তাই বোলে ব্যুত্থান কিংবা উত্থান নিয়ে জ্ঞানীর সময়ানুসারে সমাধিতে থাকা বা না-থাকার প্রশ্নকে বড় ক'রে দেখার কোন সার্থকতা নাই, কেননা সাকার-নিরাকার যেমন তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে সমান, ব্যষ্টি-সমষ্টি ও জ্ঞান-অজ্ঞানের প্রশ্নও তেমনি। আর যদিই বা ব্রহ্মানুভূতির পর ব্যুত্থান স্বীকার করা যায় তাহলেও পূর্ণজ্ঞানের তাতে কোন হানি হয় না। উত্থানের বেলায়ও তাই। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *True Psychology*-গ্রন্থে লিখেছেন: "And truly speaking, there is no longer any going beyond the Absolute, or going down or coming back (*vyutthnāna*) from the Absolute by one who has realized it"। তারি জন্য তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে স্থূলদেহ নিয়ে অজ্ঞানের রাজ্য পৃথিবীতে থাকা যেমন mystry বা রহস্যময় নয় তেমনি deeper mystry বা পরমরহস্যময়ও নয়, বরং রহস্যাতীত অবস্থায় স্থিত হোয়ে তত্ত্বজ্ঞানী একই সঙ্গে পার্থিব ও অপার্থিব এই উভয় আনন্দের সমরসে আপ্লুত থাকেন এবং তাতে অজ্ঞানের জগতে পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিকাশও তাঁর অটুট থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সত্যই অপূর্ব ও আরো অপূর্ব তাঁর অনুভূতিদীপ্ত উদার আদর্শ ও সার্বভৌমিক দৃষ্টি। এখন জিজ্ঞাস্য যে, নবযুগনায়ক হিসাবে তাঁর ধর্মমত ও সাধনদৃষ্টির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা। মনে হয় তাঁর ধর্মমত ও সাধনধারার মধ্যে পূর্ব পূর্ব অবতার ও অবতারকল্প মহামানবদের মত ও পথের অনুস্যূতি থাকলেও তারা স্বতন্ত্রসত্তার প্রতিষ্ঠিত ও স্বমহিমায় মহিমান্বিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্যসাধারণ যোগিনী ভৈরবী যোগেশ্বরীর কাছে তন্ত্রের বিভিন্ন আম্নায় ও সাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তন্ত্রসাধনসঞ্জাত শাক্ত্যাদ্বৈত অনুভূতির সঙ্গে যোগসূত্র রেখে পুনরায় সাধনা করেছিলেন সুফীমতে, বৈষ্ণবমতে, বেদান্তমতে এবং আরো কত কি মতে, অথচ পরবর্তী সকল সাধনা ও সাধনতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর তন্ত্রসাধনার ছিল পূর্ণসঙ্গতি—যে সঙ্গতির মহিমময় রূপ আর কোন অবতার ও মহাপুরুষদের জীবনসাধনায় লক্ষ্য করা যায় না।

তন্ত্রসাহিত্য ও তন্ত্রসাধনার রূপও ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রধানত তিন রকমভাবে: বাংলার তন্ত্র তথা বেঙ্গল স্কুল অব তন্ত্র, কাশ্মীরীয় তন্ত্র বা কাশ্মীর স্কুল অব ত্রিক-সিস্টেম এবং দক্ষিণ-ভারতীয় তন্ত্র। বাংলার তন্ত্র অনুষ্ঠান ও আচারমূলক। বাংলার তন্ত্রে আচার সাত রকম: বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। কুলার্ণবতন্ত্রে এ'সাতটি আচারের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
> বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
> দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
> সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

স্বামী বিবেকানন্দ বামাচারের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু দক্ষিণা অথবা সিদ্ধান্ত বা কৌলাচারের নিন্দা করেন নি। মহানির্বাণতন্ত্র পরবর্তীকালে রচিত এবং অদ্বৈত বেদান্তের অনেকটা সমপর্যায়ী। তন্ত্রের চরমতত্ত্ব শিব-শক্তির অবিনাভাব অখণ্ড সত্তার প্রতিষ্ঠা ও অনুভূতি, এজন্য তন্ত্র শাক্ত্যাদ্বৈত তথা শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপাদন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ কৌলাচারমার্গে

সাধন ক'রে শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করেছিলেন এবং এ' সাধনায় উত্তরসাধিকা ছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী নিজে।

কাশ্মীরীয় ত্রিকতত্ত্বীয় তন্ত্র দর্শন তথা তত্ত্ববিচারমূলক এবং দক্ষিণ-ভারতীয় তন্ত্র উভয়ের সমান্বিত রূপ ও সাধনাত্মক। তিব্বতে এবং বৃহত্তর ভারতের দেশ-গুলিতেও তন্ত্রসাধনা বিস্তার ও সমাদর লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মেও তন্ত্রাচারের বিস্তার ঘটে। কোন কোন মনীষীর অভিমত বৌদ্ধতন্ত্রাচারই হিন্দুতন্ত্রাকারে রূপায়িত হয় পরে। কিন্তু এ'কথা অনেকে স্বীকার করেন না। বরং দেখা যায়, অনেকাংশে বৌদ্ধতন্ত্রাচার হিন্দুতন্ত্রসাধনার ঠিক বিপরীতমুখী। হিন্দুতন্ত্রে অনেক দেবদেবী যেখানে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন, বৌদ্ধতন্ত্রে তারা অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। হিন্দুতন্ত্রের বিনায়ক বা সিদ্ধিদাতা গণেশ বৌদ্ধতন্ত্রে বিঘ্নদায়ক ও দেবী অপরাজিতার পদতলে নিষ্পিষ্ট। তাই বহু মনীষীর অভিমত বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীরা ছদ্মবেশে বা রূপ-পরিবর্তন ক'রে হিন্দুতন্ত্রে আত্মপ্রকাশ করে নি, বরং হিন্দুতন্ত্রের পাদপীঠে ও আদর্শেই বৌদ্ধতন্ত্রবাদ গড়ে উঠেছিল। অবশ্য বিষয়টির সঠিক নির্ধারণে বাদানুবাদের অবসর যথেষ্ট। তবে একথা ঠিক যে, ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র মানুষকে উপাদান ও প্রেরণা দান করেছে যথেষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও তন্ত্রবিশ্বাস ও তন্ত্রসাধনার রূপ ছিল প্রদীপ্ত এবং পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের অনেকের জীবনেও সেই তন্ত্রসাধনার প্রবাহ ছিল ফল্গুধারার মতো অব্যাহত। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত ও দর্শন-আলোচনার ক্ষেত্রে অদ্বৈত বেদান্ত ও অন্যান্য সাধনধারার অনুশীলন করার সময় তন্ত্রসাধনার সঙ্গতিকেও মর্যাদা দান করা সমীচীন। বিশেষ ক'রে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে তন্ত্রাচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবাচারের বিকাশই অধিক এবং এমন কি বাংলাদেশে তন্ত্র বৈষ্ণবাচারকেও প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য এই তন্ত্রাচারের মধ্যে যোগ ও বেদান্তসাধনার ধারাও অনুপ্রবিষ্ট। তারি জন্য শ্রীরামকৃষ্ণনির্দিষ্ট সাধনধারা ও দর্শনচিন্তানির্ধারণের সময় অনুশীলনকারীদের অবহিত থাকা উচিত তাঁর সমন্বয়মুখী বিচিত্র সাধনশৈলীর দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও চিন্তা করা কর্তব্য তন্ত্র ও ভক্তির ক্ষেত্র বাংলাদেশ শুদ্ধ অদ্বৈতচিন্তা ও সাধনার

অনুকূল কতটুকু। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রামকৃষ্ণদেবের সাধনরহস্য তার মর্মানুশীলনে কথঞ্চিৎ সাহায্য করবে বলে মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা বিশ্বের ধর্মজগতে কোন সীমিত সম্প্রদায় সৃষ্টি না করলেও বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষমাত্রে স্বীকার করবেন যে, তাঁর সার্বভৌমিক উদার ধর্মদৃষ্টি ও সাধনা বিশ্বের সমাজে অসাম্প্রদায়িক একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছে—যার পাদপীঠে আসীন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে লিখেছেন: 'সাম্প্রদায়বিহীনো য সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি'। তারি জন্য মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মমতে পরমবিশ্বাসী হোয়ে সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও তাঁর সর্বমতনিষ্ণাত অথবা সর্বমতে অনুস্যূত ও ওতঃপ্রোতভাবে বিস্তৃত একটি নিজস্ব মতবিশ্বাস ও ধর্মচিন্তা নিশ্চয়ই ছিল এবং সেই মত ও চিন্তাকেই তিনি উদার 'যত মত তত পথ' নীতির ভিত্তিতে সর্বসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। তাঁর 'যত মত তত পথ' সার্বভৌমিক বাণী বা নীতির প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় ভাবা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন যুগে এই একই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল বিভিন্ন রীতি বা ভঙ্গীতে, সুতরাং বিভিন্ন যুগস্তরের সেই উদার বাণী বা নীতিগুলির ভাব, রূপ ও সার্থকতা ঠিক একই ধরনের ছিল কিনা তাও নির্ধারণ করা দরকার। ঋগ্বেদ-সংহিতায় পাই 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি", গীতায় পাই 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', মহিম্নঃস্তোত্রে আছে: 'বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং * * পয়সামর্নব ইব' প্রভৃতি। বিভিন্ন যুগস্তরের এই বিভিন্ন বাণীর অর্থ মনে হয় একই রকমের এবং সার্থকতাও তাই। সাধারণ দৃষ্টির লোকের কাছে এদের অর্থসামঞ্জস্য অনুভূত হোলেও বিচারীর কাছে প্রতিটি যুগস্তরের ঐ একই ধরনের বাণীর বা নীতির মধ্যে অর্থসার্থকতার ধারা একটু ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতীত। বাণী অথবা নীতি সাধনা বা সাধনদৃষ্টিরই পরিণতি, সুতরাং প্রতিটি যুগে জীবনলক্ষ্য এবং শ্রেয় এক হোলেও উপায় ও পথের ধারা একটু ভিন্ন ভিন্ন হোতে বাধ্য। তাই উনবিংশ-বিংশ শতকের যুগনায়ক শ্রীরাম-কৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' সার্বভৌমিক দৃষ্টি ও বাণীকে আমরা গ্রহণ করব তাঁর সাধনপ্রকৃতি ও রূপকে ঠিক ঠিকভাবে লক্ষ্য ক'রে, আর তারি জন্য বলি জীবনসাধনা ও ধর্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমন্বয়ী বাণী বা

নীতিকে যদি কেবলি অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে গ্রহণ করি তবে তা কতটুকু সমীচীন ও যুক্তিসিদ্ধ বিদগ্ধ বিচারীমাত্রে বিশেষভাবে বুঝে দেখবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধন-অবস্থায় অদ্বৈততত্ত্বেরও উপলব্ধি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তেমনি আবার একথাও সত্য যে, জ্ঞানলাভের পর তিনি জগজ্জননী শ্রীভবতারিণীকে মুহূর্তের জন্য জীবনে ভুলতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'জ্ঞানলাভের পর মা বল্লেন তুই ভাবমুখে থাক্'। সুতরাং একথা যেমন সত্য যে তিনি নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত নেঙটা তোতাপুরীর আদেশে ভবতারিণীর ভুবনমোহিনী রূপ জ্ঞানতরবারির সাহায্যে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করেছিলেন তেমনি আবার অদ্বৈত জ্ঞানলাভের পর ঐ ভুবনমোহিনী-রূপলাবণ্যময়ী শ্রীভবতারিণীকেই করেছিলেন জীবনের সহায় ও সম্বল, মায়া মরিচীকা ব'লে জগজ্জননীকে পরিত্যাগ করেন নি। সন্ন্যাস বা ত্যাগের বাহ্যিক নিদর্শনও ছিল না তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র, আর না ছিল গৈরিকবাস, রুদ্রাক্ষের মালা, দণ্ড কমণ্ডলু ও শিরে জটাভার। ব্রহ্মানন্দে ভরপুর হোয়েও তিনি বলতেন "কালী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—মহাকালসঙ্গিনী, তাঁর হাতেরই আমি যন্ত্র ও তিনি যন্ত্রী"। সুতরাং নবযুগের সাধকোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মানুভূতি ও সাধনার রূপ ছিল নিশ্চয়ই অন্যান্য ধর্মমত, ধর্মানুভূতি ও সাধনা থেকে একটু স্বতন্ত্র অথচ মহীয়ান ও সর্বসমন্বয়ী, কেবলি ভক্তি, যোগ, তন্ত্র কিংবা অদ্বৈত বেদান্তজ্ঞানের হুবহু নকল কিংবা প্রতিফলন নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে আমরা শুনেছি: "Sankara is now archaic. This is the age of Sri Rāmakrishna"। অথচ আচার্য শংকর ও তাঁর মতবাদের একান্ত অনুরাগী ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ।

তাই বিংশ শতকের পথযাত্রী হিসাবে অভিনন্দন জানাই আমরা তাঁদের —বর্তমান কালে অথবা ভবিষ্যতের বুকে অগ্রসর হবেন যাঁরা সর্বধর্মমতসমন্বয়ী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব ধর্মমত ও দর্শনদৃষ্টির অনুধাবন ও প্রতিপাদন করতে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে। উদার ধর্মমতই এ'যুগের আদর্শ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'গ্রেট সেভিয়ার্স অব দি ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে লিখেছেন: "In this cycle of reason and science, one

cannot remain sectarian, and hold dogmatic ideas and norrow views. This is the spirit of the age, and it needs such a manifestation as the embodiment of non-sectarianism, toleration and universal sympathy for all religions"। সত্যই এটি যুক্তি ও বিজ্ঞান অথবা বুদ্ধি ও বোধির যুগ, এ'যুগের ধর্ম ও দর্শনদৃষ্টি হবে সর্বসঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতারূপ দৈন্য ও দোষমুক্ত এবং পরমত ও পরমধর্মসহিষ্ণু তার আদর্শ। পরমতীর্থস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সকল যুগের সকল ধর্মনায়ক, অবতার ও মহামানবদের সত্যানুভূতির আদর্শ আমাদের সত্যানুসন্ধী মন ও বুদ্ধিকে পরিচালিত করুক বর্তমান যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ সাধনরূপ, দর্শনচিন্তা ও ধর্মকে নির্ধারণ করার জন্য, কেননা এই নির্ধারণই শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ এবং শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজনের প্রাণকেন্দ্রকে করবে সচল ও প্রদীপ্ত।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

'তীর্থরেণু'-গ্রন্থের পাদটীকা ও বিবরণীর আলোচনায় যে'সকল ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে একমাত্র তাদেরই নাম দেওয়া হোল :

1. Abhedānanda, Swāmi:
   (1) *Cosmic Evolution and Its Purpose.*
   (2) *Ideal of Education.*
   (3) *How to be a Yogi.*
   (4) *Doctrine of Karma.*
   (5) *Path of Realization.*
   (6) *Self-knowledge.*
   (7) *Spiritual Unfoldment.*
   (8) *True Psychology.*
   (9) *Yoga Psychology.*
   (10) *Great Saviours of the World.*
   (11) *Life Beyond Death.*
   (12) *God, Our Eternal Mother* (lecture).
   (13) *Way to the Blessed Life.*
   (14) *Leaves from my Diary,*
   (15) *Vedanta Philosophy.*
   (16) *Science of Psychic Phenomena.*
   (17) *Who is the Saviour of Souls.*
   (18) *Divine Heritage of Man.*
   (19) শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম।
2. Beadnell, *C. M.*: *Dictionary of Scientific Terms.*
3. Bradley, F. H : (1) *Appearance and Reality,* (1930).
   (2) *Truth and Reality,* (1940).
4. *Brahmasutra,* with the Commentary of Sankara, and with the *Tikās, Kalpataru* and *Parimala,* published by the Nirnayasāgara Press, Bombay.

5. Brett: *History of Psychology* (1953), abridged one volume, edited by R. S. Peters.

6. Caird, Edward: (1) *An Introduction to the Philosophy of Religion* (1936).
(2) *Evolution of Theology in Greek Philosophers*, vols. I ও II (1923).

7. Crowther, J. J.: *An Outline of the Universe*, vols. I ও II.

8. De., Dr. S. K.: *Early History of the Vaisanava Faith and Movement in Bengal* (1st edition)

9. Eddington, Sir A. N.: *Nature of the Physical World.*

10. Fichte, J. G.: *Doctrine of Religion.*

11. Hartmann, Prof.: *Philosophy of the Unconscious* (1950).

12. Hoffding, Prof. : *An Outline of Psychology* (1925).

13. Jeans, Sir G. J.: (1) *The Universe around Us* (1933).
(2) *The Stars in Their Courses.*
(3) *Mysterious Universe.*
(4) *Physics and Philosophy.*

14. Joad, Prof. G. M.: *Guide to Modern Philosophy.*

15. Jung, C. G.: (1) *Collected Papers on Analytical Psychology.*
(2) *Psychology of the Uuconscious* (1946).

16. Kant, Immanual: *Critique of Pure Reason,* translated into English by Max Muller.

17. Max Plank: (1) *Universe in the Light of Modern Physics.*
(2) *Where is Science Going.*

18. Otto, Dr. R.: *Naturalism and Religion.*

19. Paton, Prof. H. J.: *Kant's Metaphysic of Experience,* vols. I ও II (1936).

20. Pratt. Prof.: *The Religious Consciousness.*

21. Rādhākrishnan, Dr. S.: *Indian Philosophy,* vols. I ও II (1940).

22.. Sullivas, J. W. N.: (1) *Basis of Modern Science.*
(2) *Limitations of Science.*

23. Vivekānanda, Swāmi: *Complete Works of S. V.*, published by the Advaita Ashrama, Calcutta.

24. Whitehead, Prof., A. N.:
(1) *Science and the Modern World.*
(2) *Concept of Nature* (1930).

25. William James: *Varieties of Religious Experience.*

26. Woodroffe, Sir John: (1) *Sakti and Sakta.*
(2) *Garland of Letters.*
(3) *Serpent Power.*
(4) *World as Power.*

All are published by the Ganesh & Co., Madras.

২৭। সারদাতিলকতন্ত্র—পণ্ডিত রাঘবভট্টের টীকাসহিত।

২৮। প্রপঞ্চসারতন্ত্র—পদ্মপাদাচার্যকৃত টীকাসহিত।

২৯। কৌলাবলীতন্ত্র।

৩০। কুলার্ণবতন্ত্র।

৩১। স্বাতন্ত্রতন্ত্র।

৩২। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্।

৩৩। পাদুকাপঞ্চকম্।

৩৪। ললিতাসহস্রনাম—পণ্ডিত ভাস্কররায়ের টীকাসহিত।

৩৫। স্পন্দকারিকা (কাশ্মীরীয় তন্ত্র)।

৩৬। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ—পণ্ডিত অপ্পয়দীক্ষিত-রচিত।

৩৭। বেদান্তসার—সদানন্দ-যতি-রচিত।

৩৮। পাতঞ্জলদর্শন—ব্যাসভাষ্যসমেত।

৩৯। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শাঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরি-রচিত টীকাসহিত।

৪০। সাংখ্যদর্শন (ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা)—তত্ত্বকৌমুদীটীকাসহিত।

৪১। যোগবাশিষ্টরামায়ণ, ১ম ও ২য় খণ্ড (সংস্কৃত), Published by the Nirnayasāgara Press, Bombay.

৪২। চতুঃসূত্রী—রামানুজভাষ্যসহিত (সংস্কৃত), Published by the Nirnayasāgara Press, Bombay.

৪৩। ভাষাপরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-রচিত এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত।

৪৪। মাধ্যমিককারিকা—চন্দ্রকীর্তিকৃত টীকাসমেত (শরচ্চন্দ্র দাস-সংপাদিত)।

৪৫। বৈশেষিকদর্শন।

৪৬। মনুসংহিতা—মেধাতিথি-রচিত টীকাসহিত।

৪৭। শতপথব্রাহ্মণ।

৪৮। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—শাংকরভাষ্যসমেত।

৪৯। ছান্দোগ্য উপনিষৎ— ,,

৫০। ঐতরেয় উপনিষৎ— ,,

৫১। কৌষীতকী উপনিষৎ— ,,

৫২। কঠ, কেন ও ঈশ উপনিষৎ— ,,

৫৩। মুণ্ডকোপনিষৎ— ,,

৫৪। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ ও গৌড়পাদকারিকাসমেত।

৫৫। নারায়ণোপনিষৎ।

৫৬। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—শাংকরভাষ্যসমেত।

৫৭। বিবেকচূড়ামণি—আচার্য শংকর-রচিত।

৫৮। বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিকম্—আনন্দগিরিকৃত টীকাসমেত।

৫৯। লঙ্কাবতারসূত্র (সংস্কৃত)।

৬০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (১৪শ সংস্করণ) ১ম—৫ম ভাগ, শ্রীম-রচিত।

৬১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম—৫র্থ খণ্ড, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ-রচিত।

৬২। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীধর-স্বামী-রচিত টীকাসমেত।

৬৩। বিষ্ণুপুরাণ (পঞ্চানন তর্করত্ন-সংপাদিত)।

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
১	২	তাদের ভিতর	তার ভিতর
১	৪	আধ্যাত্মিতার	আধ্যাত্মিকতার
৮	১	স্বামিজা	স্বামিজী
৯	১০	netural	neutral
১১	৯	শঙ্করের	শংকরের
১১	১৭	উৎপাদন	উপাদান
১২	২৬	কারণারূপ	কারণরূপ
১৩	২৫	ইলিউনন্	ইলিউসন
১৪	৮	হলিউসন	ঐ
১৪	২৩	প্রতটি	প্রতিটি
১৫	৩	qualiry	quality
২০	৫	millons	millions
২০	২৫	wiih	with
২৬	২২	মায়	যায়
২৮	৫	ঈশ্বব	ঈশ্বর
২৮	২৫	প্রশ্রসা	প্রশংসা
২৯	২৫	বিজাতায়	বিজাতীয়
৩০	২৩	মুক্ত	মুক্তি
৩২	১	বিনিষ্ট	বিনষ্ট
৩২	১৭	পরমাত্মকে	পরমাত্মাকে
৩৪	৮	প্রাকৃতিকে	প্রকৃতিকে
৩৬	১১	বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্যকে
৩৬	২১	স্পেন্সারের	স্পেন্সারের

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
৩৬	২৩	unwoable	unknowable
৩৭	১৭	অধ্যবসান	অধ্যবসায়
৩৮	২৫	ফল্পনা	কল্পনা
৩৮	২৫	Ir	It
৪২	২	উ্বুদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
৪২	১৩	কপ্সটাণ্টাইন	কন্সটাণ্টাইন
৪৭	২৬	দিব্যনুভূতির	দিব্যানুভূতির
৪৮	১	জনালোকে	জীবনালোকে
৪৮	২০	অভিনত্ব	অভিনবত্ব
৫২	১	গুরু	স্বরু
৫৭	২১	বেলছেন	বলেছেন
৬২	১৬	নিগুণব্রহ্ম	নির্গুণব্রহ্ম
৭৩	১৯	চৈতন্য	অচৈতন্য
৭৪	১১	thought trans	thought transferance
৮২	৩	মনে	মন
৯৪	৯	নিয়মতভাবে	নিয়মিতভাবে
৯৬	২৬	ইয়ত্ত	ইয়ত্তা
৯৭	১০	miniture form	miniature form
১০১	১২	ব্রহ্মচায়ী	ব্রহ্মচারী
১০২	১৭	পুরুষাঽশ্বতে	পুরুষোঽশ্নুতে
১০৩	১৫	মায়া	ময়া
১০৩	১৮	নিরোগ	নীরোগ
১০৩	২০	ঐ	ঐ
১১০	১৬	ব্রহ্মজ্ঞান	ব্রহ্মজ্ঞান হোলে
১১২	১৮	ভূলে	ভুলে
১১৭	১০	আনেক	অনেক

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
১৩১	১৯	কাপড়-জামাও দিত	কাপড়-জামাও দিত
১৩১	২৫	ভূত্বাঽভবিতা	ভূত্বা ভবিতা
১৩৭	২৫	in destructible	indestructible
১৪৬	২০	বিকাশ হয়,	বিকাশ,
১৪৮	১১	মায়াসবলিত	মায়াসংবলিত
১৫০	১৮	অধিকরে	অধিকার
১৫৩	২	প্লেটা	প্লেটো
১৫৩	৬	ঈশ্বররের	ঈশ্বরের
১৫৩	১০	no other then	no other than
১৫৩	২১	জমীজমা	জমিজমা
১৫৪	৩	এক একমাত্র	একমাত্র
১৫৬	২০	বিহ্‌বল	বিহ্বল
১৫৮	১০	অমি	আমি
১৬৫	৯	পুত্রোৎপাদন	পুত্রোৎপাদন
১৬৭	৯	কোনট	কোনটা
১৭২	২৩	spiritual	Spiritual
১৭৪	৫	compitition (প্রতিদ্বন্দীতা)	competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা)
১৭৮	২৬	সেই	নেই
১৮৭	১	spirt	spirit
১৮৭	৪	যন	যন্
১৮৭	১৬	একত্ববুদ্ধি	একত্ববুদ্ধি
১৮৯		২৮৯	১৮৯
২০০	১০	lacation	location
২০৭	১১	যমরাজের	যমরাজের
২১০	১৫	অপররোক্ষণুভূতি	অপরোক্ষানুভূতি

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
২১৩	১৩	continant	continent
২২৩	৪	অর্জুকে	অর্জুনকে
২২৭	৪	পুরুষপরম্পরভোবে	পুরষপরম্পরাভাবে
২৩২	১৭	সবতে	সবেতে
২৩২	১৮	ি্দেশ্য	উদ্দেশ্যে
২৩৩	১	দেবতরাও	দেবতারাও
২৩৩	২৩	যে	সে
২৩৫	৪	প্রভিভাত	প্রতিভাত
২৩৮	২৬	কল্যাণসাধন হয়···	কল্যণসাধন একমাত্র ব্রত
২৪৪	১১	secoondery	secondary
২৫৬	৬	তোমারা	তোমরা
২৪৭	৭	ইয়াত্তা	ইয়ত্তা
২৫২	৭	intolarance	intolerance
২৫২	১৩	manifestalion	manifestation
২৫২	১৫	Adhadānanda	Abhedānanda
২,২	২৩	ও,	ও
২৫২	১৬	অসম্প্রদায়িকতা	অসাম্প্রদায়িকতা

"মুখের কথায় কিছু হবে না। হয় শরণাগত হও—নয় বিচার করো। দুটোর একটা চাই। যখন মনুষ্যজন্ম নিয়েছ তখন ভগবান লাভ এ'জীবনে করা চাই। এ'জীবনেই ভগবান লাভ করবে এ'রকম মনেব জোর চাই।

—স্বামী অভেদানন্দ